বধূ

চন্দন রায়কে কলেজের ছেলে মেয়েরা সমীহ করে চলে। শুধু কলেজের ছেলেরাই নয়, শহরের অনেক সংস্থা ক্লাবেই তার যাতায়াত আছে।

বাবা অমর রায়ের বিরাট ব্যবসা। বনেদী বড়লোক এই শহরের।

সুতরাং চন্দনেরও সমাজে একটা বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। সেটাকে চন্দন প্রায়ই কাজে লাগায় আর সেটা লাগায় খারাপ কাজেই।

লোকের অসুবিধা করতে পারলে তার আনন্দ হয়। নিজের প্রতিষ্ঠা যেন ফুটে ওঠে ওই সব কাজে। তার চ্যালা চামুণ্ডারা সাবাস দেয়।

—'তোমার জবাব নেই গুরু'

অবশ্য তাতে লাভই হয় ওই তলপিদার চ্যালাদের। কারণ চন্দন স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে ক'বছর হল কলেজে এসে এর মধ্যেই শহরের বারে যাতায়াত শুরু করেছে। বন্ধুদেরও সঙ্গে নিয়ে যায়। পরের পয়সায় মদ্যপান—মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার মৌকা পেয়ে, তারাও ল্যাজ নাড়ে চন্দনকে ঘিরে।

সব মিলিয়ে চন্দন শহরের চেনা জীব—একটা গাড়ি, না হয় মটর বাইক হাঁকিয়ে ঘোরে যত্রতত্র।

স্কুল কলেজের মেয়েদেরও টিটকারী করে দলবেঁধে। সবকিছুর মধ্যে নিজের প্রাধান্যকেই ফুটিয়ে তুলতে চায়।

কলেজ ইউনিয়নেও এর মধ্যে চন্দন একজন পাণ্ডা হয়ে উঠেছে। তুচ্ছ কারণ নিয়েই চন্দনের দল কলেজে ধর্মঘট ডেকে বসে। খেলার মাঠে নেট নেই, কলের জল নেই, পাখা খারাপ—কোশ্চেন কঠিন হয়েছে এমনি নানা অজুহাত নিয়ে চন্দন—তার দলবল কলেজের ক্লাস বন্ধ করে দেয়।

কারো কিছু বলার সাধ্য নেই।

সেবার থার্ডইয়ারের কোন ছেলে প্রতিবাদ করতে এলে সকলের সামনে তাকে মেরে হটিয়ে দিয়ে ধর্মঘট চালালো।

তারপর থেকে ছেলেমেয়েরা এসব পছন্দ না করলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। ওদের জুলুম মেনে নিতে বাধ্য হয়। আর চন্দনও জানে

এইসব জয় তার প্রতিষ্ঠারই প্রমাণ করে।

এবারও হঠাৎ ধর্মঘট ডেকেছে চন্দনের দল।

সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা। কোর্স শেষ করাতেই হবে—

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের কড়া হুকুম তাই অধ্যাপকরাও এখন মন দিয়ে ক্লাশ নিচ্ছেন।

আর হঠাৎ এমনি সময় চন্দনের দল কলেজের গেটে জমায়েত হয়ে শ্লোগান তোলে।

—কমনরুমের আসবাবপত্র ভালো নেই, পাখা নেই, তার প্রতিকার করতেই হবে, নাহলে কেউ ক্লাশে যাবে না। আমরা লাগাতার ধর্মঘট করছি আজ থেকেই।

গেটের ওদিকে এর মধ্যে ছোট খাটো মঞ্চও বানিয়ে ফেলেছে চন্দনের দল, মাইক এসে গেছে, চন্দন তার দলবল পল্টু—মন্টু—পটলাদের নিয়ে মাইক হাতে নিয়ে তেজস্বি ভাষায় কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের আদ্যশ্রাদ্ধ করে সদর্পে ঘোষণা করে—ছেলে মেয়েরা, কেউ কলেজে ঢুকবে না। আমাদের ধর্মঘট চলছে, চলবে।

ছাত্র ইউনিয়ন—দলবল গলার শির মোটা করে হাতের বজ্রমুষ্ঠি আকাশে তুলে সাড়া দেয়—জিন্দাবাদ।

হঠাৎ এর পরই ঘটনাটা নাটকীয় ভাবে ঘটে যায়।

মঞ্চে এর মধ্যে উঠে গেছে একটি মেয়ে। সে এবার মাইক দখল করে স্পষ্ট সতেজ কণ্ঠে বলে—এই ধর্মঘট আমরা মানিনা। আমরা ক্লাশে যাবো—ক্লাশ করবো। কোন বাধা মানবো না।

চমকে ওঠে চন্দন, দেখছে মেয়েটিকে।

—কে রে।

পটলা বলে—মাইক কেড়ে নেব গুরু?

তার আগেই বিরাট সংখ্যক ছেলে মেয়ে তাদের স্বপক্ষে একজনকে বলতে দেখে এবার তারা ভরসা পায়।

সতেজ কণ্ঠে তারা এবার প্রতিবাদ করে।

—ওকে বলতে দাও, খবরদার কেউ মাইকে হাত দেবে না।

জনতা যেন গর্জে উঠেছে।

চন্দন এমনি পরিস্থিতির জন্য তৈরী ছিল না।

তার সব প্রতিষ্ঠার মূলে ওই মেয়েটি যেন এক নিমেষে চরম আঘাত

হেনেছে।

মেয়েটি বলে চলেছে—ভাইসব, বোনেরা, বড়লোকের ওই ছেলেরা কলেজে আসে বাপের পয়সায় মজা লুটতে—মস্তানি করে নিজেদের দাপট দেখাতে। তাদের পড়াশোনার দরকারও নাই। কিন্তু আমাদের মত গরীব ঘরের ছেলে-মেয়েরা কলেজে আসে বহু কষ্টার্জিত পয়সা দিয়ে পড়াশোনা করতে। এ আমাদের ভবিষ্যৎ-এর প্রশ্ন—রুজি রুটির প্রশ্ন তাই এসময় কোন মতেই আমরা ক্লাশ কামাই করবো না। ক্লাশ হবেই।

এবার ছাত্ররাও গর্জে ওঠে—হ্যাঁ, ক্লাশ আমরা করবোই, ওদের অন্যায় জুলুম সইব না।

মেয়েটি বলে—তাহলে চলুন, আমরা দল বেঁধে ক্লাসে যাবো—যারা যেতে চান আমার সঙ্গে আসুন, কোন ভয় নেই।

মাইক ছেড়ে দিয়ে মেয়েটি নেমে আসছে।

চন্দন গর্জে ওঠে—মেয়েটা কে রে?

মেয়েটি এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে তেজস্বিনীর মত দৃপ্ত ভঙ্গীতে বলে—আমি অপরাজিতা।

নাম নয়, নিজে যেন সত্যিই অপরাজিতা, সেই কথাটা সদর্পে জানিয়ে নেমে এল সে।

তখন জলস্রোত-এর মত ছাত্র-ছাত্রীরা ওই চন্দনের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে কলেজে ঢুকছে, ওদের সামনে চলেছে অপরাজিতা। সঙ্গে ওর কয়েকজন সহপাঠিনী।

কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন প্রিন্সিপ্যাল ওই আন্দোলন। চন্দন-এর দলকে চেনেন। ওরা এতদিন এইভাবেই কলেজে গোলমাল অশান্তি বাধিয়ে এসেছে। ছাত্ররা বাধা দিক এও তিনি চেয়েছিলেন, কিন্তু দেখেছেন আজকাল ছেলেরা যেন সাহস-শক্তিটাকে হারিয়ে ফেলেছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তারা অক্ষম।

আজ তাই ওই মেয়েটির সাহস দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। একা মেয়েটিই আজ ওদের এই অত্যাচারের মূলে আঘাত করেছে।

কথাটা চন্দনও ভাবতে পারে না। সে হতবাক হয়ে গেছে। বারকয়েক মাইকে চীৎকার করে বুঝেছে তার থেকে অনেক বড় তেজ আর শক্তি ধরে ওই মেয়েটা।

পল্টু বলে—একটা মেয়ে একেবারে সব চৌপট করে দিল গুরু?

মণ্টু বলে—প্রেস্টিজ পাংচার করে দিল রে!

তখন মাঠ ফাঁকা। মাইকওয়ালা তার গোটাচ্ছে, মঞ্চের বাঁশ খুলছে মিস্ত্রীরা।

পটলা বলে—খেল খতম হয়ে গেল নাকি?

চন্দন গর্জে ওঠে—খতম করবে চন্দনের খেল ওই একটা মেয়ে? আরে খতম নয়, খেল শুরু হবে এবার, দেখবি তোরা।

কলেজে ওই নিয়েই বেশ রকমারি আলোচনা সুরু হয়েছে। ছেলেদের অনেকেই বলে—চন্দনকে মুখের মত জবাব দিয়েছে অপু।

অপরাজিতার বান্ধবী মধুমিতা, ইরা বলে—চন্দন ছেলেটা একদম বাজে, ওর দলবলও ভালো নয়। তুই একটু সাবধানে থাকবি অপু।

অপরাজিতা বলে—থামতো। ওদের মুরোদ জানা আছে। ওদের ভয় করে চলতে হবে নাকি!

অপরাজিতার বাড়ি কলেজ থেকে কিছু দূরে। বিকালে কলেজ থেকে বের হয়ে বাড়ি ফেরার পথে পড়ে ত্রিপুরেশ্বরের মন্দির।

বহুকালের পুরোনো মন্দির। শহরের এদিকটা এখনও কিছুটা নির্জন, কালিন্দী নদী বয়ে গেছে এইদিক হয়ে। নদীর ধারেই মন্দিরটা বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে। অপু কেন জানে না এখানে এলে নিজের মনে কোথায় একটা জোর পায়, তাই যেন দুর্বার টানে মন্দিরে আসে।

মন্দিরের ভজন গান শোনে—কোন পথচলতি সাধু দুদিনের জন্য এসে গাছের নীচে ধুনি জেবলে বসেছে। ছাইমাখা মুখে কি প্রশান্তি। বলে—তোর কল্যাণ হোক মা।

অযাচিত আশীর্বাদ যেন অপুর মনে কি সাড়া আনে।

এতক্ষণে যেন মনে পড়ে বাড়ির কথা। অপু বাড়ির দিকে ফেরে।

বিকাল হয়ে গেছে। পথটা নির্জন। তাল গাছের সারি—দু'একটা ঘর দেখা যায়। অপু ফিরছে শহরের দিকে।

হঠাৎ একটা মটর বাইকের শব্দ শুনে চাইল। দেখে মটর-বাইকে দু-তিন জনকে নিয়ে আসছে চন্দন। ওকে দেখেই ব্রেক করে দাঁড়ালো।

অপু দেখছে চন্দনকে।

চন্দনও চেয়ে দেখে তাকে। নীরব ঠাণ্ডা চাহনিতে দেখছে ওকে। যেন

কিছু বলবে—

কিন্তু কিছুই বলে না। অপুর মুখের উপর একঝলক সিগরেটের বদগন্ধ মেশা ধোয়া ছেড়ে মটরবাইক হাঁকিয়ে চলে গেল।

অপু এগিয়ে আসে। সেও এই ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিতে চায় না। ওসব চিন্তা অপরাজিতা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে বাড়ি ঢুকলো।

অপরাজিতার বাবা সমরেশবাবু পেশায় স্কুলমাষ্টার আর কিছু সাবেকী-পন্থী। শিক্ষার আদর্শে তিনি বিশ্বাস করেন। তাই ছাত্রদের মন দিয়ে ক্লাশেই পড়ান, অন্য শিক্ষকদের মত পড়ানোর কাজটা বাড়িতে করে স্কুলে রাজনীতি করে মাতব্বর সেজে ক্লাশ ফাঁকি দেন না।

তাই বাড়িতে ছাত্র পড়াবার কারখানা বানান নি সমরেশবাবু, ফলে অন্য শিক্ষকরা দু-পয়সা রোজগার করে যে রকম ঠাটে বাটে থাকেন—আরাম বিলাস করেন, সমরেশবাবু সে ভাবে থাকার কথাও ভাবতে পারেন না।

সহকর্মীরা বলে বেড়ান—নীতিবাগীশ না কচু। আদর্শ ফাদর্শ বাজে কথা। আসলে আহাম্মুক, বুদ্ধু। কথাটা সমরেশ শুনেও গা করেন নি।

আর একদিক থেকেও সমরেশবাবু নিশ্চিন্ত। বাড়ির গিন্নীর চাপ পড়লে কর্তাকে বাপ বাপ করতে হয় তার চাহিদা মেটাবার জন্য। আর তখনই বাধে সংঘাত। আদর্শকে তখন পিছনে ফেলে নতুন করে বাঁচার ছক কষতে হয়।

কিন্তু সমরেশবাবুর স্ত্রী মৃন্ময়ী দেবীও অন্য ধাতের মেয়ে। তার নিজের চাহিদাও বিশেষ নেই। স্বামীর আদর্শকে সে মেনে নিয়েছে। তাই অল্প নিয়েই খুশী আছে মৃন্ময়ী।

স্বামীর রোজগারেই সে তিনজনের সংসার কোনমতে চালিয়ে নেয়।

সমরেশ সেদিক থেকে শান্তিতেই আছে। তার একমাত্র মেয়ে অপরাজিতা পড়াশোনায় ভালোই, আর আজকের যুগের মেয়েদের মত বিলাস ব্যাসনের দিকে নজর তার নেই।

সমরেশবাবু পরীক্ষার খাতা দেখছেন বিকালে,হঠাৎ কার ডাক শুনে চমকে ওঠেন। অতীতের তীর থেকে সেই চেনা কণ্ঠস্বর বহু স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

চাইল সে, ততক্ষণে বাইরের ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে সেই ভদ্রলোক এসে পড়েছেন, তারই বয়সী, সৌম্য শান্ত চেহারা। মাথার চুলে পাক ধরেছে, তবু

বেশ শক্ত সমর্থই দেখায় তাকে।

—সুবিনয় না? কবে এলি দিল্লী থেকে?

সুবিনয়বাবু বলেন—মাত্র তিন দিন। এবার চাকরী থেকে রিটায়ার করে দিল্লীর পাট চুকিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম আর এখানেই থাকছি।

খুশী হয় সমরেশ—এতদিনে সুমতি হ'ল তোর।

সুবিনয় বলে দেশ ছেড়ে বাইরে বাইরে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এবার দেশে ফিরে ভাবছি আবার কলেজ জীবনের মত হৈ চৈ করে, আড্ডা দেব। কিন্তু দেখছি অনেকেই নেই। সুজন—আশিসরা তো দেশছাড়া। শুনলাম আমেরিকায়, সেটল করেছে। তোর খোঁজ নিতে এলাম। যাক—তুই তবু আছিস, সময়টা কাটবে ভালই। তুইও এবার ছেলে ঠ্যাঙানো ছেড়ে দে।

হাসে সমরেশ।

মৃন্ময়ী চা এনেছে। সমরেশ বলে,—চিনতে পারো সুবিনয়কে? দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে মস্ত অফিসার ছিল।

সুবিনয়বাবু বলে—সমরেশের বিয়েতে বরযাত্রী গিয়ে যা উৎপাত করেছিলাম বৌঠান। বৌভাতের রাতে—

হাসে মৃন্ময়ী। হারানো যৌবনের সেই দিন গুলোকে সেও স্মরণ করতে পারে। সুবিনয় বলে,

—তোর মেয়েকে দেখছি না, পড়ছে?

এমন সময় এসে পড়ে অপরাজিতা। সমরেশবাবু বলেন—এই তো অপরাজিতা এসে গেছে।

অপু দেখছে সুবিনয়বাবুকে। কেমন চেনা চেনা ঠেকে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না ওর পরিচয়।

সমরেশ বলে—অপু প্রণাম কর তোর সুবিনয়কাকুকে। এবার খেয়াল হয় অপুর।

বাবার পুরোনো বন্ধু। বাইরে থাকেন। মাঝেসাঝে এখানে এলে চলে আসেন। অপু প্রণাম করে।

সুবিনয় বলে—কতবড় হয়ে গেছে তোর মেয়ে।

সমরেশ বলে—এবার বি-এ দেবে। কে. এম. কলেজে পড়ে।

সুবিনয় বলে—শুভকে তো ওই কলেজেই ভর্তি করিয়েছি, ওর অবশ্য ফাইন্যাল ইয়ার সায়েন্স, ফিজিক্স-অনার্স নিয়েছে।

অপরাজিতা সুধায়—ওর নাম কি কাকু?

—শুভব্রত দত্ত।

মৃন্ময়ী তাড়া দেয়—অপু, কলেজ থেকে ফিরেছিস, এখন হাত মুখ ধুয়ে জল খাবার খেয়ে আয়। খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে।

সুবিনয়বাবুও বলে—তাই কর মা। তারপর তোমার সঙ্গে আলাপ জমানো যাবে।

অপুর ঘামে অস্বস্তি হচ্ছিল। হাত মুখ ধুয়ে কাপড় চোপড় বদলাতে হবে। তাই বলে সে—আসছি কাকাবাবু। চলে যাবেন না কিন্তু।

সমরেশ বলে—এবার তোমাকে পেয়েছে ত সুবিনয়, ছাড়বেনা। শুনবে ওর তত্ত্বকথা। পাগলী!

সুবিনয় বলে—সমরেশ কলেজ জীবন ছেড়ে চাকরীতে ঢুকে সবে ঘর সংসার পাতার সময় আমাদের মধ্যে একটা অলিখিত শর্ত হয়েছিল মনে আছে তোর?

সমরেশ ঠিক খেয়াল করতে পারে না। তখন তো অনেক স্বপ্ন দেখেছিল তারা। তাই বলে সমরেশ—কি সর্ত বলতো? ঠিক মনে পড়ছেনা।

সুবিনয় বলে—কেন? মনে নেই? কথা ছিল আমাদের ছেলে মেয়ে হলে তাদের মধ্যেও আমরা একটা সম্পর্ক গড়ে তাদের বিয়ে দিয়ে দেব। যাতে আমাদের বন্ধুত্বটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও হারিয়ে না যায়।

এবার মনে পড়ে সমরেশের কথাটা। বলে সে—হ্যাঁ-হ্যাঁ।

সুবিনয় বলে—আমারও একমাত্র ছেলে। পড়াশোনাতেও ভালো। নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা তার আছে। দ্যাখ যদি রাজী থাকিস।

অবশ্য এখনই কথা দিতে বলছি না। তোরা দেখ—তারপর ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে।

মৃন্ময়ী কথাটা শুনছে। মেয়ের মা সে। মধ্যবিত্ত সংসারে আজকের দিনে মেয়েকে সুপাত্রে বিয়ে দিতে পারাটা একটা কঠিন কাজ। সেই সুযোগ তাদের কাছে অযাচিত ভাবে এসেছে। মায়ের মনও তাই সেই স্বপ্নকে সার্থক করতে চায়।

সমরেশবাবু ভাবছে।

সুবিনয়-এর হঠাৎ খেয়াল হয় একটা জরুরী কাজ পড়ে আছে। এখুনিই বেরুতে হবে।

সুবিনয় বলে—সমরেশ,আজ উঠতে হবে। ফড়েপুকুরে যেতে হবে একটা জরুরী কাজে, খেয়াল ছিল না। আমি আজ উঠি। অপুকে বলবি পরে

এসে আলাপ করবো। আজ হ'ল না।

সমরেশ শোনায়—আসবি কিন্তু। নাহলে যা মেয়ে ত—

হাসে সুবিনয়—নিশ্চয়ই আসবো। দরকার আমারও আছে। সেই সঙ্গে বৌঠানের হাতের চা। একি ছাড়া যায়, আসি।

সুবিনয় চলে যেতে সমরেশ আবার তার পরীক্ষার খাতায় মন দেয়। লাল নীল পেন্সিল নিয়ে ঢ্যারা কাটে।

স্ত্রীর কথায় চাইল।

সমরেশ সুবিনয়বাবুর কথাটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় নি, কিন্তু মৃন্ময়ীকেই সংসারের সব দায় বইতে হয়। তাই ভাবনাটা তারই বেশী।

বলে মৃন্ময়ী—কি বলছিলেন সুবিনয়বাবু, ওই বিয়ের কথা?

সমরেশ হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে—ছাড়তো!

কিন্তু মৃন্ময়ী বলে—মেয়ের বিয়ে তো দিতে হবে। জানাশোনার মধ্যে যদি ভালো ছেলে পাও—ছেড়ে দিলে পস্তাবে। তাছাড়া উনি নিজেই যখন কথাটা পাড়লেন—ছেলেটিকে দেখে আসি চল একদিন।

অপরাজিতা ঘরে ঢুকছিল। হঠাৎ মা বাবার ওই কথাটা শুনে থেমে যায় সে। তার বিয়ের কথা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে।

বিয়ে! কুমারী জীবনে ওই একটি শব্দ যেন অজান্তেই তার মনেও ঝড় তোলে। সরে এল নীরবে অপরাজিতা, নামটা কানে বাজে, শুভব্রত। কে জানে কেমন দেখতে?

কলেজে এখন অপরাজিতার বেশ নাম ডাক। মেয়ে মহলেই নয়, ছেলেরাও সমীহ করে ওই ছিমছাম সাদামাটা পোষাক পরা তেজস্বীনি মেয়েটিকে। কলেজের অধ্যাপকরা নয়, প্রিন্সিপ্যাল অবধি স্নেহ করেন তাকে।

আর এর জন্যই চন্দন তার দলবল তাকে সহ্য করতে পারে না। এর মধ্যে প্রিন্সিপ্যাল গভর্নিং বডির কাছে কলেজে কিছু ছাত্রদের গোলমাল, অকারণ ধর্মঘট ডেকে অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগ দিয়ে রিপোর্টও করেছেন। সামনের মিটিং-এ এনিয়ে আলোচনা হবে—আর দোষীছাত্রদেরও বিচার হবে। শাস্তিও হতে পারে।

খবরটা কলেজেও ছড়িয়ে গেছে।

চন্দনের দলও ভাবনায় পড়েছে। এতদিন তারা যা খুশী তাই করেছে। কেউ বাধা দিতে সাহস করেনি। কিন্তু এবার এই একটা মেয়েই আলোড়ন

এনেছে।

চন্দন বলে—এখন চুপ চাপ থাক। কোন কিছু করবি না। ওদের মিটিং হয়ে যাক। তারপর যা করার করবো। তাই কলেজের আবহাওয়া কয়েক-দিন শান্তই রয়েছে। পড়াশোনাও চলছে ঠিকমত।

অপরাজিতা সেদিন কলেজে ঢুকেছে। বাগান মত পথটা গাছের ছায়ার নীচ দিয়ে গিয়ে সামনে মেন বিলডিংএ উঠেছে। ওদিকে খেলার মাঠ—গাছ-গাছালির ভিড়। জায়গাটা একটু নিরিবিলিই।

অপু ওর দুজন বান্ধবী ইরা আর মধুমিতার সঙ্গে চলেছে মেন বিল্ডিং এর দিকে। হঠাৎ দেখা যায় একটা মালতী ফুলের গাছের ঝোপের আড়াল থেকে একটা ছেলে এই দিকেই আসছে ওদের দিকে চেয়ে।

থমকে দাঁড়াল ওরা।

মধুমতী বলে—ছেলেটা কে রে? হাঁ করে তোর দিকে চেয়ে আছে ক্যাবলার মত।

ইরা বলে—ক্যাবলা নয় শয়তান। এগিয়ে আসছে এদিকেই।

অপুও দেখেছে ছেলেটিকে।

ইরা বলে—ও নিশ্চয়ই চন্দনের দলেরই কোন মস্তান। বলিনি ওদের মতলব ভালো নয়—অপু!

অপরাজিতাই ডাকে ছেলেটিকে—শুনুন!

এগিয়ে আসে ছেলেটি।

ইরা ফুসে ওঠে—হাঁ করে কি দেখছেন? ব্যাপার কি?

ছেলেটি বলে—না—ইয়ে।

মধুমতী শোনায়—ন্যাকা সাজা হচ্ছে? কে পাঠিয়েছে তোমাকে? ওই চন্দন! ইরা—অপু আটকে রাখ একে, আমি ক্যানটিনে গোপালদের খবর দিচ্ছি ওরা এসে ওকে আড়ং ধোলাই দিলেই সব কথা ফুটবে ওর।

ছেলেটি বলে—শুনুন। আমি কারোও দলের নই। চন্দনবাবুকেও চিনি না।

—বাজে কথা! ধমকে ওঠে ইরা। বলে সে—তুই যা মধুমতী—

ছেলেটি বলে—বিশ্বাস করুন। এই কলেজে আমি নতুন এসেছি দিল্লী থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে।

দিল্লীর কথাটা শুনে অপু শুধোয়—নাম কি আপনার?

—আজ্ঞে শুভব্রত দত্ত।

অপুই বলে—ফিজিক্সে অনার্স ?

—হ্যাঁ। আপনি জানলেন কি করে ?

হাসে অপু—আপনার বাবার নাম সুবিনয় দত্ত ?

—হ্যাঁ।

ইরা শুধোয়—চিনিস ওকে ? তাহলে চন্দনের দলের কেউ নয় ?

অপু বলে—না। তা শুভব্রতবাবু, আগেই বলবেন তো এসব।

মধুমতী বলে—এখুনি সেমসাইড হয়ে যেত। গোপালটা যা খুশি ঝাড়তে পারে। বিপদ হয়ে যেতো।

অপুর কথায় বলে শুভব্রত।

—কিছু বলার সময় দিলেন ? একেবারে ধরে এনে শাসাতে লাগলেন। উনি তো আড়ং ধোলাই এর ব্যবস্থাই করছিলেন।

অপু দেখছে ওকে। ছেলেটি ভদ্র—মুখে বুদ্ধির ছাপ।

বলে অপু—চেনা জানা হলো। আপনার বাবা আমার বাবার বাল্যবন্ধু। সেদিন উনি এসেছিলেন বাড়িতে। তাই শুনলাম আপনার কথা।

ইরা ফোড়ন কাটে—তাই আজ বেঁচে গেলেন। হাসছে ওরা তিনজনে।

অপু বলে—চেনা জানা হলো—একদিন বাড়িতে আসুন। মা বাবাও খুব খুশী হবেন।

শুভব্রত বলে—নিশ্চয়ই যাবো।

কলেজের ঘণ্টা পড়ে। ক্লাশ সুরু হচ্ছে।

অপরাজিতা বলে—আজ চলি, পরে দেখা হবে।

শুভব্রত শোনায়—সেদিন ওরাও চিনতে পারবেন তো।

ইরা বলে—অপুর বন্ধু—আমাদেরও বন্ধু। চিনতে আর অসুবিধা হবে না।

চলে যায় ওরা, শুভব্রতও গিয়ে কলেজে ঢোকে। ওদের এই ব্যাপারটা চন্দনের দলের নজর এড়ায়নি। তারা কোন গোলমাল না করলেও গোপনে তৈরী হচ্ছে পরবর্তী আঘাত হানার জন্য। তাই অপুর উপর তারা নজর রেখেছিল।

আজ ওই নতুন ছেলেটিকে অপুদের সঙ্গে সহজ ভাবেই মিশতে দেখে তাদের ব্যাপারটা ভালো ঠেকে না।

পটলা বলে—চন্দন, নতুন ছেলেটা দেখি অপুর সঙ্গে বেশ জমে গেল।

মণ্টু বলে—গুরুর বরাত, গুরু এত করেও মেয়েটার মন কাড়তে পারল

না, আর ব্যাটা নেপো এসে কিনা দই খাবে।

চন্দন সিগরেটে শেষ টান দিয়ে বলে—দইও খাবো—ভাঁড়ও ভাঙবো, তবেই আমার নাম চন্দন রায়। আমাকে রোখনেওয়ালা কেউ নেই।

পটলা বলে—যা করবে বুঝে-সুঝে করো গুরু। কলেজ কমিটির মিটিং সামনে। যদি শাস্তি টাস্তি দেয়—কত বড় ঘরের ছেলে তুমি। শেষে ফেঁসে যাবে?

চন্দনের বাবা অমরবাবু এককালে শহরের নামী ব্যবসাদারদের একজন ছিলেন। বিরাট কারখানা, তাতে কাপড় তৈরী হয়। এছাড়াও কণ্ট্রাকটারি ব্যবসাতেও প্রচুর সুনাম অর্থ কুড়িয়েছেন। এখানের বড় বড় কাজের জন্য সরকার তাদের কোম্পানীকেই ডাকতো।

আজও তাদের ব্যবসা—কারখানা রয়েছে। এখনও কাজকর্ম হয়। কিন্তু অমরবাবুর বয়েস হয়েছে। শরীরটাও ভেঙ্গে পড়েছে। তাই নিজে বের হতে পারেন না। ব্যবসা দেখে এখন ছেলে নন্দন। আর ছোট ছেলে চন্দন এখনও কলেজের বেড়া টপকাতে পারে নি।

বিরাট রায়বাড়িটা শহরের অভিজাত এলাকায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে সাজানো লন—কিছু গাছ গাছালি, তারপর বড় বাড়িটা। আর পিছনেও অনেকখানি এলাকা জুড়ে প্রাচীর ঘেরা বাগান।

এককালে বাগানের সৌন্দর্য ছিল। অমরবাবু নিজে বাগানের কাজ তদারক করতেন মালিদের নিয়ে। সব সময়ই ফুল থাকতো—রকমারি ফুল, ডালিয়া-গাঁদা-গোলাপ—আরও নানা মরশুমী ফুলে বাগান ভরে থাকতো। অমরবাবুর শরীর ভেঙ্গে যাবার পর বাগানের চেহারাও বদলে যায়।

এখন কেমন শ্রীহীন হয়ে গেছে। তবু টিকে আছে ওই বাগান অমরবাবুর মতই শ্রীহীন হয়ে।

এখন এ বাড়ির কর্ত্রী অমরবাবুর স্ত্রী মহামায়া। জাঁদরেল মহিলা। দাপটের সঙ্গে সংসারের সবদিকে নজর রাখে, আর এ বাড়িতে পান থেকে চুণ খশলে তা মহামায়ার কানে তুলে দেবার লোকের অভাব নেই।

যোগমায়াই এবাড়ির সেই যোগসূত্র। মহামায়ার দূর সম্পর্কের দিদি, বিধবা—তিনকুলে কেউ নাই। লতায় পাতায় সম্পর্ক ধরে এ বাড়িতে আশ্রয়ের সন্ধানে এসে এখন যোগমায়া মহামায়ার বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য অনুচরে পরিণত হয়েছে।

মহামায়ার ছেলে নন্দন—সেইই এখন ব্যবসা, কারখানা—বিষয় আশয় দেখছে। এ বাড়ির একটা মহলে সে থাকে তার স্ত্রী নন্দিতা আর বাচ্চা মেয়ে লিলিকে নিয়ে, এ বাড়ির সব সুখ সুবিধা আরাম তাদের নাগালের মধ্যে।

অবশ্য সেসব তাদের পাওনা নয়। কিন্তু এই দুনিয়ায় সবই জোর করে দখল করে নিতে হয়। ওরা তাই করেছে।

কিন্তু সেটা পারেনি বলেই এ বাড়ির বড়বৌ সুজাতা এ বাড়িতে পড়ে আছে রাধুনী, কাজের মেয়ের ভূমিকা নিয়ে নীচের একটা এঁদো ঘরে তার দুই ছেলেমেয়ে রনি আর রীনাকে নিয়ে।

মহামায়া—যোগমায়ার শাসনের বেশীটা তাদেরই ওপর। সুজাতা মুখ বুজে সবই সহ্য করে। কারোও কাছে নালিশ জানাবার নেই।

এ বাড়ির কর্তা অমরবাবুরও এর কোন প্রতিবিধান করার সাধ্য নেই। তাকেই মহামায়া নিজে যেন বন্দী করে রেখেছে।

অসহায় সুজাতা সবই দেখে। কিন্তু চুপ করে থাকতে হয়।

তবু ছোট ছেলে মেয়ে দুটো ওই রণি-রীণা মাঝে মাঝে ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ তোলে এই অবিচারের।

দেখছে তারা নন্দনের মেয়ে লিলি গাড়িতে চড়ে সোজাসুজি ইংলিশ স্কুলে পড়তে যায়। তার জন্য আলাদা খাবার আসে, ডিম-আপেল-কলা-সন্দেশ-হরলিক্স ভালো বিস্কুট।

ওদের জন্য রাতের বাসি রুটি আর একটু গুড়। ওই খেয়ে তারা পাড়ার টালি খোলার ইস্কুলে পড়তে যায়। তাদের পরনেও অতি সাধারণ প্যাণ্ট, সার্ট, ছেঁড়া চটি।

বাছারা সেদিন বলে—আমরাও ভালো স্কুলে পড়বো, গাড়িতে স্কুলে যাবো ওইসব খাবার নিয়ে।

যোগমায়া ফুঁসে ওঠে—সখ কত, এ বাড়িতে আছিস এই ঢের। দিনরাত খাওয়া খাওয়া কি?

রণি বলে—তুমি খাও না বড় দিদা? সেদিন দেখলাম ফ্রিজ থেকে লুকিয়ে সন্দেশ খাচ্ছিলে গব গব করে।

যোগমায়ার এসব অভ্যাস আছে। খাওয়ার সখটা তার বেশীই। আর এসব কাজ সে করে না তা নয়। কিন্তু ওদের ওইসব কথা বলতে দেখে গর্জে ওঠে—মুখপোড়া ছেলের নরকেও ঠাই হবে না। গলগল করে মিথ্যা কথা

বলছে গুরুজনদের নামে।

মারবো এক থাপ্পড়, মুখ ভেঙ্গে দেব।

সুজাতাই সরিয়ে নেয় ছেলেমেয়েকে,—সরে আয় রণি।

যোগমায়া এবার ভাষণ শুরু করে।

—ছেলেমেয়েকে সহবৎ শেখাও বউ। সবতো খেয়েছো—স্বামীও নেই। এবার বাঁদরদের সামলাও, হরে কেষ্ট! হরে কেষ্ট!

ফোনটা বাজছে উপরে। মহামায়া এসে ঢোকে। যোগমায়াকে এখানে দেখে বলে—ফোন বাজছে কত্তার ঘরে—আর তুমি এখানে? ফোনটাকে ওঘর থেকে সরাতেই হবে দেখছি।

মহামায়া দৌড়লো উপরের ঘরে।

অমরবাবু এই ঘরেই যেন বন্দীর মত রয়েছে। কি অসুখ তা সঠিক তিনিও জানেন না। মহামায়াই তার চেনা কোন ডাক্তারকে আনে। নানা ট্যাবলেট দেয়—আর ইনজেকসনও নিতে হয়। বেদনাদায়ক সেই ইনজেকশনটা তার সারা শরীর যেন অবশ করে তোলে।

তিনি বলেন—ওতে কষ্ট হয় ডাক্তারবাবু। ওই ওষুধে কোন কাজই হচ্ছে না।

মহামায়া ধমকে ওঠে—তুমি কি ডাক্তার? থামোতো। ওসব আমি বুঝি! ডাক্তারবাবুর চিকিৎসাতে তবু অনেকটা সুস্থ আছো।

—এই ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে ভালো লাগছে না। আমি অফিসে বের হবো। কারখানায় কি হচ্ছে?

অমরবাবুর কথায় মহামায়া বলে,—নন্দন সব ঠিক মত সামলাচ্ছে। তুমি সেরে ওঠো—তখন যাবে।

হতাশ অমরবাবু বলেন,—সারার কোন লক্ষণই দেখছি না। অন্য ডাক্তারকে আনো।

মহামায়া বলে—ইনিই মস্ত ডাক্তার।

ওই ভাবেই আটকে রয়েছেন অমরবাবু। পায়ের জোরও নেই। দাঁড়াতে গেলে মাথা ঝিমঝিম করে।

ফোনটা বাজছে, অমরবাবু হুইল চেয়ারটা টেনে ফোনের কাছে গিয়ে ফোনটা ধরেছেন—মহামায়া ঘরে ঢুকে ওর হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিয়ে কথা বলে।

—অমরবাবুকে চান? কারখানার মালের ব্যাপারে? উনি অসুস্থ। আপনি বরং অফিসে নন্দনবাবুকে ফোন করুন। উনি এখন ওসব দেখছেন।

নমস্কার।

ফোনটা নামিয়ে মহামায়া এবার কঠিন স্বরে বলে অমরবাবুকে—বারবার বলেছি ফোন ধরবে না। ওতে টেনশন বাড়ে। তবু শুনবে না? ফোনটাকে দেখছি সরাতেই হবে এঘর থেকে।

বাইরের জীবনের সঙ্গে ওই তার যোগসূত্র। এককালে কর্মব্যস্ত জগতের লোক ছিলেন তিনি, আজ গৃহবন্দী। তবু দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে কথা হয়, কারণ মহামায়া চায় না বাইরের কেউ আসুক এবাড়িতে অমরবাবুর কাছে। তাই ফোনেই কথা হয়।

সেইটুকুও সহ্য করতে পারে না মহামায়া। তাই ফোনটাকেই সরিয়ে নিয়ে যায় অন্য ঘরে। অমরবাবু বলেন—ওটা থাক না এখানে?

—না। মহামায়ার কথাই এখন বাড়ির আইন।

যোগমায়া এ বাড়িতে বেশ গেড়ে বসেছে। তার দরদ ফেটে পড়ে নন্দনের জন্য। এ বাড়ির ছোট ছেলে চন্দন এ বাড়িতে রাতটা থাকে মাত্র। দোতলার একপ্রান্তে তার ঘর, লাগোয়া একটা ছোট পড়ার ঘরও আছে বাথরুম ও সেখানে, সুতরাং চন্দনের কোন অসুবিধাই নেই। ওদিকেও একটা সিঁড়ি বাগানে নেমে গেছে, ওই পথেই যাতায়াত করে চন্দন। চন্দন এবাড়ি থেকেও যেন এবাড়ির কেউ নয়। অবশ্য তার চাহিদাগুলো সবই অনায়াসেই জুটে যায়।

যোগমায়ার মাথার চুলগুলো কদম ফুলের মত ছাঁটা। কপালে নাকে—হাতে কোন গুরুদেবের নির্দেশমত তিলক ছাপ লাগায়। হাতে হরিনামের ঝুলি, সদা সর্বদাই যেন নাম জপ করছে।

ওটা তার বাহ্যিক ব্যাপার। মনেমনে তার বদবুদ্ধিগুলো সাপের মত পাক দিতে থাকে। যোগমায়াই বলে মহামায়াকে—নিজের ছেলের আখের তো ভাবতে হবে মহামায়া, নন্দনের কথা ভাব।

ওদের খাবার টেবিলে প্রাতরাশ-এর আয়োজন চলেছে। নন্দন স্নান করে সকালেই ব্রেকফাষ্ট সেরে কাজে বের হয়। দুপুরে ফেরারও ঠিক নাই।

অফিস-কারখানা-দোকান তারপর পার্টিদের সঙ্গে যোগাযোগ সারতে হয় হোটেলে। সব সেরে বাড়ি ফেরে অনেক রাতে। অবশ্য তখন আর কথা বলার মত অবস্থা থাকে না। কোন রকমে বিছানায় এলিয়ে পড়ে বেচারা।

সুজাতা কাজের মেয়েকে নিয়ে টোষ্ট-ওমলেট-ফলের রস-কলা-আপেল-

সন্দেশ এসব আনতে ব্যস্ত। ওদিকে যোগমায়া বসেছে। তার জন্য দুধ কর্নফ্লেক এর ব্যবস্থা।

রনি-রীনা দূর থেকে দেখে মাত্র ওই সব খাবার। তাদের খিদে লেগেছে। সুজাতাও জানে। হঠাৎ যোগমায়া ধমকে ওঠে ওদের—এখানে কি ঘুরঘুর করছিস হ্যাংলার মত, যা তো!

সরে যায় ওরা। সুজাতা বলে,—তোরা যা বাবা, খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

রনি বলে—আজ সন্দেশ দেবে মা?

সুজাতারও ইচ্ছা করে বাপমরা দুটো ছেলে মেয়েকে ভালোমন্দ খাওয়াতে, কিন্তু এদের খাবার আলাদা—এদের ফ্রিজেই থাকে সে সব ভালো খাবার, সেখানে সুজাতার কোন অধিকারই নেই।

তবু সান্ত্বনা দেবার জন্য বলে—যা তোরা, দেখছি। যোগমায়া তাড়া লাগায়—ও বৌ বলি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি, ওমলেট আনো, এরা যে বসে আছে।

নন্দন এসেছে খাবার টেবিলে। যোগমায়া বলে—চন্দনের সঙ্গে দেখাটেখা করিস তো? নন্দন চাইল, বলে যোগমায়া,

—ওর খবর টবর নিস বাছা। ছোট ভাই বলে কথা।

নন্দন জানে কি করতে হবে। যোগমায়াকে বলে—ওর খবর, নিই মাসি। ওর সঙ্গে দেখা করেই বের হবো কাজে।

যোগমায়া বলে তাই করিস, বড় খাটুনি যাচ্ছে তোর।

নন্দন বলে মাকে—মা। কিছু টাকা লাগবে।

—টাকা? কেন? মহামায়া শুধোয়! বলে সে—সেদিনই তো পঁচিশ হাজার টাকা দিলাম।

নন্দন বলে—আর ত কিছু চাই মা। সস্তায় কিছু ভালো মালের সন্ধান পেয়েছি। এই সময় ধরে রাখতে পারলে তিন মাসের মধ্যে ওই মালের দাম তিনগুণ বেড়ে যাবে। পঞ্চাশ হাজার তখন দেড় লাখে দাঁড়াবে। পুরো একলাখ লাভ। ও মাল আর ইমপোর্ট করতে দেবে না সরকার।

যোগমায়া বলে—তাহলে টাকাটা দে মহামায়া। বাছাকে দাঁড়াতে হবে তো। এ বাড়িতে চারিদিকে শত্রু। কথাটা বলে সুজাতার দিকে চাইল যোগমায়া।

চেকবইএ সই করে মহামায়া। সুতরাং টাকাটা পেতে নন্দনের কোন অসুবিধাই হয় না। নন্দন এই ভাবে মাঝে মাঝে ব্যবসার নাম করে মায়ের

কাছ থেকে বেশ ভালো টাকাই পায়।

নন্দন অযাচিতভাবে অমরবাবুর গড়া সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে, আর সেই সুযোগ সে গ্রহণও করেছে, এবং বুঝেছে এই সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে থাকতে গেলে একজনকে তার হাতে রাখা দরকার।

সে-ই এই সবকিছুর ন্যায়তঃ মালিক। সুতরাং তাকে খুশী রাখতে পারলেই নন্দন এসব কিছুর দখলদারি চালাতে পারবে। অবশ্য যেভাবে চলছে সে তাতে এই সাম্রাজ্য শেষ হয়ে যেতে খুব বেশী দিন লাগবে না।

কিন্তু ওই চন্দন যদি নিজে এসবের হাল ধরে তাহলে নন্দনের বিপদই হবে। অবশ্য বুদ্ধিটা তাকে যোগমায়াই দিয়েছে।

নন্দন তার জন্য ওই জগুমাসীর কাছে কৃতজ্ঞ। মহামায়ার মাথা গরমের ধাত। সহজেই চটে ওঠে। নিজের স্বার্থ কৃতিত্ব আর প্রতিষ্ঠায় কেউ এতটুকু বাধা দিলেই মহামায়া গর্জে ওঠে। তাই নিয়েই হুলস্থুল বাধায়।

কিন্তু জগুমাসী সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের মেয়ে। তার মাথা খুবই ঠাণ্ডা। তার রাগের কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। ধীরে সাবধানে সে পা ফেলে। আর হরিনামের ঝুলি হাতড়ে এমন প্যাঁচ কসে যে প্রতিপক্ষ ঘায়েল হয়ে যায়।

ওই অমরবাবুর মত কর্মী কাজের লোকটাকে ওই জগুমাসীই ক্রমশঃ অকর্মণ্য বন্দী করে রেখেছে আর তাই নন্দন এসব কিছু হাতে পেয়েছে।

চন্দন এই বড় বাড়ির অন্তরালের কাহিনীগুলোর খবর রাখে না। তার ওসব তুচ্ছ খবর রাখার সময় নেই। তার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে শহরের বারে—না হয় বাগানবাড়িতে হৈ চৈ করেই দিন কাটে।

এই শহরের চেহারাটাও বদলে গেছে। এখন একে কেন্দ্র করে চারিদিকের জঙ্গলের দামী কাঠ এর লাখ লাখ টাকার ব্যবসা চলে। যাত্রীদের ভিড় এখানে কম নয়। তাই গড়ে উঠেছে বড় বড় হোটেল, বার। আর সমাজের বেকারী, টাকার লোভ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানের অনেক বাড়ির অন্তঃপুরের দরজা এখন রাস্তায় এসে পরিণত হয়েছে। অনেক মেয়েরাও সেজেগুজে বের হয়, হোটেলে বারে। টাকা রোজগারের জন্য।

চন্দনদের সুবিধাই হয়েছে। জীবনের সব মূল্যবোধ তারা টাকার কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। চন্দনের কাছে মেয়েছেলে, মদ উপভোগের বস্তু মাত্র। [illegible]মা তাকে ঘাটাতে সাহস করে না।

মহামায়া নন্দনের দিকেই বেশী ঝুঁকেছে। তাই চন্দনের ভাগে তার স্নেহের

ছিটে ফোটাও মেলে না। আর বাবা আগে ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।

আজ দিল্লী—কাল বোম্বাই পরশু মাদ্রাজ—ব্যাঙ্গালোর সুতরাং বাবার সঙ্গেও যোগাযোগ কম ছিল। তারপর বাবা অসুস্থ হতে দু একদিন অন্তর মামুলি দেখতে যায় ওঁর ঘরে।

চন্দনের জন্য সংসারের কারো ভাবনা নেই। চন্দন ও কারোর জন্য ভাবে না। বড় বৌদি সুজাতা অবশ্য নামেই এই বাড়ির বড় বৌ—ওসব ইতিহাস হয়ে গেছে। সুজাতা পড়ে থাকে নীচের ঘরে।

তার ছেলেমেয়েরা এদিকে এলেও আসে অনাহূতের মত ভয়ে ভয়ে। চন্দনের ঘরেও ওদের আমন্ত্রণ নেই। বানে ভাসা খড়কুটোর মত দুটো অসহায় প্রাণী এ বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়।

জগুমাসির নজরে পড়লেই তারা ফুঁসে ওঠে। আর জগুমাসীকে ওরাই মাঝে মাঝে জব্দ করে। অবশ্য তার জন্য গালমন্দ, মারধোরও কম খায় না। চন্দন এসবে কানও দেয় না।

সকালে ঘুম ভাঙ্গে তার বেলা নটা নাগাদ। তার জন্য একজন চাকর অবশ্য দেখানো আছে। জগুমাসী তাকে বাগানেই কাজ করায় বাকী সময়। কারণ চন্দন তো প্রায় সময় বাইরেই থাকে।

চন্দন সকালে উঠেছে। শরীরটা ভালো নেই। কাল কোন হোটেলে অনেক রাত্রি অবধি কোন বান্ধবীর পার্টিতে ছিল। হৈ চৈ মদ্যপানও হয়েছে বেশী। স্নান করতে যাবে।

কলেজেও নানা গোলমাল চলছে, তার জন্যও ভাবনায় রয়েছে। অবশ্য পড়া হবে না—কলেজ থেকে চলে আসতে হতে পারে শাস্তি হিসাবে—এসব নিয়ে ভাবে না সে। কলেজে তার প্রতিষ্ঠার শেষ হয়ে যাবে—এইটাই ভাবতে পারছে না। আর এসব ঘটবে একজন মেয়ের জন্য। এই অপমানটাই ভুলতে পারছে না সে।

কি করা যায়, ভাবছে এমন সময় নন্দনকে ঢুকতে দেখে চাইল চন্দন।

—দাদা! গুডমর্নিং—! বসো।

নন্দন ব্রেকফাষ্ট সেরে অফিস বের হবার জন্য তৈরী হয়েই এসেছে।

নন্দন বলে—বের হতে হবে চন্দন। বসার সময় নেই। একা আর সামলাতে পারছি না। বাবা তো অসুস্থ—এবার মর তুই। তাই বলছিলাম পরীক্ষা দিয়ে এবার তুমিও অফিসে এসো।

চন্দন চমকে ওঠে।

—ওরে বাবা অফিস—দশটা থেকে পাঁচটা চার দেওয়ালে বন্ধ হয়ে থাকতে হবে আর মাথা গংজে ফাইলের কাজ হিসাব পত্র।

নন্দন ওর জবাবে খুশীই হয়। মাঝে মাঝে কথাটা ওইভাবে বলে নন্দন চন্দনের মনের ভাবটা বোঝার চেষ্টা করে।

নন্দন বলে—তা দেখতে হবে বৈকি। ব্যবসায় হিসাবটাই তো বড় কথা।

চন্দন বলে—ওসব তুমি দেখছো—দ্যাখো। আমাকে ওসবের মধ্যে টেনো না নন্দনদা – ওসব আমার ধাতে সইবে না।

নন্দন ওর কথায় মনে মনে খুশিই হয়।

ওর ধাত পাত বোঝে নন্দন। বড়লোকের ছেলেরা অমনিই হয়। হোক, তাতে নন্দনেরই সুবিধা।

নন্দন এবার এটাচি থেকে বেশ কিছু টাকা বের করে। বলে,—এটা রাখো। মানে খরচাপত্র তো আছে।

আর চন্দন, ড্রিংক করাটা নিন্দে করি না। তবে বেশী করো না—আর বাজে জিনিস খাবে না। ওতে শরীর নষ্ট হয়ে যায়।

চন্দন টাকাটা হাতে পেয়ে খুশীই হয়।

ইদানিং খরচাও বেড়েছে। টাকা ছড়িয়ে বেশ কিছু ছেলেকে হাতে আনতে হচ্ছে। চন্দন বলে,

—না-না। সামান্য একটু খাই মাত্র। তাও কালে ভদ্রিষ্যে। এনিয়ে তুমি ভেবনা নন্দন দা।

অবশ্য নন্দনের এনিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই।

চন্দন বলে—টাকাটার খুব দরকার ছিল, ধন্যবাদ।

নন্দন শোনায়—ধন্যবাদের কিছুই নেই। টাকার দরকার হলে জানাবে, চলি।

চন্দনের হাতে টাকা এলেই চন্দন খুশী।

বিকাল বেলাতেই বের হয় চন্দন, তার বন্ধুর দলও জানতে পারে, চন্দনের পকেটের স্বাস্থ্য আজ ভালোই। তাই তারাও দলবেঁধে হাজির হয়। শহরের নামী বারে বান্ধবীদের নিয়ে মদ্যপান এর পর গোলাপী চোখে তারা অনেক স্বপ্ন দেখে।

চন্দনের মনে হয় সে যেন কোন রাজকুমার, স্বপ্নরাজ্যে পরীদের ভিড়ে হারিয়ে গেছে।

অবশ্য নন্দনও কম যায় না।

সহজেই অনেক কিছু পেলে তার উপভোগের ইচ্ছাটা বেশ বেড়ে ওঠে। তবে নন্দন কিছুটা সাবধানী আর হিসাবী। সে প্রকাশ্য বারে বান্ধবীদের নিয়ে হৈ চৈ করে মদ গেলে না। মাতালও হয় না।

শহরের অন্যতম সেরা বাইজী রুমি। উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে এসেছিল রুমি বাইজী, এখানে কোন বিরাট চা বাগানের মালিকের ছেলের বিয়ের মুজরো নিয়ে। তখন এসে এখানের সমাজে কিছু রসিক ব্যক্তির সন্ধান পেয়ে রুমি আর লক্ষ্ণৌ ফিরে যায় নি।

এই শহরেই রয়ে গেছে।

তার নাচগানের ভক্তও অনেক। এখন নন্দনও তার গুণমুগ্ধ।

তাই নন্দন আসে রুমি বাঈ এর কুঠিতে—রাত অবধি নাচ গান জমে ওঠে নন্দনের, চন্দনের মত এত বন্ধু নেই—দু' একজন স্তাবক থাকে মাত্র।

তাই নন্দন বেশ নিরিবিলিতে রুমি বাঈ-এর নাচ গান উপভোগ করে পান ভোজন সেরে মাঝ রাতে বাড়ি ফেরে।

চন্দনেরও ফেরার ঠিক নেই।

এ বাড়ির জীবনটা এক ছন্নছাড়া ছন্দে চলেছে। সব এখানে এক একটি যেন নির্জন, নিঃসঙ্গ দ্বীপ। তারা কেউ কারো সঙ্গে যুক্ত নয়। বিচ্ছিন্ন—তাদের প্রত্যেককে ঘিরে রয়েছে কোন অবিশ্বাস—স্বার্থের অতল সমুদ্র। এ বাড়িতে এ ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু এ ছাড়াও জীবন আছে। তার নিজস্ব শান্ত সুন্দর একটি ধারা আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে সমাজের অনেকের জীবনে, অনেক পরিবারে।

সেখানে প্রাচুর্য নেই—তাই অপচয়, বঞ্চনা নেই। আছে ভালোবাসা। পরস্পরের জন্য ভাবনা।

সমরেশবাবু মাষ্টারি আর পড়াশোনা নিয়েই ডুবে থাকেন। খেয়ালই থাকে না কখন দশটা বাজতে চলেছে।

অপরাজিতাও নিজের পড়া নিয়ে ব্যস্ত। ওদিকে সংসারের সব ঠ্যালা সামলাতে হয় মৃন্ময়ীকে।

তবু অপরাজিতা অবসর পেলেই মাকে সাহায্য করে। ঘর গুছিয়ে রাখে। আর বাবার ছত্রাকার করে ছড়ানো জিনিষ পত্রের হিসাব তাকেই রাখতে হয়।

সমরেশবাবু কোন দিন দেরী করে স্কুলে যান নি। তিনি বলেন—

নিজে যদি সময়ানুবর্তিতায় বিশ্বাস না করি, না মানি, তাহলে ছাত্রদের বলবো কি করে সেটা মানতে।

তাই স্কুলে বের হবার আগে এ বাড়িতে ছোটখাটো ঝড় বয়ে যায়। সমরেশবাবু হাতড়াতে থাকেন,

—আমার ঘড়ি, ছাতা—কলম—

মৃন্ময়ী ওদিকে উনুনে ডাল চাপিয়েছে। তার ফুরসৎ নেই। অপরাজিতাই এগিয়ে আসে।

—এই নাও বাপি তোমার ঘড়ি-কলম-ছাতা রুমাল আর টিফিন বাক্স। খাবে কিন্তু।

—কেন খাই তো।

অপু বলে—কাল পুরো কৌটোই ফেরৎ এনেছিলে। এবার খেয়াল হয় সমরেশের—তাই তো। খেয়ালই ছিল না। একটা বাড়তি ক্লাস নিতে হলো।

—আজ খাবে কিন্তু।

—হ্যাঁরে। আর তোর মাকে বলবি—স্কুল থেকে বের হয়ে সুবিনয়ের বাড়ি যাবো। ফিরতে দেরী হতে পারে। কাল ফোন করেছিল।

অপরাজিতা ঘাড় নাড়ে। সমরেশবাবু বলেন—হ্যাঁরে, ওর ছেলে শুভোর সঙ্গে দেখা হয়েছে? তোদের কলেজেই তো পড়ে।

অপরাজিতার মুখে কেমন সলজ্জ আভা ফুটে ওঠে। শুভোর সঙ্গে আলাপের ঘটনাটা জানাতে কেমন যেন লজ্জা করে। বলে সে—হয়ে যাবে এক-দিন পরিচয়।

সমরেশ বলে—করে নিবি। দারুণ ভালো ছেলে। স্কলার।

ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে—ইস—দশটা বাজে। তোর কলেজ নেই?

—এগারোটায় ক্লাশ।

—সাবধানে যাবি।

সমরেশ বের হয়ে পড়ে।

শহরের রাস্তায় তখন জনস্রোত বয়ে চলেছে। বাসে ওঠারও উপায় নেই। বাদুড়ঝোলা হয়ে তখনও চলেছে যাত্রীরা। অপরাজিতা দাঁড়িয়ে আছে বাসের অপেক্ষায়। টাউনে বাস-এর সংখ্যাও কম।

যদি কোন শেয়ারে অটো মেলে সেই চেষ্টাই করছে। কিন্তু তাও মিলছে না।

হঠাৎ নজরে পড়ে অপরাজিতার, চৌরাস্তার মোড়ে একজন ট্রাফিক পুলিশ একঠেলাওয়ালাকে ধরে বেদম পিটাচ্ছে। বেচারা ঠ্যালাটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছিল, আর চারিদিকে গাড়ির ভিড় জমে গেছে।

ওকে ওই ভাবে মারতে দেখে এগিয়ে যায় অপরাজিতা। ট্রাফিক পুলিসকে গিয়ে বলে—ওকে ওভাবে মারছ কেন? বে-আইনী কাজ করেছে কেস দেবে। ছেড়ে দাও ওকে!

ট্রাফিক পুলিশ ওসব কথা কানে তোলার দরকার মনে করে না। সে তখন শিকার ধরেছে—গ্রাস করতে চায়। বলে ঠ্যালাওয়ালাকে—নিকাল পঞ্চাশ রুপেয়া। জলদি—

ঠ্যালাওয়ালার অত টাকা নেই। তাই বলে সে—মাফ্ কিজিয়ে মালিক, গরীব আদমী—

ট্রাফিক পুলিশটা টাকা পায়নি। সুতরাং আবার একটা থাপ্পড় কসে গর্জায়—নিকাল রুপিয়া—

অপরাজিতা বলে—মারবে আবার ঘুসও নেবে। এবার পুলিশী মেজাজে লাগে কথাটা। চাইল সে মেয়েটির দিকে। বলে সে,

—চলা যাইয়ে, ঝামেলা মৎ কিজিয়ে। আবে—নিকাল রুপিয়া।

অপু এবার বলে বেশ জোরালো গলায়—ঘুস নিতে লজ্জা করে না। তাও জোর জবরদস্তি—বেশ ডিউটি করছো দেখছি!

পুলিশ পুঙ্গব এবার তার অধিকার নিয়ে পথের লোকজনকে কথা বলতে দেখে শোনায় বীরদর্পে,

—চলা যাইয়ে নেহিতো আপ্‌কো ভি থানামে লে যায়েগা।

এদিকে কোন দিকেই সিগন্যাল না পেয়ে চৌরাস্তার মোড়ে চারিদিকে গাড়ির ভিড় জমে গেছে। ওরই একটা গাড়ি থেকে একজন সৌম্যদর্শন স্যুট পরা ভদ্রলোক এগিয়ে এসে ট্রাফিক পুলিশের কাণ্ড দেখে বলেন—এটা কি হচ্ছে? এই ডিউটি করছেন!

পুলিশ এবার চটে গিয়ে ভদ্রলোকের দিকে চাইতেই তার পিছনে উর্দিপরা বডিগার্ডকে দেখে ভদ্রলোকের পরিচয় জেনে পরম বিনয়ী কর্তব্যপরায়ণ পুলিশের মত স্যালুট করে।

অপরাজিতা চেয়ে দেখে ভদ্রলোককে।

তাদের পাড়ার ওদিকেই একটা কম্পাউণ্ডওয়ালা বড় বাড়িতে থাকেন। গেটে পাহারা।

এখানের কোর্টের জজসাহেব।

পুলিশটা এর মধ্যে তার কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে। ইশারা করতেই ঠ্যালাওয়ালা রাস্তা ফাঁকা পেয়ে ঠ্যালা নিয়ে সোজা দৌড় মারে। প্রমাণ লোপাট করে দিলেও জজসাহেব বলেন তাকে,

—এবারের মত ছেড়ে দিলাম। ভবিষ্যৎ-এ সাবধান হবে আশা করি। উনি ঠিকই বলছিলেন—

পুলিশটা মাথা নীচু করে শোনে।

জজসাহেব দেখছে অপরাজিতাকে।

অপু বলে—আপনাকে চিনি স্যার। আমিও আপনার বাংলোর ওদিকেই থাকি।

জজসাহেব বলেন—অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে আমরা ভুলে গেছি, তাই সমাজের সব স্তরেই অন্যায় বেড়েছে। আজ এই প্রতিবাদ করে ভালোই করেছো তুমি। কি নাম তোমার ?

অপু জবাব দেয়—অপরাজিতা ঘোষ।

—অপরাজিতা! জজসাহেব বলেন—জীবনের যুদ্ধে অপরাজিতাই থাকতে হবে।

ভদ্রলোক চলে যান তার গাড়িতে।

পিছনে একটা ফাঁকা অটো পেয়ে তাতেই ওঠে অপরাজিতা।

এতক্ষণে খেয়াল হয় অপরাজিতার, রাস্তার ওই গোলমালে বেশ কিছুক্ষণ দেরী হয়ে গেছে তার। কলেজে ক্লাশ বোধ হয় শুরু হয়ে গেছে।

হন্তদন্ত হয়ে কলেজের গেট পার হয়ে এগিয়ে চলেছে অপু। হঠাৎ ইরা, মধুমতীকে দেখে চাইল।

মধুমতী বলে—কোথায় ছিলি এতক্ষণ!

—আর বলিসনা, পথে দেরী হয়ে গেল।

অপুর কথায় ইরা বলে,

—আজ কলেজ কমিটির মিটিং, তোকে প্রিন্সিপ্যাল খুঁজছেন কখন থেকে। বলেছেন এলেই তার ঘরে যেতে।

অবাক হয় অপু—কেনরে? আবার কি হলো?

—তা জানিনা। গিয়েই দেখগে।

প্রিন্সিপ্যালের সেই গোলমালের রিপোর্ট পেয়ে কলেজ কমিটি এবার

কড়া স্টেপ নিতে চান। তাদের কলেজের একটা ট্রাডিশন আছে, সুনাম আছে। এই কলেজে এখনও পড়াশোনা হয়। কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ ব্যানার্জি নিজে একজন বড় বৈজ্ঞানিক। বিরাট চা বাগানের মালিক। তিনি চায়ের একজন বিশেষজ্ঞ। সারা ভারত কেন, ভারতের বাইরে তাঁর পরিচিতি। চায়ের উন্নতিতে তাঁর অবদান সর্বজনস্বীকৃত।

ডঃ ব্যানার্জি এমনিতে বেশ কড়া ধাতের লোক। তাঁর জন্যই কলেজে এখন ডিসিপ্লিন বজায় আছে। কারো নির্দেশ তিনি মানেন না। ওই সব আন্দোলন—ধর্মঘটের খবর পেয়ে তিনি নিজেই ওই ব্যাপারে স্টেপ নিতে চান।

আজ তাই এসেছেন, আর এই মিটিং এ তিনিই চেয়ারম্যান।

অপু ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢোকে।

—মে আই কাম ইন স্যার!

ডঃ ব্যানার্জী পুরু লেন্সের ফাঁক দিয়ে দেখছেন ওকে সন্ধানী দৃষ্টিতে। অপুও দেখছে ওঁকে।

মুখে দাড়ি—মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলো এলোমেলো। অবিন্যস্ত।

প্রিন্সিপ্যাল অপুকে দেখে বলেন,

—এসো।

তিনিই ডঃ ব্যানার্জীকে জানান—স্যার, এই মেয়েটির কথাই বলছিলাম। ও একাই সেদিন এগিয়ে এসে প্রথমে প্রতিবাদ জানায়। ওই ছেলেদের সব গোলমাল থামিয়ে দিয়ে ক্লাশ চালু করে ওই অপরাজিতাই।

ডঃ ব্যানার্জী দেখছেন ওকে।

—গুড। ভেরি গুড। অপরাজিতা—

ভেরি সিগ্নিফিকেণ্ট নেম, ওই কাওয়ার্ডদের সঠিক জবাবই দিয়েছ মা। আজ এমনি প্রতিবাদের দরকার। কল দ্যাট বয়।

চন্দন ভাবতে পারেনি যে কোন দিন তাকে এই ভাবে কর্তাদের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়াতে হবে, তার কাজের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

ডঃ ব্যানার্জি বলেন—শোন ইয়ং ম্যান, আজ সমাজের চারিদিকে নৈরাজ্য, অক্ষমের আস্ফালন, শিক্ষা ক্ষেত্রে ওই আস্ফালন আমরা সইব না। পলিটিক্সের পুলটিস দিয়ে স্বৈরাচার চালাতে দেব না। আই এম দি লাষ্ট পারসন, কেন ও সব করেছিলে? লেখাপড়া করতে না চাও কলেজে এসো না।

চুপ করে থাকে চন্দন।

ঘামছে সে, ডঃ ব্যানার্জি বলেন,

—আজ চারিদিকে দূষণ—পলিউশন। শিক্ষাক্ষেত্রে সেটা ঢুকতে দিতে চাই না। তাই ইউ মর্কট—তোমাকে লাষ্ট চান্স দিচ্ছি। এরপর সাবধান না হলে তোমাকে কলেজ থেকে রাস্টিকেট করে দেওয়া হবে, ইউ গেট অউট।

মাথা নীচু করে চন্দন বের হয়ে গেল।

সারা ঘরে একটা স্তব্ধতা নামে। অপু বলে—

—আমি যেতে পারি স্যার।

ডঃ ব্যানার্জির খেয়াল হয়।

—ও হ্যাঁ, তুমি যেতে পারো।

পা বাড়িয়েছে অপু, হঠাৎ ডঃ ব্যানার্জি বলেন—তোমার প্রাইজ নিয়ে যাবে না? হিয়ার ইট ইজ, নাও।

কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এবার ডঃ ব্যানার্জি এক মুঠো টফি বের করে এগিয়ে দেন।

অবাক হয় অপরাজিতা, ওর ওই পুরস্কার দেখে।

ইতস্ততঃ করছে অপু, বিস্ময়ে সে হতবাক। ডঃ ব্যানার্জি বলেন—নাও।

টফিগুলো ওর হাতে তুলে দিয়ে তার থেকে একটা টফি নিয়ে নিজের মুখে পুরে হো হো করে হাসতে থাকেন জ্ঞানবৃদ্ধ তপস্বী।

ওকে প্রণাম করে অপু।

দেওয়ালের কান আছে।

চন্দনের ওই ধোলাই আর শাসানির খবরটা কলেজে ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই খুশী হয়। ছাত্র ইউনিয়নও বুঝেছে চন্দনকে নিয়ে এখন আর তাদের কাজ হবে না। তাতে ইউনিয়নই ভেঙ্গে যাবে।

তাই তারাও সিদ্ধান্ত নেয় চন্দনকে রিজাইন করাতে হবে।

খবরটা চন্দনকে এখনও জানায় নি তারা। কিন্তু চন্দনকে ওরা এড়িয়ে যায়। আর একদল চায় অপরাজিতাকে ছাত্র ইউনিয়নে আনতে হবে।

শুভব্রত তাদেরই একজন।

প্রিন্সিপালের ঘর থেকে বের হতেই শুভব্রতই এগিয়ে আসে।

—কনগ্রাচুলেসনস্ অপরাজিতা, আজ দেখালে তুমি যে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যায়।

ইরা, মধুমতীও এগিয়ে আসে।

অপরাজিতা ওদের সেই টফির ভাগ দেয়। ওরাও অবাক হয় সব শুনে।

—বলিস কি রে ডঃ ব্যানার্জি'র মত গুরুগম্ভীর লোক টফি খায়।

বিকাল ন্যামছে। কলেজ থেকে বের হয়েছে অপরাজিতা। মন্দিরে যায় আজ। তার মনে হয় মনের জোর পেতে ওই পরিবেশ যেন অনেকখানি সাহায্য করে। ধর্ম-ঈশ্বর-দেবতার স্বরূপ কি তা জানে না, কিন্তু এই লাভ যদি হয় তাকে মানতে দোষ কি!

আজ একা নয়, অপরাজিতার মুখে দেবতার ওই ব্যাখ্যা শুনে শুভব্রতও বলে,

—বিনা মাশুলে যদি কিছু লাভ হয় নিশ্চয়ই যাবো। চলো।

অপরাজিতা বলে—দেবতার কাছে কিছু পাবার আশায় গেলে কিন্তু ঠকতে হবে।

শুভ বলে—দেখা যাক।

অপুকে মন্দিরের অনেকেই চেনে। পুজারীও ওকে চরণামৃত দেন। শুভকেও।

—এটি ?

অপরাজিতা বলে—আমাদের কলেজের বন্ধু।

—প্রসাদ নিয়ে যেও মা।

মন্দির থেকে বের হতে দেরী হয়ে যায় ওদের।

দুজনে বের হয়ে চলেছে শহরের দিকে। পথটা নির্জনই।

শুভব্রত বলে—মন্দিরের ওরা কি ভাবছিল!

অপরাজিতা চুপ করে থাকে। ওর সান্নিধ্যটুকু আজ অপরাজিতার মনে কি এক নতুন সুর আনে।

হঠাৎ সেই পরিবেশে মটর বাইকের কর্কশ শব্দ শুনে চাইল অপু।

চন্দনের মনে রাগটা জমে উঠছে। এতদিন সে যা করেছে অন্যরা তাই মেনে নিয়েছে। কলেজে সকলেই তাকে ভয় করতো। কিন্তু আজ সেই প্রতিষ্ঠার জগৎ থেকে ওকে উপড়ে ফেলতে চায়, ওই মেয়েটি।

চন্দন-এর দলবল অপুর গতিবিধির খবর রাখে।

তাই এখানে এসেছে চন্দন—অপুকে আজ সেও স্পষ্টভাষায় সাবধান করে দেবে। ভবিষ্যতে ফের তার পিছনে লাগলে চন্দন ওকে ছেড়ে দেবে না।

কিন্তু একা নয়—আজ শুভোর সঙ্গে ওকে দেখে চন্দনরা একটু অবাক হয়।

মণ্টু বলে—সেই ছোড়াটা সঙ্গে রয়েছে গুরু।

চন্দনও দেখছে ওদের।

কি ভেবে মটর বাইক নিয়ে এগিয়ে গেল—যেন এই পথ দিয়েই তারাও যাচ্ছে। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি।

অপু ব্যাপারটা দেখে। সে বুঝেছে ওদের আসার কারণটা।

শুভো বলে—ছেলেটা এত কাণ্ডের পর বোধ হয় একটু সমঝেছে।

জবাব দিল না অপু।

শুভো তবু বলে—চলনা, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।

অপু বলে—তার দরকার হবে না। ওদের ভয় করি না।

হাসে শুভ—না-না, দরকার আমার আছে কাকাবাবুর কাছে। একটা বই দেবেন বলেছিলেন।

সমরেশবাবুও খুশী হন শুভোকে দেখে। হাতের কাজ ফেলে বলেন—এসো। শুভো।

মৃন্ময়ীও এসে হাজির হয়। সমরেশবাবু বলেন—এলে তাহলে। বইটা এনে রেখেছি। আর তোমার বাবাকে একটা চিঠি দিতে হবে। সামনের সপ্তাহে কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের মিটিং—সুবিনয় যেন অতি অবশ্যই যায়। অনেকেই আসবে।

মৃন্ময়ী বলে—কলেজ থেকে ফিরছো—চা, জলখাবার আনি। তুমি বরং হাতমুখ ধুয়ে নাও বাবা।

শুভব্রত বলে—এখুনিতো বাড়ি ফিরবো, এসব আবার কেন কাকীমা!

সুবিনয়বাবু খোলা মনের মানুষ। এতদিন প্রবাসে ভালো চাকরী করেছেন। সঞ্চয়ও মন্দ করেননি। রিটায়ার করে কলকাতায় ফিরে পৈত্রিক বাড়িটাকে নতুন করে গড়েছেন। এসব ব্যাপারে তার স্ত্রী কামিনী দেবীর ভূমিকাই প্রধান। সুবিনয় রিটায়ার করলেও কামিনী দেবী এখনও জাঁদরেল মেমসাহেবই ভাবে নিজেকে। তার চালচলন একটু কড়া মেজাজের, আর বেশ চড়া সুরেই বাঁধা তার কথাবার্তা।

কামিনী এ বন্ধুত্বের ধার ধারে না।

নিজের ছেলের সম্বন্ধে তার আশা একটু বেশীই। ভালো ছেলে। ভালো চাকরী করবে—বৌ আনবে কামিনী নিজে দেখে।

তাই স্বামী অন্যত্র বিয়ের কথা বলায় কামিনী শোনায়—রাম না হতেই রামায়ণ সুরু হয়ে গেল, ছেলে পাশ করুক, চাকরী করুক তবেই তো বিয়ে।

সুবিনয়বাবু বলেন—চাকরীর ব্যবস্থাতো হয়েই আছে শুভোর। পাশ করলেই চাকরীতে ঢুকবে—বিয়ে না হয় তখনই হবে। ক'মাস এর ব্যাপার। তার আগে দেখেই এসো মেয়েটিকে।

অবশ্য অপুকে আগে দেখেছো। এখন দেখলে তোমারও পছন্দ হবে।

শুভো বাড়ি ঢুকছে।

সে হাওয়ায় শুনেছে দুই পরিবারের মধ্যে তাদের বিয়ের কথা উঠেছে তার বাবার আগ্রহেই।

সে জানে মাকেও রাজী হতে হবে বাবার জন্যই।

শুভ নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো বাবা মায়ের কথাগুলো না শোনার ভান করে, মনে মনে খুশীই হয় সে। ক'দিনেই সে যতটুকু চিনেছে অপরাজিতাকে তার ভালোই লেগেছে মেয়েটিকে।

ওকে মনে হয় অনেক দিনের চেনা জানা।

ওর সান্নিধ্যটুকুও ভালো লাগে। কলেজের মধ্যে অন্যতম সেরা মেয়ে। বহুজনের দৃষ্টি ওর দিকে।

তাদের সকলকে দেখাতে পারবে শুভো—অপরাজিতা তারই হবে একদিন।

বাবা মাকে দেখাবার জন্য অপরাজিতার ছবিও একটা এনেছে। শুভো দেখে, মা ছবিটা একবার চোখ বুলিয়ে টেবিলে রেখে বলে স্বামীকে—তোমার যখন এত পছন্দ—দ্যাখো। ছেলেটার চাকরী হোক—তখনই বিয়ে হবে।

মা যে খুব খুশী হয়ে মত দিল, এটা মনে হ'ল না। তবে আপত্তিও জানায় নি।

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। মা কোন মন্দিরে পাঠ শুনতে গেছে। বাবাও এ সময় নদীর ধারে একটু বেড়াতে বের হয়।

শুভো বাড়িতে রয়েছে। কি ভেবে মায়ের ঘরে ঢোকে। টেবিলে রাখা চিঠিপত্রের তাড়ার নীচে থেকে অপরাজিতার ছবিটা বের করে নিয়ে আসে নিজের ঘরে।

দেখছে ছবিটা।

শুভোকে কেমন নেশার মত টানে ওই দুটো চোখ। অজানতেই সে অপরাজিতাকে ভালোবেসে ফেলে।

মা মন্দির থেকে ফিরেছে।

ছবিটা আর মায়ের ঘরে রাখা হয় না। তাড়াতাড়ি একটা বই এর মধ্যে রেখে শুভো পড়ার ভান করে।

মা অবশ্য শুভোর মনের ঝড়ের কোন খবরই পায় না। মা নিজের ঘরে চলে গেল একবার ছেলের দিকে চেয়ে।

চন্দন ওই অপমানটাকে ভোলেনি, ভুলতে পারে নি। কলেজে আসে যায়, —আর সেই মস্তানিটা নেই। কলেজের অনেকেই অবাক হয় চন্দনের এই পরিবর্তনে।

চন্দন তার সেই ক'জন সঙ্গীকে নিয়েই থাকে—আর নজর রাখে ওই অপরাজিতার উপর। মনের জ্বালাটাকে চেপে রাখে মাত্র।

কিন্তু সেটা যেন ঠেলে আসতে চায়।

ইরা, মধুমতীরা দেখছে ইদানীং অপরাজিতা ওই শুভোর সঙ্গে মেশে। কলেজের পর দুজনে বের হয়ে যায়। একসঙ্গে ফেরে।

মধুমতী বলে—কি রে অপু, আজকাল দেখি কলেজের পর দুজনে ফিরিস।

ইরা শোনায়—কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। আর মধুমতী—তুইও তো শশাঙ্কের সঙ্গে ঘুরিস, তাতে দোষ নেই। ও ঘুরলেই দোষ। তুই ঘাবড়াস না অপু—চালিয়ে যা।

অপু বলে—চোরের মন বোচকার দিকে। একসঙ্গে বাড়ি ফিরলেই ব্যস—প্রেমে পড়ে গেলাম! এত সোজা নয় রে।

ইরা বলে—তুই প্রেমে না পড়িস—অন্যজন তো পড়তে পারে।

—এক তরফা প্রেম হয় না। জবাব দেয় অপু।

শীতের দুপুর।

কলেজে দুটো পিরিয়ড ওদের অফ্। তাই বিস্তীর্ণ কলেজের মাঠে ওরা বসে আড্ডা জমাচ্ছে—

হঠাৎ দেখা যায় শুভোকে। সেও লাইব্রেরী থেকে বের হয়ে আসছে এদিকে।

শুভো অবশ্য কলেজে অপুর সঙ্গে দু'একটা কথা বলে মাত্র, তাদের ঘনিষ্ঠতাটা সে দেখাতে বা প্রকাশ করতে চায় না।

শুভোর বাবা কলেজের রি-ইউনিয়ন নিয়ে তার সহপাঠী অপুর বাবাকে একটা চিঠি দিয়েছেন—শুভো কলেজে এসে অপুকে দেখে ওর হাতেই সেই চিঠিটা তার বাবাকে দিতে বলার জন্যই আসছে।

মধুমতী, ইরা কিন্তু শুভোকে আসতে দেখে বলে—অপু, তোর শুভো

আসছে রে।

অপুও দেখেছে, ইরা বলে।

—হংস মধ্যে বকো যথা—চলরে মধুমতী, ওদের দুজনের নিভৃত আলাপে বাধা দিস না। চলি রে অপু—বেস্ট অব দি লাক্।

অপরাজিতা বলে—খবরদার যাবি না, বোসতো—

শম্ভো এসে পড়ে।

অপু শুধোয়—কি ব্যাপার? এখানে?

ওর কথার সুরে যেন চাপা ধমকের কাঠিন্যই ফুটে ওঠে। শম্ভো একটু থতমত খেয়ে বলে—না! ইয়ে আপনাকে দেখেই এলাম—

—দেখেছেন তো। এবার যান! অপু যেন ধমকাচ্ছে ওকে।

শম্ভো বলে—যাচ্ছি—যাচ্ছি। মানে বাবা আপনার বাবাকে একটা চিঠি দিয়েছেন—সেটা যদি আপনি বাড়িতে দেন তাই এসেছি, আজ আমার যাবার সময় হবে না। তাই—

চিঠিখানা শম্ভো বের করে অপুর হাতে দেয়। অপু গম্ভীর ভাবে বলে—ঠিক আছে, যান।

কিন্তু ঘটনাটা এর মধ্যেই ঘটে গেছে। শম্ভোও ভাবতে পারেনি যে এমনি একটা সাংঘাতির ব্যাপার ঘটে যাবে।

অপুর সেই ছবিটা সেদিন একটা বইএর মধ্যে রেখেছিল শম্ভো। আজ সেই বইটা ও এনেছে কলেজে। আর অপুকে চিঠিখানা দেবার সময় হঠাৎ সেই বইএর ফাঁক থেকে অপুর ছবিটাও পড়ে যায়।

আর পড়বিতো পড় ওই মধুমতীর নজরেই পড়ে ছবিটা। ইরা কৌতূহলী ভাবে ছবিটা তুলে এবার ব্যাপারটা বুঝে হেসে ফেলে।

বলে সে—ওরে অপু, শম্ভোবাবু তোর ছবি বুকে করে রেখেছে।

মধুমতী বলে—তাই তো দেখছি।

অপরাজিতাও ভাবতে পারে নি যে শম্ভো তার ছবি নিয়ে ঘুরবে। শম্ভোও রীতিমত অপ্রস্তুত।

অপু বলে—ও ছবি কোথায় পেলেন?

আমতা আমতা করে শম্ভো।—না। মানে—ইয়ে—

অপরাজিতা বলে—ছিঃ! এসব ঘটাবেন তা স্বপ্নেও ভাবিনি। দিন ছবিটা—

ইরা বলে—একদম ধমকাবিনা অপু। ও ছবি ওরই। তুই নিতে পারবি

না।

ইরাই ছবিটা ফেরৎ দেয় শুভোকে—নিন। বুকে রেখে দেবেন।

অপরাজিতা হন্ হন্ করে কলেজের দিকে চলে যায়।

হাসছে মধুমতী, ইরা।

শুভোও বিব্রতবোধ করে। ইরা বলে,

—ঘাবড়াবেন না শুভোবাবু, লেগে থাকুন—জয়ী একদিন হবেনই।

ব্যাপারটা সবই দেখেছে চন্দন ওদিক থেকে। আজ সেও বুঝেছে অপরাজিতা মুখে প্রতিবাদ করলেও মনে মনে ওই শুভোকে ভালোবাসে। নাহলে অপুর মত তেজী মেয়ে ওই ছবি নিয়েই অনর্থ বাধাতো।

কিন্তু সে সব কিছুই করে না। সরে গেল নীরবে।

ওই প্রেমপর্বের গ্রন্থিটাকে চন্দন মোটেই ভালো চোখে দেখে না। ওই মেয়েটি তাকে কঠিন আঘাত করেছে, চন্দনের সাম্রাজ্যের ভিতে ফাটল ধরিয়েছে, তাই চন্দনেরও জেদ চেপে গেছে ওই অপরাজিতাকে জয় করতেই হবে—তা যে ভাবেই হোক। তার কাছে ওকে পাবার পথ একটাই। ভালো কথায় কাজ হবে না তা জানত চন্দন।

তাই সে নিজের পথেই এগোতে চায়। জীবনে সে যা চেয়েছে তা পেয়েছে। তার জন্য যে কোন পথই নিতে পারে সে।

প্রেম ফুলের মতই। সবুজ গাছে ফুল ফোটার প্রস্তুতি চলে অনেক দিন ধরে। কিশলয়ের বুকে আসে কুঁড়ি—সেই কুঁড়ি প্রকৃতির বুক থেকে রূপ রস আহরণ করে নিজেকে প্রস্তুত করে—দীর্ঘদিন সেই প্রস্তুতির পর একদিন সেই কুঁড়ি বিকশিত হয় রূপ রস বর্ণ গন্ধ নিয়ে ফুলের রূপে। ফুলের সৌন্দর্য প্রকাশের আড়ালে এই সাধনার খবর অনেকেই রাখে না। কিন্তু সেটাই কঠিন সত্য। ওই সাধনা না হলে ফুল ফোটে না।

প্রেমও তেমনি, মনের গভীরে তার প্রস্তুতি চলে অনেকদিন ধরে। একটি মন অন্য মনের গহনে নিজেকে হারাবার জন্য সাধনা করে—তারই ফলশ্রুতি হিসাবে দুটি মনে জন্ম নেয় প্রেমের কুঁড়ি—দুটি মনের চাওয়ার রূপ নিয়েই জন্ম নেয় প্রেম—দুটি মনের চাওয়ার স্বপ্ন।

কিন্তু এই সাধনা-প্রস্তুতি পর্বের কোন ভূমিকাই নেই চন্দনের মত প্রকৃতির ছেলেদের কাছে, তাদের সবকিছুই তাৎক্ষণিক। কোন সাধনা প্রস্তুতি প্রতীক্ষার কোন ধৈর্যই তার নেই।

আজ ওই ঘটনার পর চন্দনও যেন কঠিন হয়ে ওঠে। একটা পথ তাকে

নিতেই হবে।

তার সব শান্তি প্রতিষ্ঠাকে তছনছ করে অপরাজিতা শান্তিতে থাকবে তা হতে দেবে না।

বিকাল নেমেছে। কলেজের শেষ পিরিয়ড-এর ক্লাস সেরে ফিরছে অপু, শীতের বিকালের আলো নিভে আসছে।

অপরাজিতা ভেবেছিল শুভো নিশ্চয়ই আজ এগিয়ে আসবে কলেজের পর।

কিন্তু দেখে শুভো সাইকেল নিয়ে চলে গেল বাড়ির দিকে।

একাই ফিরছে অপরাজিতা নির্জন পথ দিয়ে। হঠাৎ মটর বাইকের শব্দ শুনে চাইল।

চন্দন এসে তার পাশেই মটর বাইকটা সশব্দে ব্রেক করে দাঁড়াল। চাইল অপরাজিতা।

চন্দন বলে—ঝগড়াটা মিটিয়ে নিলে হতো না? ক্ষতি যা করার তাতো করেছোই।

অপরাজিতা বলে—ঝগড়া তো নেই—

—তবে!

অপরাজিতা বলে—ঘৃণা!

—এত ঘেন্নার পাত্র আমি? কেন? চন্দন বলে ওঠে।

—সেটা আপনি জানেন। পথ ছাড়ুন!

অপরাজিতা এগিয়ে যেতে চায়। চন্দন-এর সারা মন জ্বলে ওঠে এই অপমানে। বলে সে কঠিন স্বরে, যার পথে আমি দাঁড়াই সহজে তাকে পথ ছেড়ে দিই না।

চাইল অপরাজিতা। বলে সে—তাই নাকি! আমিও জানি কি করে পথ করে নিতে হয়।

—কি করবে?

কথাটা শেষ হয় না। চন্দনের গালে সপাটে চড় মারে অপরাজিতা।

চমকে ওঠে চন্দন। জীবনে সে অনেককেই অকারণে আঘাত করেছে। আর আঘাত করে আনন্দই পেয়েছে, কিন্তু এই প্রথম একটি মেয়ে তার ঔদ্ধত্বের এইভাবে জবাব দিতে চমকে ওঠে চন্দন।

কি করবে বুঝতে পারে না।

ততক্ষণে অপরাজিতা বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে, এখানে রাস্তায় লোকজন রয়েছে। চন্দনের যখন হুঁস ফেরে তখন আর করার কিছু নেই। চলে গেছে অপরাজিতা।

চন্দনের চ্যালা মন্টু বলে—তোমাকে এই ভাবে ইনসাল্ট করে গেল মেয়েটা ?

ধরবো ওকে বস ?

চন্দন বলে—না।

—এমনি ছেড়ে দেবে ?

চন্দন বলে—এর জবাব ঠিক সময়েই দেব ওকে।

আর এমন জবাব দেব—সারাজীবন মনে থাকবে। চন্দনকে চেনেনি ও।

রাগে গরগর করতে করতে বাইকের স্টার্টারে লাথি মারে চন্দন—বাইকটা গর্জন করে ওঠে।

বড় বাড়িটায় দৈনন্দিন কাজ সুরু হয়েছে। জগু মাসীর খাবারের দিকে লোভটা একটু বেশী। এত বয়স হয়েছে, কোন কালে ছেলেবেলায় তার পতিদেবতা দেহত্যাগ করেছিল ঠিক মনে পড়ে না তার। কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকেই নানা শাসন-সংস্কার মেনে চলতে হচ্ছে, তবু ফাঁক পেলে জগু ঠাকরুণ সেই শাসনের বেড়া টপকে এটা সেটা অপবিত্র জিনিষও ভক্ষণ করে। তবে খুবই গোপনে। আর ওসব খাবার চুরির দায় পড়ে বড় বৌ সুজাতার বাপ মরা ছেলে রণি আর রীণার উপরই।

জগুমাসীই নন্দনের বৌ মালাকে বলে—ওই ভিখারীর বাচ্চাদের জন্য কিছু ভালোমন্দ ফ্রিজে রাখার উপায় আছে। চুরি করে সব গিলবে।

মালাও রণিদের ধরেই চড় চাপড় লাগায়। ধমকায়, দেখলে হাত কেটে দেব।

সুজাতাও ছেলেমেয়েকে বলে—

—কেন এসব করিস বাবা ? ভালোমন্দ নাইবা খেলি চুরি করে।

মার খেয়ে রণি বলে—ওসব খাইনি মা। সত্যি বলছি।

রীণাও শোনায়, হ্যাঁ মা।

কিন্তু ওদের কথা কেউ শোনেনা।

তাই রণি, রীণাই নজর রাখে ফ্রিজের উপর। কে আসল চোর তাই ধরতে হবে তাদের।

সুজাতা এ বাড়িতে ওদের দয়ায় আশ্রয় পেয়েছে। যদিও সে ওই বাড়ির অর্থাৎ অমরবাবুর বড় ছেলের স্ত্রী। এ বাড়িতে তার সন্তানদের নায্য দাবী আছে।

কিন্তু অমরবাবুই এখন যেন এই বাড়িতে ওই মহামায়া নন্দনদের আশ্রিত, আর এ বাড়ির ছোট ছেলে চন্দন সংসারের কিছুই দেখে না।

ফলে সুজাতার উপর এতবড় অন্যায়ের প্রতিকার করার কেউ নেই। তাই সুজাতা ছেলেমেয়ের একটু আশ্রয়ের জন্য এবাড়িতে পড়ে আছে।

একমাত্র পুরোনো চাকর যদুই তার দুঃখটা বোঝে, কিন্তু সে তো চাকর মাত্র। তাই সুজাতাকে এ বাড়ির ওইসব মানুষদের মন যুগিয়ে চলতে হয়।

সকাল থেকেই ঝিয়ের মতই খাটতে হয় তাকে। ঠিকে ঝি বাসন মাজতে আসে বেলায়, তার আগেই চা, ব্রেকফাষ্টের আয়োজন করতে হয় সুজাতাকে। এক একজনের এক এক ফরমাস পান থেকে চুন খসলেই তাকে যা তা কথা শোনায়।

ব্রেকফাষ্ট-এর পর রান্নার কাজ শুরু হয়। ঠাকুর একজন আছে, কিন্তু সুজাতাকেও হাত লাগাতে হয়। রকমারি আমিষ, নিরামিষ রান্নার কাজ।

কাজ করছে সুজাতা।

একরাশ বাসন ধুয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে--হঠাৎ হাত ফসকে বাসনগুলো পড়ে যায় সশব্দে।

নিজেও পড়তো, কোনমতে সামলে নেয় সুজাতা।

কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে না। মহামায়া এসে পড়ে, সঙ্গে মালা। মহামায়া বাসনগুলো ছিটিয়ে পড়তে দেখে বলে—ওমা! সর্বস্ব ভাঙ্গবে নাকি?

মালা বলে—তাইতো দেখছি মা। দুটো বাসন ঠিক করে নিয়ে যেতে পারে না।

সুজাতা বলার চেষ্টা করে—হাত ফসকে পড়ে গেল মা।

ফুঁসে ওঠে মহামায়া—থাক। আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, সাফ কথা বলছি বাছা, ঠিকমত কাজ না করতে পারো বিদেয় হও বাড়ি থেকে, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।

সুজাতা মুখ বুজে বাসনগুলো কুড়োচ্ছে হঠাৎ এসে পড়ে অণি।

বেশ উত্তেজিত ভাবেই বলে সে, দেখে যাও মা, আসলে চোর কে! কে ফ্রিজ থেকে খাবার চুরি করে খায়। আর আমাদের নামে দোষ দেয়।

সুজাতার ওসব দেখার মত মনের অবস্থা নেই। তাই চুপ করেই থাকে।

কিন্তু অণি মায়ের মনের খবর জানেনা। আজ সে চোরকে দেখাবেই।

তাই বলে—চল না মা, দেখবে চোরকে—

মহামায়া কথাটা শুনে বলে—চোর তোর সেই পাজি বোনটা; চলতো, আজ দেখছি তাকে, আয় ছোঁড়া—

মহামায়াই ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ওদিককার ঘরে।

জগুমাসী বেশ তারিয়ে তারিয়েই কাটলেটগুলো খাচ্ছে। ছেলেবেলায় তার মাছ ইত্যাদির উপর খুবই নজর ছিল, সেই লোভটা আজও যায়নি, প্রকাশ্যে জগুমাসী বেশ সাত্ত্বিক সেজেই থাকে। একাদশী করে, উপোস-কাপাসও দেয়, গলায় কণ্ঠি নিয়ে কোন গুরুদেবের চরণে আশ্রয় নিয়েছে, হরিনামের ঝুলি হাতে অহরহ নাম জপ করার ভান করে।

কিন্তু আড়ালে নিষিদ্ধ ওই খাদ্যগুলোর উপর নজর থাকে—পেলেই সদ্ব্যবহার করে।

আজ চিংড়ির কাটলেট এনেছে নন্দন কোন বাইরের রেস্তরাঁ থেকে। বেশ স্বাদ, জগুমাসী দুটো শেষ করে তৃতীয়টায় কামড় দিতে যাবে এমন সময় মহামায়াকে সদলবলে ঢুকতে দেখে কোঁৎ করে মালটা গলার ওদিকে পাচার করে গজরায়—কিছু রাখার উপায় আছে ?

দ্যাখ মহামায়া, নন্দন কত করে আনলো খাবারগুলো, এর মধ্যে দু'টো হাপিস। এই যে ছোঁড়া—

অণি বলে—বা রে, তুমি গব গব করে খাচ্ছিলে দেখে ডেকে আনলাম ঠাকুমাকে—কে চোর তাই দেখাতে।

জগু মাসী এবার আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে অণির গালে চড় কসে বলে—

আমি খাবো ওই সব! জিব খসে যাবে তোর—নিজে খেয়ে বলে কিনা আমি খেয়েছি ওসব ? এ ছোড়া ডাকাত হবে বড় হয়ে।

অণি কি বলার চেষ্টা করে।

মহামায়াও বিশ্বাস করে জগুদির কথা। সেও উলটে অণিকে চড় কষিয়ে বলে, চুরি করে আবার বদনাম দিবি। পাজী হারামজাদা।

বেশ কয়েক ঘা-ই পড়ে তার পিঠে।

সুজাতা এসে মুক্ত করে, অণি কাঁদে না। নীরব রাগে জ্বলছে সে, আজ বিনা কারণে তাকে এরা চোরের মারই মারলো।

জগুমাসী তখনও গলা তুলে শোনায়,

—এইসব পাপ, চোরকে তাড়া মহামায়া, এ ছেলে বড় হলে তোর গলাতেই

ছুরি দেবে কোনদিন।

চন্দন বাড়ি ফিরেছে।

দেখে সে ওদিকে ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে আছে সুজাতা। আর অণি মার খেয়ে ছোট কাকাকে দেখে বলে—ছোট কা—আমি চুরি করে খাইনি, চোর ওই জগুদিদা—উল্টে সবাই আমাকে মারলো।

—বেশ গর্জে ওঠে জগু মাসী।

বলে সে—ঘরে যাও বাবা চন্দন, এসব পরগাছাদের মাথায় তুলো না।

চন্দন বাড়ীর কোন ব্যাপারেই থাকে না। তার নিজেকে নিয়েই সে ব্যস্ত। টাকার যোগান ঠিক পেয়ে যায়—তাই চন্দনও এদের কথায় কান দেয় না। উপরে উঠে যায়।

সুজাতা দেখে, বেশ বুঝেছে সে, এ বাড়িতে বিচার সে কোনদিনই পাবে না, মুখবুজে এদের সব অত্যাচার তাদের মেনে নিতে হবে।

ব্যাপারটা দেখে যদু। এ বাড়ির পুরোনো চাকর। সেও জানে জগু মাসীর ওই সব চুরি করে খাবার খবর। অণি আজ হাতেনাতেই ধরেছিল, কিন্তু মহামায়া বা মালা জগুমাসীর দোষটাকে দেখেও দেখেনি।

উল্টে শাসন করছে অণিকেই।

যদু আড়ালে বলে—কেঁদো না অণি, ওসব চোর ধরতেও যেও না। এবাড়ি চোর ডাকাতে ভরে গেছে। কিছু করার নেই।

অণিও যেন বুঝেছে এ বাড়িতে তাদেরই চোরের মার হজম করেই থাকতে হবে, তাদের রক্ষা করার মত কেউই নেই। যে যার নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। কেউ কারোও কথা ভাবে না।

তাই ছোটকাও অনির উপর এই অন্যায়-এর কোন প্রতিবাদই করে নি।

নন্দন ছেলেবেলায় আদরেই মানুষ হয়েছে। পড়াশোনার জন্য অমরবাবু মহামায়ার চাপে তাকে ভালো স্কুলেই ভর্তি করেছিল।

কিন্তু সেই সাহেবী স্কুলে নন্দন লেখাপড়া শেখার চেয়ে অন্য বড়লোকদের বখাটে ছেলেব পাল্লায় পড়ে মদ্যপান করতে শিখেছিল।

সেই বন্ধুদের সঙ্গে মিশে বারে যেতো ক্যাবারে নাচের আসরে। আর যেতো রেসের মাঠে। সেখানেও প্রচুর টাকা ওড়াতে সুরু করে।

আর জানে নন্দন—তার মায়ের হাতেই এই বড় বাড়ির সিন্দুকের চাবি। অমরবাবুর ব্যবসার দু-নম্বরী আমদানীও মন্দ নয়। সবই মায়ের হাতে

থাকে। সুতরাং নানা অজুহাতে সে টাকা নেয় মায়ের কাছ থেকে।

আজ জগুমাসীও এসে জুটেছে। নন্দনের জন্য সেও ওকালতি করে মহামায়ার কাছে—একটা ছেলে তার সাধ আহ্লাদ নেই! টাকা দে ওকে।

নন্দন ক্রমশঃ এ বাড়িতে সবকিছুরই ভার পেয়ে গেছে, অমরবাবু অসুস্থ হবার পর থেকে।

টাকারও ভাবনা নাই।

তাই নন্দন কারখানা অফিসের কাজ সেরে সন্ধার পর বাড়ি ফেরে না। রেসের দিন মাঠেও যায়।

তারপর আসে রিমার এখানে।

রিমার বাড়িটাকে নন্দনই নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছে।

রিমা সহরের বাঈজীপাড়ায় একটি সুপরিচিত নাম। এককালে এই অঞ্চলে বাঈজীদের বেশ রমরমাই ছিল। এখন বাঈজীদের পৃষ্ঠপোষক অর্থাৎ জমিদারদের রমরমা আর নেই।

তবু কিছু ব্যবসাদার তাদের দু-নম্বরী টাকায় মজা লুটতে আসে তাই রিমা বাঈজী কোনমতে টিকে আছে এ পাড়ায় মস্তানদের মুখ বন্ধ করে।

নন্দন আসে এখানে, সঙ্গে দু'একজন চামচাও থাকে। শশীকান্ত তাদেরই একজন। বেঁটে খাটো সিটকে লোকটার নাকি অনেক রকম ধান্দা।

অন্ধকার জগতের দু'একজন বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও তার চেনা জানা। ওই মোসাহেবী করেই শশীকান্তের বেশ ঠাটে বাটেই চলে যায়।

শশীকান্ত ইদানীং নন্দনের উপর ভর করেছে। তাকে রিমার এখানে আনে। মদের আড্ডায় বসে ব্যবসার কথাও হয়।

নন্দনদের কারখানায় ওষুধ কিছু তৈরী হয়—আর তৈরী হয়, কিছু হেভি কেমিক্যাল, সে সব মাল লেবেল সেটে প্যাক করে সারা বাংলার নানা শহরে সাপ্লাই হয়।

শশীকান্তই মতলবটা নন্দনের মাথায় ঢোকায়, কিছু নেশার মাল বাজারে যোগান দিতে পারলে চারগুণ লাভ হয়।

আর ওইসব মাল দিব্যি কারখানার লেবেল সেটে পাচার করলে পুলিশও টের পাবে না। ফাঁক থেকে প্রচুর আমদানীও হবে।

নন্দন ভাবছে কথাটা। টাকার বাদ্যি যেন শুনছে সে।

শুধায় সে—কিন্তু এসব মাল আসবে কোথা থেকে?

শশীকান্ত বলে—সে যোগান ঠিকমতই আসবে।

—কে দেবে ?

শশীকান্তও আসল লোককে চেনে না। অন্ধকার জগতের এই লাখ লাখ টাকার গোপন বেসাতির মূল মালিককে চেনা দায়। তাকে দেখা যায় না।

আড়াল থেকেই সব ব্যবসাটা কোন নিপুণ অদৃশ্য হাতের ভেলকিতে চলে। দেখা যায় নীচু তলার কোন একজনকে। সেও চেনে না আসল ব্যক্তিটিকে। খুব প্রয়োজন না হলে তার দেখাও মেলে না।

শশীকান্ত বলে—'বস' কে এখন দেখা যাবে না, তবে তার লোকজন মাল ঠিকমত সাপ্লাই দেবে। নেমে পড়ুন স্যার, লাখ টাকা লাভ হবে অনায়াসেই, গরীবও টু পাইস পাবে।

নন্দন ভাবছে কথাটা।

বলে সে—এখন মৌজ মস্তি করো। রিমাবাঈএর গান শোন শশীকান্ত। দিন ভোর ব্যবসা করে 'থকে' গেছি। এখন মৌজ করো।

শশীকান্ত দেখছে রিমা বাঈকে।

মেয়েটাকে দারুণ দেখতে—কিন্তু ওসবে নজর দেবার প্রবৃত্তি শশীর নেই। ওসব নন্দনবাবুদের জন্য, সে চিনির বলদ হয়েই রইল। বইছে চিনির বস্তা—কিন্তু বেচারী গাধা তার পিঠের চিনির স্বাদ কোনদিন পায় না।

রিমা বাঈ-এর নাচগান শুরু হয়। নন্দন কোন গোলাপী নেশার জগতে হারিয়ে যায়। হারিয়ে যায় বাড়ির কথা ওই নাচের উদাস ছন্দে।

রাত নামে বড় বাড়িতে।

অমরবাবুর চোখে ঘুম নেই। এতদিনের কাজ করার ক্ষমতা-সেই উদ্যমকে যেন স্তিমিত করে দিয়েছে ওই মহামায়া আর জগু।

সামান্য অসুখে ক'দিন বাড়িতেই ছিলেন অমরবাবু, জগুই মহামায়াকে নানা পরামর্শ দেয়। আর এবাড়ির কর্ত্রী হয়েও মহামায়া তার কথামতোই চলে।

জগুই বলে—ডাক্তার ডাক মহামায়া—নন্দনের চেনাজানা শিবু ডাক্তারকেই ডেকে এনে অমরকে দেখা। কাজের মানুষ, পড়ে থাকলে চলে। এতবড় ব্যবসা পত্র একা নন্দন সামলাতে পারে ?

অমরবাবুর অফিসে ইদানীং নন্দন বের হচ্ছে। অমরবাবু অসুস্থ হওয়ায় তার কাজও বেড়েছে।

অমরবাবুও চান তাড়াতাড়ি সেরে উঠে কাজে যোগদিতে। তাই ওই নতুন ডাক্তারের কথায় অমরবাবু বলেন—কেন আমাদের ডাক্তার রায়কেই

ডাকো। তিনিই তো এতদিন দেখে অসছেন আমাদের।

মহামায়া এর মধ্যে জগদ্দির উপদেশ মতই চলে।

—ওসব বুড়ো হাবড়া ডাক্তার দিয়ে আজকাল চিকিৎসা হয় না। শিবু ডাক্তারেরও খুব নাম। তাকেই ডাকি।

ওই শিবু ডাক্তারের চিকিৎসাতেই রয়েছেন অমরবাবু। কিন্তু বেশ বুঝেছেন অসুখ তো সারেইনি, বরং আরও বেড়েছে। এখন ওইসব কড়া ওষুধ খেয়ে মাথা ঝিম ঝিম করে। চলতে গেলে মাথা টলে, পায়েরও জোর নেই। কেমন যেন এক অসহায় বন্দী অবস্থাতেই রয়েছেন তিনি। বাইরের জগতের সঙ্গে তার কোন যোগসূত্রও নেই। ফোনটাকেও তার ঘর থেকে সরিয়ে দিয়েছে এরা।

আজ অসহায় বৃদ্ধের যেন রাতের অন্ধকারে কি আতঙ্কের স্বপ্ন দেখে ঘুম আসে না।

রাত অনেক।

গাড়ি থামার শব্দে চাইল।

নীচে দেখা যায়, গাড়ি থেকে নন্দন নামছে, কোন রকমে টলতে টলতে সে উঠে গেল।

তখনও চন্দন ফেরেনি। এতরাত অবধি কোথায় থাকে সে জানেন না অমরবাবু। তার গাড়ি ফেরে আরও রাতে।

চন্দনের হেঁটে ওঠার অবস্থা নেই। ড্রাইভার আর যদু দুজনে ধরাধরি করে তাকে দোতলার ঘরে পেঁছে দেয়।

অসহায় অমরবাবু নিজের চোখে দেখেন এই বিচিত্র সন্তানদের। আজ সারা সংসারের উপর যেন একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে তার। দুহাতে টাকাই রোজগার করেছেন তিনি। সমাজে নাম ডাক প্রতিপত্তিও আছে।

কিন্তু শান্তির লেশমাত্র নেই। কারো কাছে কিছু পাননি, দিয়েই গেছেন সব কিছু এই সংসারকে।

সেদিক থেকে সুবিনয়বাবুর সংসারে প্রাচুর্য না থাক শান্তি আছে। আছে খুশীর স্বপ্ন। সমরেশবাবুও আসেন।

এবার দুটি পরিবারের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে চলেছে।

আর এই খবরটা মেনে নিয়েছে অপরাজিতাও। শুভকে তারও ভালো লাগে। শুভোর মত ছেলে তাকে সুখী করতে পারবে সেটা জেনেছে

অপরাজিতা।

শুভোও যেন অপুর পথ চেয়ে থাকে।

কলেজের পর দুজনে কোন কোনদিন কিছু কেনাকাটা করতে না হলে নির্জন সবুজে চলে যায়।

শুভো ওর পথ চেয়ে থাকে।

দেরী হলে অভিমান করে—যদি মন না চায় আসবে না। তাই বলে হাপিত্যেশ করে বসিয়ে রাখবে?

হাসে অপরাজিতা।

—ইস্ বাবুর দেখি খুব রাগ। আর কিছুদিন সবুর করো তখন তোমার ঘরেই তো বন্দী হতে হবে। সেদিন আমিই তোমার পথ চেয়ে থাকবো।

শুভো বলে—বন্দী কেন হবে?

—বৌ মানেই তো বন্দী। অন্ততঃ তোমরা তাই ভাবো।

অপুর কথায় বলে শুভো।

—না। তোমার মত মেয়েকে বন্দী করে রাখার ইচ্ছা নেই।

—তবে?

শুভো বলে—তুমি পড়বে। এম. এ. পাশ করে রিসার্চ—করবে। ডক্টরেট হবে—তারপর কোন কলেজেই পড়াবে।

ওদের ভবিষ্যৎ-জীবনের পরিকল্পনাও করছে তারা দুজনে।

আর এই খবরটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। কলেজের বন্ধু বান্ধবীরাও জেনেছে।

ইরা, মধুমতী তনুশ্রীরা রসিকতা করে।

—কি রে অপু। এদিকে বি-এ পাশ করবি। ওদিকেও বিয়ে?

—তাহলে জোর খাওয়া হচ্ছে!

ইরা বলে—শুভোবাবুর বরাত খুব জোর। নাহলে তোর মত মেয়েকে হাতে পায়! কলেজের কত ছেলের চোখের ঘুম কেড়েছিস তুই জানিস?

অপু এক মিষ্টি স্বপ্নের জগতে রয়ে গেছে। বলে সে—কার চোখের ঘুম কাড়লাম রে? তোরা তো রয়েছিস, বেচারাদের ঘুম পাড়া।

খবরটা শুনেছে চন্দনও।

তার চ্যালা মণ্টু কলেজের সব খবরই রাখে। চন্দনের মন মেজাজ

ভালো নেই। সেদিন ওই অপরাজিতা তাকে চড় মেরেছিল তার চ্যালাদের সামনে, কোন জবাব দিতে পারে নি। আজ চন্দন গাছের নীচে বসে সিগারেট টানছে—মণ্টুই এসে খবর দেয়।

—খবর শুনেছো বস্—ওই ডাটিয়াল মেয়েটার বিয়ে। বিয়ে করছে শুভোকে। তারপর চলে যাবে কলেজ থেকে পাশ করে। ওই চড়ের বদলাও নিতে পারলে না? বলোতো আমিই—

চন্দন কথাটা শুনে সিগারেট টানা বন্ধ করে, চাইল। খবরটা বিশ্বাস হয় না তার।

তাই শুধোয় চন্দন।

—কোথায় শুনলি?

মণ্টু বলে—একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর বস্। ওই এদের প্রাণের বন্ধুদের কাছেই শুনলাম। পরীক্ষার পরই বিয়ে হবে ওদের।

পটলা বলে—কারও পৌষমাস-কারোও সর্বনাশ।

চন্দন উঠে পড়ে।

চাইল এরা। মণ্টু বলে—ক্লাসে যাবে না?

চন্দন জবাব দিল না। এগিয়ে চলে গাড়ির দিকে।

মণ্টু, পটলাও চলেছে সঙ্গে।

কিন্তু চন্দন ওদের না নিয়েই একাই গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যায়।

—বস!

এদের ডাকে কোন সাড়া দেয় না চন্দন। এদের ফেলে রেখেই চলে গেল।

অবাক হয় এরা ওদের গুরুর এই বিচিত্র ব্যবহারে।

বিকালের দিকে আকাশটা কালো মেঘে ছেয়ে যায়। কালবৈশাখীর সময়, আজ যেন মেঘ আরও ঘনঘটায় চারিদিক ভরে দেয়—আর তারপরই ঝড় ওঠে।

সারা আকাশ বাতাসে ঝড়ের মত্তমাতন সুরু হয়। কলেজের বিরাট দেওদার গাছগুলো ঝড়ের দাপটে নুইয়ে পড়ে আবার সোজা হয়ে ওঠে, পরের ঝাপটায় ক্রুদ্ধ ঝড় যেন তাদের উপড়ে ফেলবে।

ধুলো উড়ছে, তারপরই বৃষ্টি নামে। ঝড় বৃষ্টি সমানে চলে কিছুক্ষণ, তারপর ঝড় থেমে আসে, বৃষ্টি সমানে চলেছে। কালো অন্ধকার আকাশের

বুক চিরে আলোর ঝলক ওঠে, বাজ পড়লো কোথাও।

লাষ্ট পিরিয়ডের ক্লাশ শেষ করে অপু দাঁড়িয়ে আছে, সন্ধ্যা নামছে। বাড়ি ফিরতে হবে, বৃষ্টি তখনও থামেনি।

এমনি সময় এগিয়ে আসে শম্ভো।

—এখনও যাও নি?

অপু ওকে দেখে কিছুটা ভরসা পায়, বলে, যা বৃষ্টি নামলো, কখন থামবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। ওদিকে বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে গেল।

শম্ভো দেখছে আকাশের হাল।

কিছুটা বৃষ্টির তোড় কমেছে, বলে সে,

—আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে যাবে বৃষ্টি। তখনই বের হবো। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবো।

দুজনে অপেক্ষা করছে কখন বৃষ্টি কমে। কাছাকাছি অনেকেই চলে গেছে, অন্যরাও যাচ্ছে।

ওদের একটু দূরে যেতে হবে। এসময় রিক্সাও মিলবে কিনা জানে না। তাই বৃষ্টি কিছুটা কমতে শম্ভো বলে—

চলো বের হই।

—ভিজে যাবো যে, অপু বলে।

শম্ভো শোনায়—পথে বের হলে রিক্সাও মিলতে পারে। চলো দেখি, আর কতক্ষণ দাঁড়াবো।

ওরা বের হয় কলেজ থেকে।

এদিকের রাস্তা কিছুটা নির্জন। কারণ কলেজ শহর থেকে একটু দূরে। কিছুটা গেলে তবে শহরের শুরু। এখনও পথের ধারে গাছ গাছালি রয়েছে। বাড়িঘর এখানে কমই।

ঝড় বৃষ্টির জন্য পথটাও নির্জন, লোকজনও তেমন নেই। শম্ভো আর অপরাজিতা চলেছে, তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরছে, দুজনে চলেছে।

হঠাৎ একটা গাড়ি জোরালো হেডলাইট জেলে একেবারে তাদের উপর যেন এসে পড়বে। পথের দুদিকে দুজনে সরে দাঁড়ায়।

গাড়িটা সশব্দে ব্রেক করে থামলো।

আর বিদ্যুতের ঝিলিকে দেখা যায় গাড়ি থেকে নেমেছে চন্দন, চোখ দুটো

লাল—সে সামনে অপ্ুকে পেয়ে এবার ওর হাত ধরে এক ঝটকায় টেনে গাড়িতে তোলে।

বাধা দেবার সময় পায় না অপ্ু। তাকে এক ধাক্কায় গাড়ির পিছনের সিটে বেকায়দায় ফেলে দরজাটা লক করে। ওদিক থেকে ব্যাপারটা দেখে ছ্ুটে আসে শ্ুভো।

কিন্তু সে গাড়ির কাছে আসার আগেই চন্দন ওকে একটা লাথি মারে—অতর্কিত লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ে শ্ুভো।

কপালটা কেটে গেছে—উঠে এগিয়ে আসে গাড়ির দিকে, ততক্ষণে চন্দন গাড়ি স্টার্ট করে ফ্ুল স্পিডে নির্জন রাস্তা দিয়ে গাড়িতে অপ্ুকে নিয়ে বের হয়ে যায়।

শ্ুভো গাড়ির পিছনে দৌড়ে যায় কিন্তু গাড়িটাকে ধরতে পারে না। গাড়িটা বের হয়ে যায়।

অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে কি ভাবছে শ্ুভো, এক ম্ুহ্ুর্তের মধ্যে কাণ্ডটা ঘটে গেছে, হকচকিয়ে গেছে সে।

হঠাৎ একটা প্ুলিস জিপকে আসতে দেখে শ্ুভো। সে বিপজ্জনকভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, দ্ুহাত তুলে গাড়িটাকে থামাবার চেষ্টা করে।

যে কোন কারণেই হোক জিপটা থামতে শ্ুভো এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা জানায়।

—গাড়ির নাম্বার জানেন? প্ুলিশ অফিসার স্ুধায়, ভাগ্যক্রমে শ্ুভোর নাম্বারটা মনে ছিল।

বলে সে। জানায়—সোজা এই পথেই গেছে।

প্ুলিশ অফিসার বলে—আপনি থানায় গিয়ে খবরটা দিন। আমরা দেখছি গাড়িটাকে খ্ুঁজে পাই কিনা।

চন্দনের মত ছেলেরা এক জায়গায় কঠিন-নিষ্ঠ্ুর তারা বাধা পেলে মরীয়া হয়ে ওঠে।

আজ অপ্ুর জন্য চন্দন সেই পথই নিয়েছে। এ তার কাছে নিষ্ঠ্ুর এক খেলা।

নিজের বীরত্ব জাহির করেই ওরা আনন্দ পায়। তাদের কাছে এটা একটা খেলাই। আর নিষ্ঠ্ুর এই সর্বনাশা খেলায় যার যা সর্বনাশ হয় হোক, তাতে ওদের কিছ্ু যায়, আসে না।

তাই চরমপন্থাই নিয়েছে চন্দন। ওই তেজী মেয়েটার সে আজ চরম

সর্বনাশই করবে, যাতে জীবনে আর কোনদিন ওই অপরাজিতা দৃপ্ত ভঙ্গীতে মাথা তুলতে না পারে।

এই হবে তার চরম শাস্তি।

চন্দন পরিকল্পনাটা নিখুঁত ভাবেই করেছে।

নির্জন পথ থেকে অপরাজিতাকে তুলে গাড়িটা নিয়ে এসেছে বড় রাস্তায় ওদিকে তাদের কোম্পানীর একটা পরিত্যক্ত গুদামে।

এই গুদামের একটা ঘরে এর আগেও চন্দন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে, কখনও সহজলভ্যা কোন মেয়েকে নিয়ে এসেছে। এই মধুকুঞ্জে তার প্রায়ই আসর বসে।

দারোয়ানও ছোট মালিকের এই খেয়াল-খুশীর খবর জানে। কিছু বকশিষ পায় সে, তাছাড়া চাকরীর মায়াতেই সেও চুপচাপ থাকে।

আজও বৃষ্টির রাতে মালিককে গাড়ি নিয়ে ঢুকতে দেখে সে না দেখার ভানই করে।

চন্দন গাড়ি শেডের মধ্যে ঢুকিয়ে প্রায়ান্ধকার জায়গাটা থেকে অপুকে মুখ টিপে নামিয়ে টেনে নিয়ে ওদিকের ঘরে ঢোকায়।

অপরাজিতা বাধা দেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু দানবের শক্তি যেন চন্দনের দেহে, সে তাকে টেনে এনে ঘরে ঢোকায়।

আবছা আলো রয়েছে ঘরে।

ওদিকের খাটে তাকে ছিটকে ফেলে চন্দন।

অপরাজিতাও বিপদের গুরুত্ব বুঝে মরীয়া হয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করে ওই দানবকে সর্বশক্তি দিয়ে।

কিন্তু চন্দন আজ কি নেশায় মেতে উঠেছে। প্রতিশোধের নেশায় দানবের পাশব প্রবৃত্তির দস্যুতার কাছে আজ অপরাজিতার সব প্রতিবাদ, প্রতিরোধও তুচ্ছ হয়ে যায়।

তার অসহায় আর্ত চীৎকার ক্ষণিকের জন্য রাতের নীরবতাকে সচকিত করে তোলে মাত্র তারপর কি দুঃসহ অপমান লাঞ্ছনার অতল তমসায় তলিয়ে যায়। তার আর্তকান্না ছাপিয়ে ওঠে সেই পশুর সর্বস্ব লুণ্ঠনের চাপা গর্জন।

পুলিশের জিপটা অন্ধকারে ছুটে আসছে—এদিক ওদিক দেখছে তারা। হঠাৎ পথের ওদিকে ভাঙা গুদামের শেডে কালো একটা গাড়ি দেখে থামলো তারা।

টর্চের আলো জেবলে দেখছে।

অবাক হয় তরুণ পুলিশ অফিসার মিঃ ঘোষাল।

—সেই গাড়িটা না? সেই নম্বরই দেখছি।

নেমে পড়ে মিঃ ঘোষাল দুজন আর্মড গার্ড সঙ্গে নিয়ে, খুঁজছে এদিক ওদিকটায় আলো ফেলে।

—কেউ আছো?

কোনো সাড়া নেই। দারোয়ান পুঙ্গব ভাবতে পারেনি যে পুলিশ এসে হানা দেবে, এবার ঘাবড়ে যায় সে, ছোট মালিককে খবর দেবার উপায়ও নাই।

পুলিশ ওই দরজার মুখেই এসে হাজির হয়েছে।

সে কিছু মালপত্রের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকে, বের হতেও সাহস নেই তার।

নিস্তব্ধ গুদাম।

পুলিশ অফিসারের হঠাৎ কানে আসে চাপা কান্নার শব্দ। সচকিত হয়ে চাইল মিঃ ঘোষাল, সামনের বন্ধ দরজার ওদিক থেকেই কান্নার শব্দটা আসছে।

অপরাজিতা প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করেও পারেনি নিজেকে বাঁচাতে। ওই দানবটা তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে আজ তার মুখে কলঙ্কের দুরপনেয় কালি লেপে দিয়েছে যা সারা জীবন তার সব চিন্তা ভাবনাকে কশাঘাত করবে।

সবকিছু হারিয়ে গেল অপুর।

নিজেকে বাঁচাতে সে পারেনি, কি অপমান-পরাজয়ের দুঃসহ প্লানিতে ব্যর্থ অপরাজিতা আজ অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

ওদিকে আবছা আলোয় দেখা যায় ওই দানব চন্দনের মুখে বিজয়ীর হাসি। আজ সে তার সব হারানো প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তিকে যেন ফিরে পেয়েছে ওই মেয়েটির সর্বস্ব লুণ্ঠন করে।

ধমকে ওঠে চন্দন—আবার কান্না হচ্ছে? চন্দনকে চেনোনি? আমার পিছনে লাগতে এলে তার সবকিছু এমনি করেই কেড়ে নিয়ে এঁটো পাতার মত পথের ধারে ছুঁড়ে ফেলি।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড লাথিতে দীর্ণ দরজাটা দু'ফাঁক হয়ে খুলে যায়। ঢুকছে পুলিশ ইনস্পেক্টার ঘোষাল। দেখে সে অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়া লুণ্ঠিতা মেয়েটিকে আর অর্ধনগ্ন মদমত্ত ওই জানোয়ারকে। শুনেছে তার

আস্ফালন।

পুলিশকে দেখে চন্দন অবাক হয়।

—আপনারা এখানে?

ঘোষাল গর্জে ওঠে—তোমার মত জানোয়ারের সন্ধানেই এসেছি। তোমাকে এ্যারেষ্ট করা হ'ল!

—কেন?

ঘোষাল গর্জে ওঠে—একটি মেয়ের সর্বনাশ করে আবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে কেন? ফের কোন কথা বললে মুখের মত জবাবই দেব, নিয়ে যাও একে।

ওকে হাতকড়া পরিয়ে টেনে নিয়ে চলে অন্যরা।

কাঁদছে অপরাজিতা, ওর দেহমনের উপর দিয়ে একটা নিদারুণ ঝড় বয়ে গেছে, অসহায় কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে তার দেহ।

ঘোষাল বলে—চলুন, থানায় একবার যেতে হবে। রিপোর্ট লিখেই আপনাকে বাড়ি পেঁছে দেব। কোন ভয় নেই।

কান্নাভিজে চোখ তুলে চাইল অপু।

আর মাথা তুলে চাইবার মত অবস্থাও তার নেই।

রাত হয়ে গেছে। সুবিনয়বাবু ঘরবার করছেন। তখনও মেয়ে ফেরেনি, আকাশের ঝড় বৃষ্টি থামলেও তার মনে যেন নতুন করে ঝড় উঠেছে।

—এখনও ফিরল না অপু।

অপুর মা মৃন্ময়ীও ভাবনায় পড়েছে। প্রথমে ভেবেছিল ঝড় বৃষ্টিতে কোথায় আটকে গেছে অপু। ঝড় কমলেই আসবে। কিন্তু ঝড় বৃষ্টি প্রায় ঘণ্টাখানেক থেমেছে—এখনও ফেরেনি।

মৃন্ময়ী স্বামীকে বলে—দেখে এসো না একবার শুভোদের বাড়িতে—অপু আছে কিনা।

—তাই ভাবছি।

হঠাৎ পুলিশের জিপটাকে তাদের বাড়ির সামনে থামতে দেখে অবাক হয় ওরা।

জিপ থেকে নামছে পাথরের প্রতিমার মত স্তব্ধ বিধ্বস্ত অপরাজিতা। নেমে কোন রকমে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো কাউকে কিছু না বলে—নীরবে।

অবাক হয়ে দেখছে সুবিনয়বাবু, মৃন্ময়ী মেয়েকে।

এ যেন অন্য কোন মেয়ে।

সুবিনয়বাবু পুলিশ অফিসারকে দেখে চাইল। ওদিকে শুভোও নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। তার কপালে রক্ত জমে আছে—জামায় রক্তের দাগ। তার চেহারাও বিধ্বস্ত। শুভো নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পুলিশ অফিসার সুবিনয়বাবুকে শুধোন—আপনি?

—অপুর বাবা।

পুলিশ অফিসার ঘোষাল ওকে ওপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই চরম সর্ব-নাশের খবরটা দিতে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে সুবিনয়বাবু।

তার পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। আকাশ বাতাসে যেন ঝড়ের হাহাকার—সেই শব্দ ছাপিয়ে ওঠে বজ্রনির্ঘোষ। সর্বনাশ আগুনের জ্বালাভরা দীপ্তি নিয়ে কোথায় বাজ পড়লো।

মিঃ ঘোষাল বলে—আমরা আসামীকে এ্যারেস্ট করেছি। তার কঠিন শাস্তি হবেই। দোষী ছাড়া পাবে না।

কিন্তু তার আগেই বিনাদোষে কঠিন, চরম শাস্তি পেয়েছে অপরাজিতা। আজ তার জীবনের সব আশা স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে। আজ সে মূল্যহীন আবর্জনা মাত্র। কেঁদেছিল সে প্রথমে ওই তীব্র অপমানের জ্বালায়। কিন্তু এখন তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে মনের তীব্র জ্বালায়। বেশ বুঝেছে কেঁদে এত বড় অপমানের কোন প্রতিকারই করা যাবে না।

সমাজ তার নির্দোষিতাকে কোনদিনই দেখবে না। পুরুষ শাসিত সমাজ এসব ক্ষেত্রে মেয়েদেরই বেশী অপরাধী বলে ভাবে। তারা বিশ্বাস করে মেয়ের দিক থেকেই প্ররোচনা ছিল। আর তার চরম পরিণতিতে পুরুষের চেয়ে মেয়ের দোষই বেশী।

তারা তাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। পুরুষের এই দোষের কথা সবাই ভুলে যাবে, সে আবার অন্য মেয়েকে বিয়ে করে ঘর বেঁধে সংসারী হবে, কিন্তু আজীবন কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে চলতে হবে তাকে।

এর সমাধান তাকে করতেই হবে। ভাবছে অপরাজিতা।

কিন্তু আজকের এই সমস্যা সমাধানের পথ সেকেলে নারী মৃন্ময়ী বা পুরোনো পন্থী আদর্শবাদী শিক্ষক সুবিনয়বাবুর জানার সাধ্য নেই।

এই ঘটনা তাদের সংসারের সব সুখ শান্তি সুনামকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। কাল রাত পোহালে সারা শহরের লোক জানবে তাদের মেয়ের এই চরম সর্ব-

নাশের খবর। তারপর এখানে মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকাই দুষ্কর হয়ে উঠবে।

—একি সর্বনাশ হলো অপুর মা!

হাহাকার করে ওঠে সুবিনয়বাবু।

—এখন কি হবে? নিজেদের কথা ভাবছি না, বিনাদোষে মেয়েটার এত-বড় কলঙ্ক রটবে—কি হবে ওর ভবিষ্যৎ!

মৃন্ময়ী এর কোন জবাবই দিতে পারে না। এমনি বিপর্যয়ের মুখোমুখি কোনদিনই হয়নি সে।

সুবিনয়বাবু দেখছেন মেয়েকে।

ঘরের এক কোণে মেঝেতে মুখ বন্ধ করে মাথা নীচু করে বসে আছে বিধ্বস্ত অপরাজিতা।

মৃন্ময়ীর চোখে জল।

অসহায়ের মত স্বামীকে বলে,

—যা হয় একটা কিছু করো!

কি করবে সুবিনয় ভাবছে। মনে হয় এই চরম অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে পারে অপরাজিতাকে সমরেশবাবুই। ও যদি সব জেনে অপরাজিতাকে তার ছেলের বৌ হিসাবে মেনে নেয়—সর্বদিক রক্ষা হবে।

আজ অন্ধকারের মধ্যে মনে হয় এই একমাত্র সমাধানের পথ।

তাই উঠে পড়ে সুবিনয়বাবু।

মৃন্ময়ী বলে—কোথায় চল্লে?

সমরেশের কাছে। ও যদি রাজী হয় বিয়েতে, তাহলেই সব আবার ঠিক হয়ে যাবে।

মৃন্ময়ী দেখছে স্বামীকে। তার নারীমন যেন ভয় পায়। বলে সে,

—কিন্তু!

সুবিনয়বাবু বলে—কোন কিন্তু নেই অপুর মা। শেষ চেষ্টা করে দেখতেই হবে। তাই যাচ্ছি সমরেশের কাছেই যদি মায়ের মুখরক্ষা হয়।

সমরেশবাবু এর মধ্যে বাড়িতে শুভোর মুখেই ওই সাংঘাতিক খবরটা পেয়ে চমকে ওঠেন।

—সেকি! এই সব ঘটে গেছে। পুলিশ এ্যারেষ্ট করেছে ছেলেটাকে! বড়-লোকের বখাটে ছেলের এত বড় সাহস!

শম্ভো বলে—এমনি সর্বনাশ ঘটে গেল।

শম্ভোর মা প্রথম থেকেই স্বামীর ওই বন্ধুর মেয়ের জন্য এত দরদকে ভালো চোখে দেখেনি। তার সাধ ছিল দেখেশুনে কোন বড়লোকের ঘর থেকে তার একমাত্র ছেলের জন্য সুন্দরী বউ আনবে। আর দেনা-পাওনাও ভালো পাবে।

কিন্তু ওপথে না গিয়ে স্বামী কি না বন্ধুর ওই মেয়ের সঙ্গেই ছেলের বিয়ের কথা দিল। প্রতিবাদ জোরালো করতে পারেনি শম্ভোর মা, কিন্তু মেনে নিতে পারে নি মন থেকে।

আজ সেই মেয়ের এই সর্বনাশের কথা শুনে শম্ভোর মা বলে,

—ও মেয়ের প্রশংসায় তো ফেটে পড়েছিলে, এখন দ্যাখো কেমন মেয়ে সে!

শম্ভো চাইল মায়ের দিকে। বলে সে,

—কি বলছ মা! অপু তেমন মেয়েই নয়। এ ব্যাপারে তার কোন হাতই নেই। ছেলেটাই একটা ইতর, জানোয়ার।

সমরেশবাবু বলে—তাইই।

কিন্তু শম্ভোর মা শোনায়,

—তোমাদের কাছে ভালো সেজে থাকে। এক হাতে তালি বাজে না।

শম্ভো কি কড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে যায়। আজ মায়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঝগড়া করতে চায় না সে। তাই ভিতরে চলে যায়।

সমরেশবাবু বলার চেষ্টা করেন,

—এই বিপদের সময় মেয়েটার কথা ভাবো!

শম্ভোর মা শোনায়—ভাবার কিছুই নেই। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই। না হলে শম্ভোর বরাতে কি হতো কে জানে?

—থামো শম্ভোর মা!

সমরেশবাবুর কথাটা শেষ হয় না, বিধ্বস্ত অবস্থায় সুবিনয়কে ঢুকতে দেখে চাইল সমরেশ।

সমরেশবাবু এগিয়ে আসে

—সুবিনয়! এত রাতে—

শম্ভোর মা দেখছে ওকে। সুবিনয় বলে সমরেশকে,

—অপুর চরম সর্বনাশের খবর পেয়েছিস।

—হ্যাঁ। শম্ভো সব বলেছে।

সমরেশের কথায় সুবিনয় বলে,

—কিন্তু অপুর কোন দোষ নেই বিনা দোষে ওকে সবাই কলঙ্ক দেবে, সমাজে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না ওর। আমাদেরও সেই অপমান সইতে হবে। আমাদের কথা ছেড়েই দিলাম, তুই পারিস মেয়েটাকে এই মিথ্যা কলঙ্ক, অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে। তুই তো অপুকে চিনিস। ওর এই বিপদে ওকে বাঁচা ভাই।

সমরেশও মেয়েটার জন্য দুঃখ বোধ করে। বলে সে—আমি কি করতে পারি?

সুবিনয় বলে—তুইই ওকে বাঁচাতে পারিস। শুভোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিবি বলেছিলি—একটা কাণ্ড ঘটে গেছে যার জন্য অপু বিন্দুমাত্র দায়ী নয়। তুই যদি শুভোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিস—মেয়েটা বেঁচে যায় ভাই। কথা দে সমরেশ—

সমরেশবাবু কি ভাবছে মেয়েটার কথা।

সুবিনয় বলে—তোর হাতে ধরি সমরেশ—

এবার শুভোর মা-ই জানায় কঠিন স্বরে।—ওতে কোন লাভ হবে না সুবিনয়বাবু।

চমকে উঠে চাইল সুবিনয়। শুভোর মা বলে,

—ও মেয়েকে ঘরের বৌ করে আনতে পারবো না। আমাকেও সমাজে পাঁচজনের মধ্যে বাস করতে হয়। ওই মেয়েকে ঘরে আনলে তাদের মুখ দেখাবো কি করে?

সুবিনয় বলে—ওতো সব জানে—সমরেশও। ওদের জিজ্ঞাসা করুন, ঈশ্বরের নামে বলছি আমার মেয়ের কোন দোষ নেই। বিনা দোষে একজন মেয়ের জীবন বরবাদ হয়ে যাবে তাই দেখবেন? কিছুই করবেন না? সমরেশ—

সমরেশও স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

—শুভো—

শুভোর মা স্পষ্ট ওকে জানায়,

—শোনার কিছুই নেই। আমার মতামত জানালাম। এরপর যদি তুমি কিছু করতে যাও—এ বাড়ি ছেড়ে আমাকেই চলে যেতে হবে।

এত বড় অনাচার তুমি মেনে নিলেও আমি কোন দিন মেনে নেবোনা—কিছুতেই না।

এই আমার শেষ কথা।

শুভোর মা কথাগুলো স্বামীর মুখের উপর জানিয়ে ভিতরে চলে গেল।

অসহায় কণ্ঠে সমরেশ বলে,

—সুবিনয়, এরপর আমার আর করার কিছুই নেই ভাই। সব জানি—বুঝি, কিন্তু কি করতে পারি?

এর জবাব সুবিনয়বাবুও জানেন না। বজ্রাহতের মত কোন মতে টলতে টলতে বের হয়ে এলেন। তখন আকাশে আবার মেঘ জমেছে।

ঝড়ো বাতাস বইছে—বোধ হয়, বৃষ্টি নামবে। নির্জন অন্ধকার পথে চলেছে সুবিনয়বাবু বাড়ির দিকে।

বাড়িতে মৃন্ময়ী সুবিনয়বাবুর পথ চেয়ে বসে আছে। ওদিকে ঘরের মেঝেতে বসে আছে পাথরের মূর্তির মত অপরাজিতা। কোন কথাই বলেনি।

বন্ধ দরজা শব্দ করে খুলে ঢুকছে সুবিনয়বাবু। এক ঝলক বৃষ্টির ঝাপটা ঘরে ঢুকে পর্দাগুলোকে ওলট পালট করে দেয়।

মৃন্ময়ী স্বামীর দিকে এগিয়ে যায়। আশাভরা স্বরে শুধোয়—কি বললেন ওরা? রাজী হয়েছেন সমরেশবাবু?

মাথা নাড়ে সুবিনয়।

—না। মাকে ওরা ঘরে নিতে পারবে না।

—সেকি। কি দোষ ওর?

অপু চাইল মাত্র। খবরটা তার কানেও গেছে। আর মনে হয়, এই ঘটবে তা সেও জানতো—তাই এত বড় বিপর্যয়ের খবরেও তার মুখে কোন ভাবান্তর আসে না।

বরং তার মুখে কঠিন জেদের রেখাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

মৃন্ময়ী বলে—তাহলে মেয়েটার কি গতি হবে? সে প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারে না সুবিনয়বাবু।

এমনি সময় এসে ঢোকে শুভো। বৃষ্টি নেমেছে, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে সে। শুভোকে দেখে চাইল সুবিনয়বাবু।

—তুমি।

শুভো বাড়িতে মায়ের কথাগুলো শুনেছে। তার মনে হয়েছে মা ঠিক কথা বলেন নি। বাবাকে মা-ই থামিয়ে দিয়েছে।

শুভোও প্রতিবাদ জানাতে মা বেশ সতেজ স্বরেই জানায়—আমি ওসব মেনে নেব না।

শুভোকেই তাই মনস্থির করতে হয়েছে, আজ অপুর মানসম্মান—ভবিষ্যৎ এর প্রশ্ন। শুভোও আজ ওই জানোয়ারের হাত থেকে অপুকে বাঁচাতে পারেনি। তাই আজ সে এসেছে এখানে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে।

বলে শুভো—আসতে হলো। মা আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আমি এসেছি আপনাদের যদি অমত না থাকে আমি অপুকে স্ত্রীর সম্মান দিয়ে নিয়ে যাবো।

মৃন্ময়ী অবাক হয়—সত্যি বলছো বাবা ?

—হ্যাঁ !

সুবিনয়বাবুর তবু দ্বিধা থাকে। শুধোন তিনি—তোমার মা বাবা—

শুভো বলে—তাঁরা অপুকে মেনে নিতে না পারেন আমরা নিজেরা নিজের পায়ে দাঁড়াবো, নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করবো। অপুর ক্ষতি হবে—অপু বিনা দোষে এত বড় শাস্তি পাবে এ আমি হতে দিতে পারি না। তাই আমি মনস্থির করে ফেলেছি অপুকে বিয়ে করবো—

স্তব্ধতা নামে ঘরে।

সুবিনয়বাবু বলেন—তুমি আজ আমার মান সম্মান, অপুর জীবন রক্ষা করলে বাবা।

না হলে কালই আমাদের মুখ লুকিয়ে এতদিনের এই শহর, ঘরবাড়ি ছেড়ে অপুকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হতো।

মৃন্ময়ী বলে—কি বলে যে তোমায় আশীর্বাদ করবো বাবা! তাহলে বিয়ের ব্যবস্থা করি।

সুবিনয় বলে—সমরেশ নিশ্চয়ই মেনে নেবে—তোমার মাও। তারা একমাত্র ছেলেকে সরিয়ে দিতে পারবে না। আমি নাহয় সমরেশকে আলাদা করে শুধোই—বিয়ের ব্যাপারে।

শুভো বলে—এ নিয়ে এত ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে বিয়ে হলেই।

—না। এ বিয়ে হবে না।

অপরাজিতার স্থির কঠিন স্বরের কথাগুলো যেন বোমার মত বিস্ফোরিত হয় ঘরে। ওরা সবাই চাইল।

শুভো অবাক হয়—একি বলছ অপু !

অপরাজিতা বলে—ঠিকই বলছি শুভো। এ বিয়ে হলে সমাজে একটা শয়তান এতবড় অপরাধ করেও পার পেয়ে যাবে। এটা আমি হতে দেব না।

যে দোষ করেছে ওই শয়তান তার শাস্তি তাকে পেতেই হবে—ভবিষ্যতে শুধু ওই চন্দনই নয়, তার মত ছেলেরা যেন অন্য কোন মেয়ের সর্বনাশ করতে সাহস না পায়।

সুবিনয় বলে—কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ-এর কথাও ভাবতে হবে। যদি শুভো বিয়ে করে—মান-সম্মান সব বাঁচবে মা। ও এসেছে দয়া করে—

বলে অপরাজিতা—কারো দয়া কুড়িয়ে বাঁচতে চাই না বাবা। সারাজীবন সেই কৃতজ্ঞতার বোঝা বওয়ার যন্ত্রণাও কম নয়।

শুভো বলে—না অপু। এ আমার কর্তব্য—এত বিপদে তোমার পাশে থাকতে চাই।

অপরাজিতা বলে—আমার পথ আমাকেই দেখে নিতে দাও শুভো। পোকায় কাটা ফুলে দেবতার পুজো হয় না। তুমি উপকারী বন্ধুর মতই এসেছো—সাহায্যের হাত বাড়িয়েছো।

কিন্তু সেই সাহায্য নেবার মত ভাগ্য আমার নেই। তাই তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে।

শুভো অবাক হয়।

—কিন্তু কেন? কেন নিজেকে সুখী করতে পারবে না? সব জেনেই তো এসেছি।

অপরাজিতা বলে—আমার পথেই আমাকে চলতে দাও শুভো। সে পথ যত কঠিনই হোক, সেই পথই নিতে হবে। এত বড় অপমান আমি মুখ বুজে মেনে নিয়ে তোমাকে ঠকাতে পারবো না। তুমি যাও—ফিরে যাও শুভো।

সুবিনয়বাবু অবাক হয়।

মৃন্ময়ী বলে—কি বলছিস তুই?

অপরাজিতা বলে—ঠিকই বলছি মা। আমার পথেই চলতে দাও আমাকে।

শুভো দেখছে ওই তেজস্বী মেয়েটিকে।

অপরাজিতা এবার যেন তার নিজের পথের সন্ধান পেয়েছে। তাই শুভোকেও ফিরিয়ে দিতে চায়।

শুভো বলে—কি তোমার পথ তা জানিনা অপু। তবে আমি বলে যাই, যদি কোন দিন মত বদলাও, পথ বদলাও—তোমার জন্য আমার দরজা খোলাই থাকবে। তোমার পথ চেয়েই থাকবো। চলি—

বের হয়ে যায় শুভো।

মৃন্ময়ী হাহাকার করে ওঠে—এ কি করলি অপু! শুভোকেও ফিরিয়ে

দিলি। এখন কি করবি ?

অপরাজিতা স্থির কণ্ঠে বলে—কিছু একটা করতেই হবে। আমার পথ আমি পেয়েছি বাবা।

সুবিনয়বাবু চাইল। অপু বলে,

—চলো আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

অপু বলে—চলোতো।

সুবিনয় বাবুকে নিয়ে অন্ধকার বর্ষণমুখর রাত্রিতে পথে নামে অপরাজিতা।

বিচারপতি জাস্টিস বিশ্বাসকে অনেক রাত্রি অবধি লাইব্রেরীতে থাকতে হয়। কারণ নানা কেসের জন্য নথীপত্র ধরতে হয়। আইনের বহু বইও পড়াশোনা করতে হয়। তিনি একজন সৎ কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি, তাই কোন সময় অজ্ঞাতেও কারো উপর ভুলবশতঃ কোন অবিচার ঘটে যাক তা তিনি চান না।

সংসারের দিকে বেশী সময় দিতে পারেন নি। অতীতে তার স্ত্রীও মারা গেছেন, অবলম্বন আপনজন বলতে তাঁর একজন মেয়ে সুতপা। সেও কলকাতার কোন নামী কলেজের ছাত্রী, সেখানে হোস্টেলেই থাকে।

বিচারপতি বিশ্বাস এখানে তাঁর পুরোনো চাকর-এর হেপাজতেই থাকেন নিজের কাজের মধ্যে তন্ময় হয়ে।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই ঝড়বৃষ্টি নেমেছে। মধ্যে একটু থেমে আবার শুরু হয়েছে বৃষ্টি। রাতের খাওয়া নটার মধ্যেই সেরে লাইব্রেরীতে ঢোকেন। সেরাত্রে একটা জটিল কেসের ব্যাপারে আইনের বেশ কিছু বই বের করে ধারা উপধারার ব্যাখ্যা পড়ছেন।

হঠাৎ ওই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠেন। হ্যাঁ—সত্যিই এই ঝড়জলের মধ্যে কে ডাকছে তাকে। খোলা বারান্দায় এসে দেখেন লনের ওদিকে বন্ধ গেটের বাইরে এই বৃষ্টির মধ্যে ছায়ামূর্তির মত দুজনকে, তার মধ্যে একটি মেয়ে। বয়স বেশী নয়, সঙ্গের ভদ্রলোক সে তুলনায় অনেক বয়স্ক, মাথার চুলে পাক ধরেছে। ওই বৃষ্টিতে ভিজছে ওরা, আর মেয়েটি ডাকছে—জজসাহেব—জজসাহেব।

জজসাহেবের বাড়ির গেটে পুলিশ পাহারা রয়েছে। এত রাতে ওই ভাবে এসে ডাকাডাকি করতে দেখে তারা এগিয়ে আসে। বলে এত রাতে

জজসাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না। মেয়েটি দমবার পাত্রী নয়। ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই এসেছে সে, তার প্রয়োজন অনেক জরুরী।

অপরাজিতা এই বৃষ্টির মধ্যে তার বাবাকে নিয়ে এখানে এসেছে। সে জজসাহেবের সঙ্গে দেখা করবেই এখুনি।

কিন্তু কর্তব্যরত পুলিশ বাধা দেয়। জানায়—এখন দেখা হবে না। কাল সকালে আসতে হবে, যান।

সুবিনয়বাবু ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না, কেন অপু এই অবস্থায় ছুটে এসেছে এখানে।

অপরাজিতা প্রহরীর কথায় ফিরে যেতে রাজী নয়। সে তাই ওই বৃষ্টির মধ্যেই ডাকাডাকি শুরু করেছে পাগলের মত, গেট খুলতেই হবে—এখুনি দেখা করবে সে। পুলিশও ছাড়বে না।

বেশ গোলমালই শুরু হয়েছে।

এমন সময় জাস্টিস বিশ্বাস বারান্দায় এসে গেটের সামনে ব্যাপারটা দেখে একটু বিস্মিত হন। গেটের আলোয় দেখা যাচ্ছে মেয়েটিকে। দৃপ্ত ভঙ্গীতে সে ভিতরে আসার জন্য বলছে। মেয়েটিকে দেখে চেনা বলেই বোধ হয়। মনে পড়ে কিছুদিন আগে ওই মেয়েটিকেই তিনি দেখেছিলেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশের এক ঠেলাওয়ালাকে মারার প্রতিবাদ করতে।

সেই তেজস্বী দৃপ্ত ভঙ্গীটিই ফুটে উঠেছে আজ ওর ডাকে। ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে সে ছুটে এসেছে তাঁর কাছে বোধ হয় কোন জরুরী দরকারে।

গেটের সেণ্ট্রি এবার গর্জায় অপুর দিকে চড়া স্বরে,

—চলে যান না হলে শান্তিভঙ্গের অপরাধে আপনাদের দুজনকেই এ্যারেষ্ট করতে বাধ্য হবো।

সুবিনয়বাবু কিছুটা ভয় পেয়ে বলেন,

—চলে আয় অপু, কালই আসবি।

অপু বলে—ও যা করে করুক আমি দেখা না করে কিছুতেই যাবো না।

এমন সময় লনের বাইরের আলোটা নিজেই সুইচ অন করেছেন মিঃ বিশ্বাস। বলেন সেণ্ট্রিকে,

—ওঁদের ভিতরে আসতে দাও।

অর্থাৎ অপুর আবেদন ব্যর্থ হয় নি। এত রাতেই জজসাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

জজসাহেবের হুকুম, গেটের সেণ্ট্রি এবার গেট খুলে অপরাজিতা আর

সুবিনয়বাবুকে ভিতরে নিয়ে যায়।

জজসাহেবের লাইব্রেরী ঘরেই এসেছে অপরাজিতা, সুবিনয়বাবু ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারেন নি। অপু তাকে কিছু না বলে সটান এখানে এনে হাজির করেছে। আর অপরাজিতা জজসাহেবকে আজ তার উপর চরম অত্যাচারের কাহিনীই শোনায়।

বাইরে বৃষ্টির রেশ তখনও থামেনি।

একটি অসহায় মেয়ের উপর এই নিষ্ঠুর অবিচারে শুধু মেয়েটিই নয়, প্রকৃতিও যেন অশ্রুবর্ষণ করছে মানুষের এই নিষ্ঠুরতায়।

জজসাহেব সব শুনে বলেন,

— পুলিশ দোষীকে এ্যারেষ্ট করেছে, আদালতে তার বিচার হবে। দোষ প্রমাণিত হলে এসব কেসে দশ বারো বছর অবধি জেলও হতে পারে। শাস্তি সে পাবেই।

অপরাজিতা বলে—দোষ করে সে শাস্তি পাবে, কিন্তু তার আগে বিনা দোষে আমার—আমার বাবা মায়ের চরম শাস্তি হয়ে গেছে স্যার।

জজসাহেব অবাক হন। —তোমাদের শাস্তি হল? কি বলছ মা—

অপরাজিতা বলে—নয়তো কি? এই ঘটনা ঘটলো—এরপর এই শহরে আমার বাবা মা কি করে মুখ দেখাবেন, সকলে আমাকেই দুষবে—কলঙ্ক দেবে। একটা কুমারী মেয়ের জীবনে সেই কলঙ্ক তার জীবনকে বরবাদ করে দেবে। কি দোষ করেছি আমি—কি দোষ করেছেন আমার বাবা মা, যে এতবড় শাস্তি পেতে হবে!

জজসাহেব দেখছেন মেয়েটিকে। তার কথায় যুক্তি আছে, এটাই বাস্তব সত্য। সমাজ ওদের অলিখিত শাস্তিই দিয়েছে।

জজসাহেব বলেন—এ বিষয়ে করার কিছু নেই। দোষীকে শাস্তি দেওয়াই আইনের কাজ। আদালতে তার বিচার হবে—

অপরাজিতা বলে—ওই কেস আদালতে উঠলে আমাকে কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে—জেরার মুখে অনেক সত্য অসত্য কথা উঠবে। সারা শহরের লোক তা জানবে—তারপর আমার কি অবস্থা হবে বলুন স্যার। আমার কি কোনদিন ঘর সংসার হবে? না—কোন ছেলে, তার মা বাবা রাজী হবেন এমন মেয়েকে ঘরে নিতে?

জজসাহেব শুনছেন ওর কথা। সমাজের বাস্তব ঘটনাকেই তুলে ধরেছে মেয়েটি। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর করণীয় কিছুই নেই। এখানে তিনি

অসহায় দর্শক মাত্র। তাই শুধোন,

—কিন্তু এতে আমি কি করতে পারি? বিচারের জন্য আদালতে যেতেই হবে। সবই বুঝি—কিন্তু করার কিছুই নেই।

অপরাজিতা বলে, —আদালতেও কি ন্যায় বিচার পাবো? ওরা বড়লোক। ওদের অনেক টাকা, টাকা দিয়ে ওরা উকিল ব্যারিস্টার লাগাবে। তারা আইনের ফাঁক দিয়ে ওকে খালাস করে দেবে। আর মাঝে থেকে কলঙ্কের বোঝা বইতে হবে আমাকে।

রাত্রি হয়ে আসছে। জজসাহেব বলেন—তবু সেই আদালতেই যেতে হবে তোমায়। পুলিশ ছেলেটিকে এ্যারেষ্ট করে কেস দেবে, তদন্ত করে রিপোর্ট দেবে—বিচার হবে। এছাড়া আমার করার কিছুই নেই। আমাকেও আইন মেনেই চলতে হয়। আইন অনুযায়ী বিচার করতে হয়। আদালতেই এর বিচার হবে। তুমি যাও আমার করার কিছুই নেই।

অপরাজিতা যেন হেরে যাচ্ছে। বেশ বুঝেছে বিচারের প্রহসনে গেলে কোন লাভই হবে না। সে ওই জজসাহেবের কাছে তাই শেষ বারের মত বলে ব্যাকুল কণ্ঠে—আমাকে ফিরিয়ে দেবেন?

কিন্তু করার কিছুই নেই মা।

অপু বলে—আপনার মেয়ের যদি এমন কোন চরম সর্বনাশ হতো—আর সে যদি কেঁদে আপনার সামনে সাহায্য চাইত তাকে কি আপনি এমনি করে রাতের অন্ধকারে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারতেন?

চমকে ওঠেন জজসাহেব। আজ ওই অপমানিতা অসহায় মেয়েটিকে দেখে মনে পড়ে তাঁর নিজের মেয়ের কথাই।

অপরাজিতা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—আমি আপনার মেয়ের মতই, পারেন না তাকে এই অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে? তাকে কি এমনি করে ফিরিয়ে দেবেন?

জজসাহেবের পিতৃহৃদয়ের কাছে এই করুণ আবেদন সাড়া তোলে। জজসাহেব দেখছেন অপুকে। কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে ওর সারা শরীর। বলেন জজসাহেব,

কিন্তু কি ভাবে উপকার করতে পারি মা?

এবার অপরাজিতা তার সেই চরম সিদ্ধান্তটার কথাই বলে।

—ওই ছেলেটি, যে আমার চরম সর্বনাশ করেছে—তাকেই আমাকে বিয়ে করতে হবে।

সুবিনয়বাবু মেয়ের এই সিদ্ধান্তে অবাক হয়।

—কি বলছিস তুই ?

জজসাহেবও বলেন, —সেই ছেলেটা নিশ্চয়ই বাজে ছেলে—তাকে বিয়ে করে জীবনভোর কষ্টই পাবে। জেনে শুনে নিজের আরও বড় সর্বনাশ ডেকে আনবে ?

অপরাজিতা স্থির কণ্ঠে বলে,

—এ বিয়ের সর্ত হবে—এক বছরের জন্য। তারপর আমরা ডিভোর্স নিয়ে যে যার পথে সরে যাবো।

—কি বলছো তুমি ?

অপরাজিতা বলে—এ ছাড়া পথ নেই। আমাদের সমাজে একজন অসহায় ধর্ষিতা মেয়ের কোন ঠাঁই নেই। সকলের ঘৃণার পাত্রী সে। কিন্তু স্বামী পরিত্যক্তা ডাইভোর্সী মেয়েও সমাজে মাথা তুলে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারে। তাই এই সিদ্ধান্ত আমাকে নিতে হচ্ছে।

জজসাহেব দেখছেন মেয়েটিকে। ওর মনের দৃঢ়তা, ওর বিচার বুদ্ধিকে এবার প্রশংসা না করে পারেন না।

এতবড় সমস্যার সমাধানের পথ এইটাই। এতে সম্মানও বাঁচবে মেয়েটির।

তবু বলেন জজসাহেব,—পথটা ঠিকই বের করেছো বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু ছেলেটি যদি রাজী না হয় ?

অপরাজিতা বলে—তাই আপনার সাহায্য চাই। যদি দয়া করে সেইটুকু করেন হয়তো বাঁচার পথ পাবো, নাহলে নিজেকে শেষ করে দেওয়া ছাড়া আর পথ নেই।

জজসাহেব মেয়েটির জন্য দুঃখবোধ করেন। ওর জন্য কিছু করতে পারলে খুশী হন। আর এই কাজে আইনের সমর্থনও তিনি পাবেন। তাই বলেন জজসাহেব—তোমার জন্য কিছু করতে পারলে খুশী হবো। কোন থানায় ছেলেটিকে রেখেছে ?

অপরাজিতা খবরটা জানাতে জজসাহেব সেই থানার অফিসারকে ফোন করেন।

থানা অফিসার তরুণ ঘোষাল-এর দেহমনের উপর দিয়ে যেন সন্ধ্যা থেকে একটা ঝড় বয়ে গেছে।

আসামী ওই বড়লোকের বখাটে ছেলেটাকে লকআপে আটকে স্টেটমেণ্ট রেকর্ড করতে বসেছে।

কাল সকালেই আসামীকে কোর্টে তুলতে হবে। আর তরুণ ঘোষালও দুঁদে পুলিশ অফিসার। নিজের হাতে ওই ছেলেটাকে ধরেছে। সব প্রমাণও এনেছে। এ ভাবে কেস সাজাবে যেন ওই বড়লোকের পুত্ররত্ন কোন মতেই না বের হতে পারে।

তরুণ ঘোষাল ওকে নিদেন পক্ষে আটদশ বছরের কারাবাসের ব্যবস্থা করে দেবে।

থানার মেজবাবুকে দিয়ে ওই ছেলেটার বাড়িতেও ফোন করিয়ে খবরটা জানিয়েছে। ভেবেছিল ওদের বাড়ির লোকজন উকিল নিয়ে চলে আসবে, কিন্তু এখনও ছেলেটির বাড়ি থেকে কেউ আসে নি। খবর পেয়েছে ঘোষাল ছেলেটির বাবা অসুস্থ। বড়দা আছেন সেও এখন বাইরে। বাড়ীর কোন মেয়ে ফোনটা ধরেছিল।

তরুণ ঘোষালও চায় না এত রাতে আবার কেউ এসে ঝামেলা করুক। যা হয় কাল সকালে হলেই ভালো। ওই ছেলেটা একরাত হাজতে থাকুক—এরপর তো জেলেই থাকতে হবে, সুখটা বুঝুক।

হাজতের ওদিকে একটা ছোট্ট ঘরের মেঝেতে বসে আছে চন্দন। দু চারজন চোর পকেটমারও রয়েছে। কে বলে চন্দনকে দেখিয়ে,

—ও মাল লুটেরা হ্যায়। জেনানাকো ইজ্জৎ লুটতা হ্যায় শালা।

অন্যজন বলে—অব সমঝোগী! স্যার, বিড়ি সিগ্রেট হ্যায়?

চন্দন জবাব দেয় না। ভেবেছিল বাড়িতে খবর পেলে নন্দনদা নিশ্চয়ই উকিল নিয়ে এসে জামিনের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তারও পাত্তা নেই।

রেগে উঠেছে চন্দন। ঘুম আসে না। মশার কামড় আর পাশে খোলা বাথরুমের বিশ্রী গন্ধে বমি আসছে। এই পরিবেশে, এই ভাবে থাকতে অভ্যস্ত নয় সে।

তাই রেগে উঠেছে মনে মনে চন্দন। ওদিকে কোন পেটি মাতালকেও এনে পুরেছে। সে বেসুরো গলায় গাইছে—হাম তুম এক কামরামে বন্ধ হো

আউর চাবি খো গিয়া—

যা, শালা--ওদিক থেকে সেণ্ট্রি ধমক লাগায়—

—চোপ বে।

সব মিলিয়ে এক বিশ্রী পরিবেশ।

তরুণ ঘোষাল ওদিকের ঘরে রিপোর্টটা গুছিয়ে লিখছে—এমন সময় ফোনটা বেজে ওঠে।

—হ্যালো!

ধরেছে মেজবাবুই। সেই বলে ঘোষালকে—স্যার, জজসাহেবের ফোন!

—এত রাতে! উঃ বড়লোকের বাচ্চাকে ধরে এনে ফ্যাসাদেই পড়লাম দেখি।

দেন—জজসাহেব কি বলেন দেখি। রাতভোর এই ঝামেলাই চলবে মনে হচ্ছে।

এর কিছুক্ষণ পরই জজসাহেব অপরাজিতা আর সুবিনয়বাবুকে নিয়ে থানায় এসে পড়েন। ইন্স্পেক্টার তরুণ ঘোষালও তৈরী ছিল।

জজসাহেব বলেন—সেই ছেলেটি কোথায়?

ঘোষাল বলে—তাকে লক আপে রেখেছি, চলুন স্যার।

রাত্রি নেমেছে! লকআপের মধ্যে অনেকেই ঝিমুচ্ছে। সেই মাতালটা গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে। জেগে আছে চন্দন, তার মন মেজাজও ভালো নেই। এখনও বাড়ি থেকে কেউ এল না তাকে ছাড়াতে।

• চন্দনের বিরক্তি এসে গেছে।

এমন সময় বাইরের বারান্দায় কাদের দেখে চাইল।

ভেবেছিল তার বাড়ি থেকে নন্দনদা হয়তো এসেছে, এবার জামিনে ছাড়া পাবে সে, তারপর মামলা লড়বে আর বেশ জানে টাকার জোরে খালাসও পাবে সে।

তাই বাইরে কাদের আসতে দেখে আশা ভরে চাইল কিন্তু দুজন ভদ্রলোককে চিনতে পারে না, তবে সেই মেয়েটাকে চিনেছে চন্দন।

গার্ড ভারি দরজাটা খুলে তাকে বলে—বাহার আইয়ে এ বাবু!

মাতালটাই পড়ে পড়েই ফোড়ন কাটে—শ্বশুর বাড়ি থেকে চল্লে চাঁদু শালীর আদর ছেড়ে? বেরসিক! যাও!

চন্দন বাইরে আসতেই এবার অপরাজিতা যেন চাপা রাগে ফেটে পড়ে। এতক্ষণের রাগটার এবার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অপু এগিয়ে এসে খপ্ করে চন্দনের জামার কলার ধরে গর্জে ওঠে।

—কেন—কেন আমার এত বড় সর্বনাশ করলে? তোমার কি ক্ষতি করেছিলাম—ইতর, শয়তান! মারতেই যায় ওকে। তরুণ ঘোষাল আসামীকে

ছাড়িয়ে নেয়।

সেও বুঝেছে মেয়েটির ক্ষোভের কারণ, তাই বলে—এ সময় রাগারাগি করলে কোন লাভ হবে না। যা বলার ঠাণ্ডামাথায় বলো।

ছাড়া পেয়ে চন্দন জামাটা উদ্ধত ভঙ্গীতে ঠিক করে নেয়।

অপু তখনও গজরাচ্ছে—তোমার লজ্জা করে না?

চন্দন বলে—না! যা করার আমি বুঝে সমঝেই করেছি। তুমি খুব বেড়েছিলে, চন্দনের বিরুদ্ধে লেগেছিলে তাই তোমার মান ইজ্জৎ ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি, লজ্জা কেন করবে?

জজসাহেব দেখছেন উদ্ধত ওই ছেলেটিকে। একটি মেয়ের এতবড় সর্বনাশ করার পরও এতটুকু অনুশোচনা, অনুতাপ, দুঃখবোধ নেই। বরং গর্ব-বোধই করছে, এতবড় অমানুষ ওই ছেলেটা।

জজসাহেব বলেন—এবার শুধু লজ্জাই নয়—অনুতাপও করতে হবে দীর্ঘদিন ধরে। তুমি নিজের মুখে স্বীকার করছো আমাদের সামনে যে ওই মেয়েটির চরম সর্বনাশ করেছো।

চন্দন রুক্ষস্বরে বলে—হ্যাঁ করেছি। আপনি কে মশাই যে রাত দুপুরে আমাকে ডাকছেন—জানেন আমি কে?

জজসাহেবকে ওইভাবে ধমকাতে দেখে এবার তরুণ ঘোষাল বলে ওঠে—তোমার পরিচয় সবাই জানবে। তার আগে ওঁর পরিচয়টা শোনো। উনি জজসাহেব।

চমকে ওঠে চন্দন জজসাহেবের নাম শুনে। জানে কেস পড়বে ওর হাতেই না হয় ওর অধঃস্তন কোন বিচারপতির কাছে, আর ওকে ধমকানোর ফল কি হতে পারে তা জেনে একটু ভয় পেয়ে গেছে।

কিন্তু ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না চন্দন, বলে সে—তাতে কি হয়েছে! কোর্টে মামলা উঠবে—বড় ব্যারিষ্টারই লাগাবো। দেখবেন আইনের ফাঁক দিয়ে ঠিক খালাস পেয়ে যাবোই। না হয় আপীল করবো—হাইকোর্টে; সবাই জানবে ওই মেয়েটিই আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্যই নিজের ইচ্ছায় ওখানে গিয়ে এখন ধরাপড়ে এইসব বলছে।

অপু গর্জে ওঠে—মিথ্যেবাদী শয়তান—এসব মিথ্যে কথা।

চন্দন এবার যেন বিজয়ীই মনে করে নিজেকে।

কিন্তু ইনস্পেক্টার ঘোষাল বলে—তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী, প্রমাণ সবই আমার হাতে।

আমার রিপোর্ট মিথ্যা বলবে না—শাস্তি তোমার হবেই। উকিল ব্যারিষ্টারেরও সাধ্য হবে না তোমাকে খালাস করে আনে। তোমার মত শয়তানের ঠাঁই জেলের বাইরের সমাজে নয়—জেলের ভিতরে।

চাইল চন্দন, এবার যেন মিইয়ে যাচ্ছে সে।

জজসাহেব বলেন—শোন ইয়ংম্যান, এসব কেসে শাস্তি হবেই। আর দশ বছর জেল হওয়াও সম্ভব।

দশ বছর জেল! চমকে ওঠে চন্দন।

নন্দনদাও আসেনি, তারা কতটা সাহায্য করবে কে জানে! বিপদে পড়লেই তবে শত্রুমিত্র কে তা বোঝা যায়। ওরা না আসাতে চন্দনও ভয় পায় এবার।

জজসাহেব বলেন—দশ বছর জেলবাস করে যখন ছাড়া পাবে তখন এই যৌবনও আর থাকবে না। টাকা—প্রতিষ্ঠাও সেদিন থাকবে কিনা জানোনা, সমাজের সবাই বলবে তোমাকে, জেলের ঘানিটানা আসামী। সেই পরিচয় নিয়ে সমাজে মাথা নীচু করে মুখ লুকিয়ে বাঁচতে হবে বাকী জীবন, সেটা নিশ্চয়ই সুখের হবে না?

চন্দন এবার সত্যিই ভয় পেয়ে যায় ওই ভবিষ্যৎ এর নির্মম ছবিটাকে কল্পনা করে। জজসাহেবও দেখছেন তার সেই ভয়টাকে।

তাই বলেন—এই সর্বনাশ থেকে তুমি কি বাঁচতে চাও?

চন্দন চাইল জজসাহেবের দিকে।

অপরাজিতা দেখছে ওকে। বলে অপরাজিতা,

—আমার এতবড় সর্বনাশ করেছো, তবু তুমি যদি রাজী থাকো তাহলে বাঁচাতে পারি।

চন্দন কি ভাবছে।

—রাজী?

চন্দন বলে—কি করতে হবে?

অপু বলে—বিয়ে করতে হবে আমাকে।

এবার চন্দন ঘৃণাভরে বলে,

—বিয়ে করতে হবে—তোমার মত মেয়েকে! না—এতে আমার মত নেই। তাছাড়া আমার বাড়িরও মত হবে না।

অপরাজিতা শ্লেষভরা কণ্ঠে বলে,

—যখন আমার সর্বনাশ করতে গেছলে তখন বাড়ির মত নিয়েছিলে যে

বিয়ে করার সময় মত নিতে হবে।

চন্দন বলে—কিন্তু স্ত্রী হবে ঘরের লক্ষ্মী!

অপু শ্লেষভরা স্বরে বলে—তুমি নিজে লক্ষ্মীছাড়ারও অধম অথচ স্বপ্ন দ্যাখো তোমার ঘরের লক্ষ্মী হবেন তোমার স্ত্রী! স্ত্রীর মর্যাদা দেবে তোমার মত মানুষ! তোমরা মেয়েদের ভাবো খেলার পুতুল—তাদের নিয়ে যা খুশী করবে, খেয়াল খুশী মিটে গেলে ডাস্টবিনে ফেলে দেবে, তবু তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম—ঠিক আছে। জেলেই যাও। দশ বৎসর জেলের ঘানি টানলে তারপর সুমতি হবে।

চলুন স্যার, ভুলই করেছিলাম এখানে এসে।

এবার চন্দন বুঝেছে শেষ সুযোগটাও চলে যাচ্ছে। গার্ড তাকে আবার হাজতে পুরতে চলেছে, জেলেই থাকতে হবে বোধহয়।

তাই এবার বিপদের গুরুত্ব বুঝে বলে চন্দন,

—দাঁড়াও!

দাঁড়ালো অপরাজিতা। চন্দন বলে,

—আমি বিয়ে করতে রাজী আছি।

অপরাজিতা বলে—কিন্তু একটা সর্তে।

—সর্ত!

—হ্যাঁ। এ বিয়ে টিকে থাকবে মাত্র একবছর। তারপরই আমরা ডাইভোর্স নেব। একবছর পর স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ও থাকবে না। আর এই একবছর আমরা স্বামী স্ত্রীর পরিচয়েই বাস করবো মাত্র—এছাড়া কোন সম্পর্ক থাকবে না আমাদের মধ্যে। আমরা যে যার পথে চলবো—কেউ তাতে বাধা দেব না।

চন্দন শেষের সর্তটাকে সর্বদাই স্বাগত জানাতে চায়। তাই এমন বিয়েতে কারো রাজী হতে বাধে না। আর বেশ বুঝেছে চরম বিপদ থেকে বাঁচার এই একমাত্র পথ। তাই বলে চন্দন,

—আমি রাজী!

জজসাহেবও এই চেয়েছিলেন তাই এবার বলেন—থানা অফিসার মিঃ ঘোষালকে,

—এদের বিয়ের ব্যবস্থা করুন কাছের ওই মন্দিরে।

তরুণ ঘোষাল ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। তার কাছে সব ব্যাপারটাই কেমন নাটকীয় বলে মনে হয়। একটা রেপ কেসের আসামী তার নামে রিপোর্টও লেখা হচ্ছে, সেই পাকা কেস এভাবে কেঁচে গেলে তারও

অসুবিধে হবে, তাই বলে ঘোষাল,

—স্যার, ওতো এখন পুলিস কাস্টডিতে, ওর অপরাধও কত সাংঘাতিক তা জানেন। এখন ওকে এইভাবে ছেড়ে দিতে গেলে আইনে বাধবে। জজসাহেব বলেন—আমরা আইন এর ঠিক অর্থ করি না অনেক সময় মিঃ ঘোষাল, আইন তো মানুষের মঙ্গলের জন্যই। এই বিয়ে হলে একটা অত্যাচারিতা—সমাজে ব্রাত্য মেয়ের জীবন বরবাদ হবে না। ওই অপরাধী ছেলেটাও হয়তো নিজেকে শুধরে নিয়ে সুন্দর ভাবে বাঁচতে পারবে। তাহলে সেই সুযোগ দিতে বাধা কোথায় ইন্সপেক্টার!

তরুণ ঘোষাল অবাক হয়ে শুনছে ওই কথাগুলো। বিশ্বাস করতে তারও মন চায়। আইনের এই অলিখিত মানবিক দিকটাকে এতদিন দেখেনি সে, হোক ওদের বিয়ে।

জজসাহেব এবার সুবিনয় বাবুকে শুধোন—আপনার মেয়ের এ বিয়েতে আপনার মত আছে তো?

সুবিনয়বাবু এতক্ষণ চুপচাপই ছিল এবার অপরাজিতার ওই সিদ্ধান্তে সে বলে, জজসাহেব আমার একমাত্র মেয়ে। সাধ ছিল কত ধুমধাম করে আমার মেয়ের বিয়ে দেব নিজের পছন্দ করা ছেলের সঙ্গে। সে সব আজ স্বপ্ন বলেই মনে হয়।

তবু বাঁচার জন্য মা যে পথ নিতে চলেছে তাতে বাধা আমি দেবনা। তাই এ বিয়েকে খুশী মনে মেনে না নিতে পারলেও—আপত্তি করার মত মনের জোরও আর নেই। সবই নিয়তি বলেই মেনে নিতে হবে, এছাড়া পথও নেই।

সেই রাতে মহামায়ার বৌমা মালা ফোনটা ধরেছিল। নন্দন তখনও ফেরে নি। এরা জানে নন্দন কারখানার কাজে কোথায় গেছে। অবশ্য নন্দন তখন রিমা বাঈজীর ওখানে মদ্যপানে ব্যস্ত। বাড়ির কথাও মনে নেই।

মালা ফোনটা রেখে বলে মহামায়াকে, —মা, চন্দনকে পুলিশে ধরেছে। থানায় আটকে রেখেছে তারা, কোন একটা মেয়ের সর্বনাশ করার জন্য। আপনার ছেলেকে থানায় যেতে বললো।

মহামায়া অবাক হয়, সেকি! ওর জগুদি—জগ[illegible]াসীই এ বাড়ির সব ব্যাপারে এখন প্রধান পরামর্শদাত্রী। জগু ওই মেয়েছেলের ব্যাপার তারপর পুলি[illegible]শের নাম শুনে বলে,

—ওমা। ছোঁড়া শেষ অবধি লটর-পটর করেছে বদ মেয়ের সঙ্গে—এখন জেলেই যাবে দেখছি। মহামায়া বলে—কি হবে, নন্দনও নেই।

জগু বলে—বেশ হয়েছে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই। থাক এখন জেলে। বাইরে থাকলে নন্দনের সঙ্গে বিষয়পত্র-ব্যবসা-টাকাকড়ি নিয়ে ঝামেলা বাধাতে কতক্ষণ। তার চেয়ে জেলে থাকুক, এদিকে নন্দন এই ফাঁকে সব হাতিয়ে নিক, জয়গুরু!

মহামায়া শোনে যুক্তিটা।

মালাও খুশী হয়। তাই বলে সে,—মাসীমা ঠিক বলেছে মা। তাছাড়া আপনার ছেলেও বাইরে, এখন কে যাবে! কাল দেখা যাবে এখন চুপচাপ থাকুন তো।

তাই ছিল এ বড় বাড়ির মানুষগুলো। এইমাত্র সুজাতা এ বাড়ির বড় বউ ওদের খাবার দিতে এসে খবরটা আড়াল থেকে শোনে।

আর এদের ওই নন্দনের জন্য অপরিসীম দরদ দেখে বিস্মিত হয়। এরা কারো জন্যে এতটুকু ভাবে না। তাই সুজাতা এ বাড়ির বড় ছেলের স্ত্রী হয়েও এ বাড়ির বউ নয়, অমর বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ওই মহামায়াই জবর দখল করেছে এখানে; অমরবাবুর প্রথমা পত্নীর ছেলে ওই সুজাতার মৃত স্বামী আর তার ছোট ভাই চন্দন।

মহামায়া এদের সৎমা। তার দলবলও এদের কাউকে দেখতে পারে না। তাই চন্দনের বিপদে এরা সাড়াও দেয়নি, বরং খুশীই হয়েছে তাদের লুণ্ঠনের পথ পরিষ্কার হয়েছে বলে।

সুজাতা নীরবে শোনে সব—দেখে মাত্র সবকিছু। কিছু করার সাধ্য তার নেই। শ্বশুরমশায়ও নাকি খুব অসুস্থ। মহামায়া, জগুমাসী তাকে কড়া পাহারায় রেখেছে, তেতলায় তার ঘরেও যাবার অধিকার নেই সুজাতার; তবু চন্দনের জন্য আজ একা সেইই বেদনা বোধ করে।

সকালে জেগে ওঠে বড় বাড়িটা।

মহামায়ার হাঁক ডাক শুরু হয়। জাগুমাসী ছুৎ-অছুৎ বাঁচাবার জন্য লাফ দিয়ে দিয়ে চলে আর বকতে থাকে—এখনও সকালের খাবার হল না। নন্দনের আজ কি জরুরী কাজ আছে, তাই বের হয়ে যায়। আর তাতেই জগুমাসী চটে ওঠে,

—না খেয়ে চলে গেল ছেলেটা—অ বড় বৌ তুমি কি কর বাছা? এবার দূরই করবো তোমাকে।

মহামায়া, মালাও নেমে এসেছে। এমন সময় অনি-রীণা ছুটে আসে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে,

—ও মা, ঠাক্‌মা—দ্যাখো গে ছোটকা এসেছে। সুজাতা খুশী হয়—এসেছে চন্দন ?

জগুমাসী বলে—পুলিশে ছেড়ে দিল ? তা একা এসেছে না পুলিশ হাতকড়া—কোমরে দাড়ি পরিয়ে এনেছে র‍্যা !

রীণা বলে—ধ্যাৎ, তা কেন হবে। মা-ঠাক্‌মা দেখবে চল। কাকু কি সুন্দর নতুন কাকীমাকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামছে।

—তাই নাকি। সুজাতা খুশী হয়।

মহামায়া বলে—এসব কি জগুদি, সেই বাজে মেয়েটাকে ঘরে আনলো তাহলে। জগু বলে—চলোতো, তাহলে বাবু এর বিহিত করতেই হবে, এ বাড়ির মান-ইজ্জৎ তো ডোবাতে পারে না।

মহামায়াও এবার ফুঁসে ওঠে - চলতো, দেখিগে কোন বিদ্যেধরীকে এনেছে, এ বাড়িতে তাকে ঢুকতেই দেব না।

চন্দনও ভাবতে পারে নি যে এইভাবে তাকে মুক্তির পথ করতে হবে। এ সে চায় নি। কিন্তু এমনি বিয়েকে সাময়িকভাবে মেনে নেওয়া ছাড়া পথ ছিল না। আর জজসাহেব পুলিশ অফিসার ও বিয়ের সময় স্পষ্ট করে জানান।

—আমরাও খোঁজ খবর রাখব চন্দনবাবু, স্ত্রীর উপর আপনি যদি কোন অত্যাচার করেন—এই কেস আবার তুলে আপনাকে ধরে এনে জেলে পোরার ব্যবস্থাও করবো।

চন্দন তাই মেনে নিয়ে নতুন স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে তাদের বাড়িতে।

অপরাজিতার মনের কোণে অন্য মেয়েদের মতই তার স্বামী, শ্বশুর-বাড়ির সম্বন্ধে একটা স্বপ্ন ছিল, ধারণা ছিল। কিন্তু তার বিয়ে আর স্বামী—কোনটাই তার কল্পনার সঙ্গে মেলে নি। একটা দুরন্ত জেদের বশেই এই বিয়ের বাঁধনকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে অপরাজিতা।

ওই ছেলেটিকে—তাদের পরিবারকে সে তার প্রতি অন্যায়ের সমুচিত জবাব দেবে। তাদের বিপর্যস্ত করবে—তার জীবনকে যারা ব্যর্থ করেছে, অপরাজিতা তাই এই সংসার, এদের জীবনকেও বিধ্বস্ত করে দেবে। প্রতিশোধের সেই কঠিন শপথ নিয়েই অপরাজিতা এসেছে তার স্বামীর সংসারে, নিজেকে তার জন্য তৈরীই করেছে সে।

বড় বাড়ি ফটক পার হয়ে বাগান, এখানে বেশ কিছু গাছ-গাছালি, ফুলের গাছও রয়েছে। অপু বাড়ির গাড়ি বারান্দার নীচে নেমে দেখছে বাড়িটাকে।

জানতো সে তার জন্য এখানে নববধূর কোন উষ্ণ অভ্যর্থনা মিলবে না। তবু এ বাড়িতেই থাকতে হবে তাকে।

পুরোনো চাকর যদু ছুটে এসেছে খুশী হয়ে। তবু ছোটবাবুর সুমতি হয়েছে। বিয়ে থা করলে বোধহয় তার স্বভাব চরিত্র বদলাবে এবার।

যদুই এর মধ্যে বড় বৌ সুজাতাকে ডেকে এনেছে, শাঁখ—বরণডালা নিয়ে এসেছে সে, জলধারা দেবার ব্যবস্থাও করেছে। অণি এর মধ্যে নতুন প্যাণ্ট বদলে এসেছে। রীণা একটা শাড়িই পরে এসেছে খুদে গিন্নীর মত। আজ তাদের খুশীর দিন।

নতুন কাকীমা এসেছে ঘরে। যদু বুড়ো তো খুশীতে শাঁকই বাজাতে থাকে। হাঁক ডাক করে—অ মা, বৌদি-ছোট বৌদি—মাসী এসো—ছোটবাবু কেমন লক্ষী প্রতিমার মত বৌ এনেছে দ্যাখো।

সুজাতা এ বাড়ির বড় বৌ। কিছু কর্তব্য তার আছে চন্দনের বৌ-এর প্রতি। সেইই মেয়েকে দিয়ে বরণডালাটা আনিয়েছে ঠাকুর ঘর থেকে। ঢুকতে যাবে চন্দন নতুন বৌ নিয়ে।

এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়ায় মহামায়া সঙ্গে জগুমাসী, মায়া এ বাড়ির আরও ঝি চাকরের দল।

মহামায়া চমকে ওঠে—এ কি! এটা কোত্থেকে আনলে?

চন্দন বলে—পুলিশের জন্যই এ বিয়ে করতে হ'ল!

মহামায়া দেখছে নতুন বৌকে। জগুমাসী এমনিতেই খুব বুদ্ধি ধরে, কিন্তু পুলিশের ব্যাপারে তার ভয়টা একটু বেশীই। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা—পুলিশে ছুঁলে সে ঘা আর কোনদিন সারে না।

কখন কি ঝামেলা হয় কে জানে। তাই জগুমাসী এর মধ্যেই ভেবে নিয়েছে তার কৌশল। মহামায়াকে বলে গলা নামিয়ে।

—মায়া, পুলিশের বিয়ে—এ সব এখন চুপচাপ মেনে নিয়ে লোক দেখানি বরণ করে মেয়েটাকে ঘরে তোল। দু-একমাস যেতে দে—এদিকটা ঠাণ্ডা হলে ওই মেয়েকেও এ বাড়ি থেকে তাড়াবো, নাহয় চিরকালের জন্য সরিয়ে দেব। এখন ঝামেলা করিস না। নে বরণ কর—পাঁচজন দেখুক।

জগুমাসী স্থির বুদ্ধির মেয়ে, তা ভাবনাচিন্তা করেই সে কাজ করে, কিন্তু মহামায়ার এত ভাবার দরকার হয় না। তার মেজাজ সব সময়েই চড়ে আছে। সে যে এই বড়বাড়ির সর্বেসর্বা, এ বাড়িতে তার হুকুমই শেষ কথা এটাই জানে সে।

চন্দনের আনা ওই মেয়েটা এসে এই বড় বাড়ির বৌ হবে এ সে কোন মতেই মেনে নিতে পারে না। ওই মেয়েটাকে এ বাড়ির চৌকাঠই মাড়াতে দেবে না সে।

জগন্মাসীর কথায় রীণা বরণডালাটা নিয়ে যায় মহামায়ার কাছে, কিন্তু বরণ করার কথা মহামায়া ভাবতেই পারে না—এক ঝটকায় বরণডালা ছিটকে ফেলে মহামায়া গর্জে ওঠে।

—বরণ করতে হবে ওই পাঁজি-লোভী-নষ্টা একটা রাস্তার মেয়েকে। সে ঢুকবে এ বাড়ির বৌ হয়ে, আমি থাকতে এ হতে দেব না।

চন্দন চেনে মহামায়াকে। ওর এই উগ্রমূর্তি আর বরণডালা ছিটকে ফেলে দেওয়া দেখে সে থমকে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। ওই নতুন বৌকে নিয়ে এগোবার সাধ্য তার নেই।

সুজাতা ও চেয়ে আছে অসহায়ের মত। প্রথম দেখাতেই তার ভালো লেগেছে নতুন মেয়েটিকে। কত আশা নিয়ে সে শ্বশুরবাড়িতে এসেছে কিন্তু এমনি অভ্যর্থনা পাবে তা ভাবেনি বেচারা।

মহামায়া গর্জাচ্ছে দূর হয়ে যা—

অপরাজিতা এতক্ষণ চুপচাপ ব্যাপারটা দেখছিল। সে এই ধরণের অভ্যর্থনায় বিস্মিত হয় নি। এমনি কিছুই আশা করেছিল, আর এবার সে তার পথেই এগোবে। এই প্রতিবাদের কঠিন শপথ নিয়েই বিয়ে করেছে সে, তাকে তাই কঠিন হতেই হবে। মনের অতলের সুপ্ত শক্তিকে এবার পুঞ্জীভূত করে অপরাজিতা বলে চন্দনকে।

—থামলে কেন ভিতরে চল, চন্দনও সাহস পেয়ে এগোতে যাবে, এবার মহামায়া শুনছে নতুন মেয়েটার কথা। আগুনে যেন ঘি পড়ে, জ্বলে ওঠে মহামায়া।

—খবরদার, এ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোবে না। বের হয়ে যাও এখান থেকে, নাহলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

অপরাজিতা বলে স্পষ্ট স্বরে—এ বাড়িতে আপনারও যা অধিকার, আমারও সেই অধিকার। সেই অধিকারেই আমি এ বাড়িতে ঢুকবো আপনি আমাকে বাধা দিতে পারেন না।

জগদু ওর কথা শুনে এবার চমকে ওঠে।

—ওমা, নতুন বৌ না পুলিশ রে,—বলে কিনা জোর করে ঢুকবে এ বাড়িতে।

অপরাজিতা বুঝেছে এই প্রথম প্রতিবাদ তাকে করতেই হবে, প্রথম দিনেই ওই স্বার্থপর কুচক্রীদের কঠিন আঘাতই করবে সে, প্রথম জয় তাকে পেতেই হবে—তারপর এদের দুর্গের সবকিছুরই দখল করে নেবে। তাই বলে সে জগুমাসীর কথায়।

—হ্যাঁ, তাই ঢুকবো। চলো—এসো—এগিয়ে যায়, অপরাজিতা দৃপ্ত ভঙ্গীতে।

মহামায়ার কাছে এ একটা চ্যালেঞ্জই। তার এতদিনের অধিকারে আজ এই বাধা সে নীরবে মেনে নেবে না।

তাই এবার গর্জে ওঠে—খবরদার, এ বাড়িতে ঢুকবে না। এক পা এগোলে, সপাটে চড় কসার জন্য হাত তুলেছে মহামায়া—ফুঁসছে, আর এক পা এগোলে চড়ই মারবো।

কিন্তু চড় মারার আগেই অপরাজিতা এগিয়ে এসে মহামায়ার উদ্যত হাতটা চেপে ধরে।

দেখছে সকলেই। এ দৃশ্য যেন তারা সত্য বলে মানতে পারে না। এ বাড়ির সর্বেসর্বা ওই মহামায়ার শাসন সকলেই মুখ বুজে মেনে নেয়। এ বাড়ির সাম্রাজ্ঞীর শক্তিকে আজ প্রকাশ্যে বাধা দিয়ে স্তব্ধ করে দিয়েছে ওই নতুন মেয়েটা!

সুজাতা দেখছে বিস্মিত দৃষ্টিতে। মহামায়ার কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ সুজাতা করতে পারে নি। মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করেছে, চোখের জল ফেলেছে। এই প্রথম সে দেখলো মেয়েটির সাহস। মহামায়ার উদ্যত হাতটা সে নামিয়ে দেয়।

জগু বলে—ওমা। কি সর্বনাশা বৌ গা—ঘরে পা দিয়েই শাশুড়ীর গায়ে হাত তোলে। বৌ না পুলিশ।

অপরাজিতা বলে—হাতটা নামিয়ে দিয়েছি মাত্র, তার পরেও হাত তুললে তখন তাই করতেই বাধ্য হবো। কথাটা জগুকেই নয়, মহামায়াকেও শোনায় সে কঠিন ভাবে।

মহামায়া এবার থমকে গেছে। সে ভাবতে পারে নি এই ভাবে তার হাতটাকে কেউ নামাতে সাহস পাবে। এতদিন ধরে সে এই বাড়িতে তার শাসন এই ভাবে চালিয়ে এসেছে, বাধা দেবার সাহস কেউ পায় নি। আজ এই মেয়েটা এ বাড়িতে পা দিয়েই তার উদ্যত হাতকে নামিয়েছে। শাস [illegible] তাকে।

মহামায়া যেন ভয়ই পেয়েছে এই বাধায়। তাই এখুনিই কোন সিদ্ধান্ত নিতে চায় না। ভেবে চিন্তেই তাকে পথ নিতে হবে।

তাই এই লড়াই আপাততঃ মুলতুবি রেখে সে চলে যেতে চায়।

বলে মহামায়া—চলে আয় জগুদি, এসো মালা, এই বাজে মেয়েটার মত রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া করতে চাই না। ওর ব্যবস্থা এবার ঠিকমতই করছি, চলে আয়।

অর্থাৎ প্রথম আক্রমণেই মহামায়া কিছুটা বিধ্বস্ত, পরাজিত। সে তাই আপাততঃ পিছু হটতে চায়, পরে শক্তি সংযত করে ভেবে চিন্তে আর প্রবল ভাবেই আঘাত করবে ওই নতুন বৌকে।

ওরা চলে যায় ভিতরে। এবার দরজায় ঢুকতে আর কোন বাধাই নেই। অপরাজিতার প্রথম আঘাতে ওরা বিধ্বস্ত।

বাড়ি ঢুকতে যাবে এবার এগিয়ে আসে সুজাতা। সুজাতা আজ খুশি হয়েছে সবথেকে বেশী। এই প্রতিবাদ যা সে করতে পারে নি তা এই মেয়েটি সহজেই করেছে।

—দাঁড়াও ভাই।

ওর ডাকে চাইল অপরাজিতা।

সুজাতা বলে—বরণটা করে নিই বোন। কইরে রীণা, তোর নতুন কাকীমাকে বরণ কর।

ছোট্ট রীণা-এর মধ্যে ছত্রাকার করে ছড়ানো বরণডালাটা কুড়িয়ে আবার প্রদীপ জেলে নিপুণ মহিলার মত এগিয়ে আসে বরণ করতে।

অপরাজিতা বলে সুজাতাকে,—দিদি, তুমি বরণ করবে না?

সুজাতার পরনে থান, নিরাভরণ শূন্য হাত। বরণ করার ভাগ্য আর নেই। বলে সুজাতা।—আমার তো সেই সৌভাগ্য নেই বোন। ভগবান সেই অধিকার আমার কেড়ে নিয়েছে, তাই—

অপরাজিতা এমনিতে বিদ্রোহিনী। সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে সোচ্চার হতে চায়।

তাই বলে অপরাজিতা,—ছোট বোন বলে ডেকেছো, সেই বড় বোনের অধিকারেই তুমি আমায় বরণ করে নেবে, এতে কোন অকল্যাণ, কোন অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করবে না দিদি, কই এগিয়ে এসে বরণ করো।

সুজাতাকে আজ ওই নবাগত মেয়েটি যেন নতুন করে স্বীকৃতি দিল। চোখে জল, মুখে হাসি সুজাতা বরণ করছে তাকে। শাঁখ বাজাচ্ছে অণি।

আড়াল থেকে জগন্মাসী দৃশ্যটা দেখে, তার হরিনামের ঝুলির মধ্যে আঙুলগুলো উত্তেজনার বশে ঘন ঘন নড়ছে, বেশ বুঝেছে জগন্মাসী, এ বাড়িতে অশান্তির একটা মূলই এসে জুটলো। এই মূল থেকে এবার যে গাছ গজাবে তাকে উপড়ে ফেলা খুব কঠিন হবে।

চন্দন দেখছে অপরাজিতার ব্যাপারটা, এত তাড়াতাড়ি সেটা ঘটে যাবে এই ভাবে তা ভাবে নি। এখুনিই করারও কিছু নেই। কারণ ওই মেয়েটি যে কত কঠিন ধাতের আর কত তীক্ষ্ম বুদ্ধি তার প্রমাণ সে পেয়েছে, তাই এখুনি চট করে কিছু করতে চায় না। দুজনে বাড়িতে ঢুকেছে। সুজাতাই ওদের নিয়ে চলেছে। সঙ্গে অণি আর রীণা।

সামনে দোতালায় ওঠার সিঁড়ি, চন্দনদের ঘর উপরে। কর্তা থাকেন তিন-তলায় নির্বাসনে। দোতালায় সিঁড়িতে পা দিয়েছে চন্দন কিন্তু অপরাজিতা সিঁড়িতে ওঠে না। সে বলে সুজাতাকে,—দিদি, তোমার ঘর কোন দিকে?

সুজাতা নীচের তলায় একটা এঁদো ঘরেই থাকে ছেলে মেয়েদের নিয়ে কোন মতে। ঘরটা বড়ই তবে তেমন দামী আসবাব নেই। দুতিনটে তক্তপোষ রাখা আছে মাত্র।

সুজাতা বলে—নীচে, ওই দিকে।

অপরাজিতা বলে,—ওই খানেই আমি থাকবো দিদি, তোমার কাছে।

চমকে ওঠে সুজাতা—সে কি।

হাসে অপরাজিতা, বলে সে—সে সব অনেক কথা. পরে বলবো। এখন ওকে আমার ব্যাগটা তোমার ঘরে দিতে বলো।

যদু চাকরই ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছিল দোতালার ছোটবাবুর ঘরের দিকে। কিন্তু কথাটা শুনে চাইল সে।

সুজাতা বলে—ওই ব্যাগটা আমার ঘরে রেখে যাও যদুদা।

সুজাতা ভেবেছিল চন্দন হয়তো অপরাজিতার এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করবে। কিন্তু অবাক হয়। চন্দন কোন কথা না বলে একাই উপরে চলে গেল। অপরাজিতা চলে গেল একতলায় সুজাতার ঘরের দিকে।

ব্যাপারটা জগন্মাসীর নজর এড়ায় না। এই বিচিত্র ব্যাপারে তার কৌতূহল একটু বেশীই। কোন রহস্য রয়ে গেছে। সেটা জানা দরকার ওই মেয়েকে জব্দ করতে গেলে, তাই দাঁড়িয়ে থাকে।

যদু ব্যাগ রেখে ফিরছে।

—অ যদু। বাবা যদু—

যদু মাসীর আদরের ডাকে চাইল। অন্য সময় গলা চড়িয়ে নানা অলংকার প্রয়োগ করেই ডাকে তাকে। আজ আদরের সুরে ডাকতে যদু এগিয়ে আসে।

জগুমাসী গলা নামিয়ে শুধায়—ওই নতুন বৌটা কোথায় থাকলো রে? কোন ঘরে?

যদুর মনমেজাজ ভালো নেই, বিয়ে করে নতুন বৌকে এনে ছোটবাবু নীচের ঘরে ফেলে রাখবে তা ভাবে নি। ওই ব্যাপারটা দেখে সেও খুশী হয় নি।

তাই জগুমাসীর কথায় ফোঁস করে ওঠে যদু।—এত বেত্তান্ত আমি জানি না। চাকর বাকর মানুষ। খবর নিতে হয়, তুমি নিজেই যাও না নতুন বৌ এর কাছে।

দেখলে তো কেমন মেয়ে—উত্তরও পেয়ে যাবে। চলে যায় যদু জবাবটা দিয়ে।

জগুমাসী গজগজ করে—মর মুখপোড়া! একটা কথা বলতে গেলাম—সাত কথা শুনিয়ে দিলে গা! জয় রাধে।

হরিনামের ঝুলির মধ্যে আঙুল নেড়ে রাধারানীর সন্ধান করতে থাকে।

অপরাজিতা দেখে এ বাড়িতে নতুন আসার পর উপরের মহলের কেউই তার খোঁজ খবরও নিতে আসে না। কোন আদর আপ্যায়নতো দূরের কথা।

চন্দনও কোন খবরই নেয় না।

সুজাতা বলে—এ বাড়ির ধারাই এমনি অপু। আমার যাবার কোন ঠাই নেই। ছেলে মেয়ে দুটোর জন্য এই বাড়িতে ঝিয়ের মত পরিশ্রম করে পড়ে আছি, অথচ আমার স্বামীই তো এ বাড়ির বড় ছেলে—

অপরাজিতা দেখছে অণি আর রীণাকে। ফুলের মত দুটো ছেলে মেয়ে, এ বাড়িরই বংশধর তারা। অথচ তাদের কোন দাবীই যেন নেই। কোন মতে সামান্য কিছু খেতে পায়—আর এই ঘরে পড়ে আছে।

আজ অণি, রীণাও তাদের নতুন কাকীমাকে পেয়ে খুব খুশী। এর মধ্যে এ বাড়ির অনেক খবরই তারা দিয়েছে অপরাজিতাকে। ঠাকুমা তাদের মারে, নন্দন কাকা তাদের বকে। জগুদিদা তাদের তাড়াতে চায়, সব খবরই পায় অপরাজিতা।

মনে মনে অপরাজিতাও নিজেকে তৈরী করার শপথ নেয়। এ বাড়ির

ওই পাজি মানুষগুলোকে শায়েস্তা করতেই হবে তাকে।

এই অনাথ শিশুদের, ওই অসহায় সুজাতার নায্য অধিকার সে ফিরিয়ে দেবেই।

রাতের অন্ধকারে গাড়ির শব্দে চাইল জানালা দিয়ে দেখে এক সাহেব-সাজা যুবক ব্রিফকেস হাতে টলতে টলতে গাড়ি থেকে নামে—ড্রাইভার তাকে ধরতে দেরী করাতে গাল দেয়—এ্যাই শুয়োরের বাচ্চা—ধরবি তো আমাকে। যত্তোসব—

টলতে টলতে ভিতরে যায়।

সুজাতা বলে—ওই নন্দন বাবু, এ বাড়ির সর্বেসর্বা। কত্তাও ওর কথার উপর কথা বলতে পারে না, দেখছে অপরাজিতা।

সে এ বাড়িতে এসেছে কিছু সর্তে। তবু অপরাজিতা এ বাড়িতে থাকার জন্য কিছু কাজও করতে চায়।

তাই সকালে সেদিন দোতলায় চন্দনের ঘরে চা নিয়ে ঢুকেছে।

এই ঘরে থাকে চন্দন, আজ প্রথম সে ঢুকেছে এই ঘরে। এদিকে ওদিকে জামা-প্যাণ্ট-সার্ট-জুতো ছড়ানো। সিগ্রেটের প্যাকেট, মদের খালি বোতলও গড়াচ্ছে।

বিছানায় তখনও ঘুমাচ্ছে চন্দন। জানলা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে তবুও গত রাতের নেশার ঘোরে আচ্ছন্নের মত ঘুমুচ্ছে সে।

—চা!

পায়ের শব্দে চোখ মেলে চাইল চন্দন, ভাবতে পারে নি যে ওই মেয়েটা চা নিয়ে তার ঘরে আসবে। এ বাড়িতে আনতে হয়েছে তাকে বাধ্য হয়ে। কিন্তু চন্দনের মনে তার জন্য কোন ঠাঁই নাই।

তাই মেয়েটি আজ চা নিয়ে ঘরে ঢোকায় তার মনে হয় ওই কৌশলী মেয়েটি ক্রমশঃ তার মনে আর জীবনের আরও গভীরে আসার চেষ্টাই করছে। চন্দন তা হতে দেবে না।

—শোনো!

চাইল অপরাজিতা, চন্দন বলে,—এ বাড়িতে চা দেবার জন্য চাকরের অভাব নেই। তোমাকে কে চা আনতে বলেছে?

অপরাজিতা জবাব দেয় না। ওকে দেখছে।

চন্দন গর্জে ওঠে—নিয়ে যাও ওই চা। নিয়ে যাও, অপরাজিতা যেন কথাটা শোনে না ইচ্ছা করেই। চায়ের কাপটাও তোলে না। চন্দন রেগে

এক ঝটকায় কাপটা মেঝেতে আছড়ে চুরমার করে বলে,—এ ঘরে আর আসার চেষ্টা করো না।

তোমার ওই বদ মতলবের জবাব ওই ভাবেই দেব তাহলে। কথাটা মনে রেখো। অপরাজিতা বের হয়ে আসে বারান্দায়।

লম্বা বারান্দার ওদিকে তিন তলার দিকে সোজা সিঁড়িটা উঠে গেছে—একতলা থেকে তিন তলায়। ওদিকে খাবার ঘর—এপাশে মহামায়া—নন্দনদের শোবার বসার ঘরগুলো দামী আসবাবে সাজানো?

সকালেই এ বাড়ির ব্রেকফাষ্ট শুরু হয়। নন্দন, মালা—তার মেয়ের জন্য নানা কিছু খাবার। মাখন, টোষ্ট, ডিম, ফল, সন্দেশ। মহামায়ারও ওই সবই দরকার, জগুমাসী সামনে খায় সন্দেশ, ফলমূল। আড়ালে নিষিদ্ধ খাদ্যগুলোও পরখ করে।

আর নীচে তলার বাসিন্দাদের জন্য গত রাতের বাসি রুটি, ডাল আর গুড়। ওই খাবার অপরাজিতাও খেয়েছে ক'দিন, আর দেখেছে ওই মানুষগুলোর ব্যবহার।

বারান্দা দিয়ে আসছে হঠাৎ জগুমাসির ডাকে চাইল অপরাজিতা।

—শোনো মা—

অপরাজিতা এগিয়ে যায়। জগুমাসীর হাতে একটা থালায় কয়েকখানা বাসি রুটি, একটু শব্জী তাও গত রাতের, আর একটু গুড়।

জগুমাসী বলে—তা এদিকে কেন?

অপরাজিতা বলে—চা দিতে এসেছিলাম। ও কার খাবার মাসীমা?

জগুমাসী বলে—আর বলোনা বাছা। বুড়ো কত্তার সেবা করে করে নাজেহাল হয়ে গেলাম। অথব্ব, পঙ্গু মানুষ। সারেও না—সরেও না। ঠাকুরের মত সেবা খেয়ে যাচ্ছেন। যাই ওর সকালের খাবারটা দিয়ে আসি। ডাক্তার বলে—হাল্‌কা খেতে হবে ওকে। পায়ে বাত চলতে পারি না। কি করে যে সিঁড়ি ভাঙবো—জয় রাধে।

অপরাজিতা শুনেছে মাত্র এ বাড়ির কর্তার কথা। তেতলার ঘরে থাকেন তিনি, বিয়ে হয়ে আসার পর ওই মানুষটার কথা এরা কেউ জানায় নি। অপরাজিতাকে দেখতে হবে তাকে, জানতে হবে তার কি অসুখ। আজ সেই সুযোগ আসাতে অপরাজিতা বলে—মাসীমা, আপনাকে কষ্ট করে যেতে হবে না। আমিই পেঁছে দিচ্ছি খাবারটা।

জগুমাসী যেন একটা কাজের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে, বলে সে—তুমি

যাবে ?

—কেন ? আপনি বাতের ব্যাথা নিয়ে উঠবেন আমি থাকতে ? না না —আমিই দিয়ে আসছি।

অপরাজিতা ওই খাবারের থালাটা নিয়ে তিন তলায় উঠে যায়। জগুমাসী ওদিকের খাবার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

বন্ধ দরজাটা ঠেলে প্রায়ান্ধকার ঘরে ঢুকে একটা ভাপসা বিশ্রী গন্ধে থমকে দাঁড়ালো অপরাজিতা। কতদিন ওই ঘরে জানলা দরজা খোলা হয়নি কে জানে।

দরজা খুলতে এক ঝলক দিনের আলো ঘরে ঢুকেছে, কেমন অগোছালো ঘর।

হঠাৎ অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে আর্তস্বরে—না—না। আমি ওষুধ খাবো না। কিছুতেই না—আমার কিছু হয় নি। কিছুই হয় নি। তুমি যাও —জগুকে নিয়ে যাও। যাও—

হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর থেমে যায়। ওই বাইরের আলোয় দেখছে অপরাজিতা হুইলচেয়ারে বসা একটা দাড়ি গোঁফে ঢাকা জীর্ণ মানুষকে। দুচোখে তার ভয়—বিস্ময়। দেখছে সে অপরাজিতাকে।

অপরাজিতা ওর কথার আর ঘরের অবস্থা দেখেই বুঝেছে ওই লোকটিকে ইচ্ছা করে অসুস্থ-পঙ্গু করে রাখাই হয়েছে। আর তাকে বন্দী করে রেখেছে এই ভাবে।

অপরাজিতা বলে—আপনাকে ওষুধ খেতে হবে না বাবা।

অমরবাবু নতুন মেয়েটিকে দেখছে, ওর কথায় যেন একটা নির্ভর খুঁজে পায় সে,—তুমি। তুমি কে।

অপরাজিতা এবার প্রণাম করতে বিস্মিত হয় অমরবাবু।

অপরাজিতা বলে—আমি এবাড়ির নতুন বৌ আপনার বৌমা।

—চন্দনের বৌ! হ্যাঁ—শুনেছিলাম বটে ওরা কি সব বলছিল ?

অপরাজিতা এর মধ্যে জানলাগুলো খুলছে। ঘরে আলো ঢুকছে, সকালের ঝলমলে রৌদ্র।

অমরবাবু বলে—ওসব জানলা বন্ধ করো। ওরা দেখতে পেলে বকবে। বলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে আমার।

অপরাজিতা বলে—না, না। আলো আসুক ঘরে। নিন—হাত মুখ ধুইয়ে দিচ্ছি, জলখাবার খেয়ে নিন। খাবারের থালাটা দেখে হতাশ সুরে

বলে বৃদ্ধ।—তুমিও ওদের মত এই খাবার এনেছো মা? ওই শুকনো বাসী রুটি, বাসী শব্জী—আর পচা গন্ধওলা গুড়! না—খাবো না ওসব, খাবো না।

জানো মা—ওরা আমাকে খেতে অবধি দেয় না। অথচ আমার পয়সায় ওরা আরাম আয়েস করছে, রাজভোগ খাচ্ছে, তোমাকে কি খেতে দেয় মা? এই খাবারই, না?

অপরাজিতা বুঝেছে ওদের মতলবটা। একটা মানুষকে বন্দী করে ওরা তিলে তিলে পঙ্গু অথর্ব করে তুলে শেষ করতে চায়। যাতে এ বাড়ির সবকিছুর অধিকার তারাই পায়।

অপরাজিতা বলে কঠিন স্বরে। —বাবা আজ এই খাবার খান। কাল থেকে আপনার খাবার আমি তৈরী করে আনবো।

—আনবে তো মা। কতকাল ফল, সন্দেশ, মামলেট খাই নি। বাটার টোষ্ট, মাছ ভাজা, শব্জী, চাটনি—

অপরাজিতা বলে—সব হবে।

—আর ওষুধ! ওগুলো ওরা জোর করে খাওয়ায়। বড় কষ্ট হয় মা। ওষুধ আর খাবো না।

—ঠিক আছে। নিন বাবা!

আজ অমরবাবুকে নিজের হাতে খাইয়ে—মুখ ধুইয়ে দেয় অপরাজিতা।

অমরবাবু বহুদিন পর কথা বলার লোক পেয়ে আজ নিজেকে উজাড় করে কথা বলতে চায়। তার অতীত জীবনের কথা।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। চন্দনের জন্ম দিতে গিয়ে হাসপাতালে মারা গেলেন এ বাড়ির গিন্নী—চন্দন আর বড়ছেলে কুন্দনের মা।

শিশু চন্দন বেঁচে রইল হাসপাতালে, মহামায়া তখন সেই হাসপাতালের নার্স, মহামায়ার স্বামী মহামায়াকে তার শিশু সন্তান সমেত ফেলে রেখে চলে গেছে। মহামায়া তার বাচ্চা ছেলে নন্দনকে কোনমতে মানুষ করে হাসপাতালে চাকরী করে।

সেই মহামায়াই মা মরা শিশু চন্দনকে নিজের বুকের দুধ দিয়ে তার ছেলে নন্দনের সঙ্গে মানুষ করে।

আর চন্দনকে বাঁচাবার জন্যই সেদিন অমরবাবু মহামায়াকে নার্সের চাকরী ছাড়িয়ে নিজের বাড়িতে আয়া করে আনলেন, সঙ্গে এল মহামায়ার নিজের ছেলে নন্দনও, চন্দনেরই বয়সী।

অমরবাবুর বড় ছেলে কুন্দন বাবার সঙ্গে ব্যবসাপত্র দেখছে। এমনি দিনে অমরবাবু মহামায়াকে বিয়ে করার কথা ভাবতে বড় ছেলে কুন্দন প্রতিবাদ করে। সে ওই আয়া মহামায়াকে মা বলে মেনে নিতে রাজী নয় কোন মতেই।

কিন্তু অমরবাবুর তখন মতিভ্রমই হয়েছে মহামায়ার জন্য। বড় ছেলেকে তাই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হল।

অমরবাবু মহামায়াকে বিয়ে করলেন। ক্রমশঃ মহমায়াই হয়ে গেল এই সংসারের কর্ত্রী, তাকে সাহায্য করতে এল মহামায়ার বিধবা দিদি যোগেশ্বরী। সংসারের হালটা চলে গেল ওদের হাতে। এ বাড়ির বড় ছেলে কুন্দন সংসার ছেড়ে বাইরে গিয়ে নিজে বিয়ে থা করে সামান্য কাজ করে সংসার চালায়। তারও একটি ছেলে মেয়ে হয়েছে। অমরবাবুর কোন সাহায্য সে নেবেনা। ব্যর্থ পিতৃহৃদয় গুমরে কাঁদে। হঠাৎ একদিন মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেল কুন্দন। তার স্ত্রী সুজাতা ওই ছেলে মেয়ে নিয়ে বিপদে পড়ে।

সেদিন অমরবাবুই গিয়ে তাদের এ বাড়িতে আনেন। সুজাতা প্রথমে রাজী হয়নি। কিন্তু ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ এর কথা ভেবেই আসে এ বাড়িতে।

অপরাজিতা শুনেছে অমরবাবুর মুখে এবাড়ির ইতিহাস। অমরবাবু অসহায় কণ্ঠে বলে,—তাদেরও কি অবস্থায় এরা রেখেছে জানিনা মা। আজ আমি যেন কেউ নই! অসহায় অক্ষম-পঙ্গু একটা মানুষ। ঘরে বন্দী হয়ে মৃত্যুর দিন গুনছি।

অপরাজিতা বলে—না, না বাবা। আপনি আবার ভালো হয়ে উঠবেন। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

অমরবাবু দেখছে মেয়েটিকে।

তুমি বলছ মা!

—হ্যাঁ বাবা। আমি—

অপরাজিতা ওর ঘর থেকে বের হয়ে এসে কথাটা ভাবছে। ওই অসহায় বৃদ্ধ আজ এদের চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়েছে। সেই জাল থেকে ওকে উদ্ধার করতেই হবে।

আর বেশ বুঝেছে অপরাজিতা এ বড় কঠিন কাজই। এই বাড়ির অত্যাচারিত মানুষদের মধ্যে কেউ তেমন নেই যে তার পাশে দাঁড়ায়। তবু মনে হয় চন্দনকে এসব কথা জানাবে। অপুর নিজের জন্য নয়—ওই বৃদ্ধ অমরবাবু, তার বাবাকে বাঁচাবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবে সে। নিজের মান অপমান তুচ্ছ করে অপু চলেছে চন্দনের ঘরের দিকে।

মহামায়ার ঘরেই ওদের আলোচনা সভা বসে। সুজাতারও এদিকে আসার হুকুম নেই। জগমাসী বলে—নন্দনের কাজের খুব চাপ চলেছে মহামায়া, নন্দন জানে কি কর্ম করছে সে,। অফিসে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ থাকে—ইতিমধ্যে তার দু'একজন পেটোয়া লোকও জুটে গেছে কর্মচারীদের মধ্যে। তারা অফিসের গোপন ঘরে কিছু দেয়। পারমিট-কাঁচামালের কোটাই বিক্রী করে দিয়ে নগদ কিছু হাতায়।

কারখানাতেও নানাভাবে নন্দন প্রাপ্তি যোগের ব্যবস্থা রেখেছে। আর কারখানার মালের সঙ্গে লেবেল সেঁটে সেই হাশিস—ব্রাউন সুগার—নানা বেআইনী নেশার মালও পাচার করে।

তাই নন্দন ও চায়না চন্দন কোনদিন অফিসে, কারখানায় আসুক, তার এইসব কাজ কারবারে বাধা দিতে পারে।

তাই নন্দন চন্দনের ব্যবস্থাই করতে চায়।

আইনতঃ চন্দনই এসবের মালিক। নন্দন তাই চন্দনকে হাতে রাখতে চায়।

আর তাই নন্দন চন্দনের ঘরেও আসে খোঁজখবরও নেয় তার পরম দরদীর মত।

চন্দন ছেলেবেলা থেকেই আরাম আয়াসের মধ্যে মানুষ। নিজেকে কেন্দ্র করেই তার সব। নিজের মৌজ মস্তিটাই তার কাছে মুখ্য। আর সবই তার কাছে অর্থহীন।

তাই বাড়ির কথা, বাবার কথাও বিশেষ ভাবেনা। বাবাকে এড়িয়েই চলে।

নন্দনকে ঢুকতে দেখে চাইল চন্দন,

—কেমন আছিস চন্দন।

চন্দন বলে—ভালোই।

নন্দন দেখছে ওকে। বলে—দিনরাত পড়াশোনা নিয়ে থাকলে 'ব্রেনজাম' হয়ে যায়। একটু বেরুবি সন্ধার পর। ক্লাবে যাবি—বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মিশবি। রাখ টাকাটা—

বাণ্ডিলটা নিয়ে চন্দন বলে।

—মেনি থ্যাংকস নন্দনদা।

নন্দন বলে—চলিরে—সব ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। না-না। তোকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। পড়াশোনা কর তুই। এনজয় লাইফ! তা

নতুন বউ কিছু বলে টলে।

নন্দন খবরটা জানতে চায়।

কারণ ওই মেয়েটিকে সেও সমীহ করে। চন্দন বলে, বৌ নামেই, নো কানেকসন।

হাসছে নন্দন—যা বলেছিস। বৌ তো ঘর সাজানোর জন্য, জীবনের আসল আনন্দ তো বাইরে। বেষ্ট অব দি লাক্। চলি—টাকার দরকার হলে বলবি।

চলে যায় নন্দন।

অপরাজিতা ঘরে ঢুকতে গিয়ে কাজের কথাগুলো শুনে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। বেশ বুঝেছে অপরাজিতা চন্দনকেও এরা ওই ভোগলালসার পথেই চালাতে চায়--যাতে ওই বাইরের জীবন নিয়েই সে মত্ত থাকে। নিজের দিকে, তার বাড়ির দিকে চাইতে না পারে।

অপরাজিতা বুঝেছে চন্দনের কাছেও কোন সাহায্য সহযোগিতা সে পাবে না। এই লড়াই তাকে একাই লড়তে হবে।

অপরাজিতা জীবনে পরাজয়কে মুখ বুজে মেনে নেবেনা। তাই নিজেই সে এই লড়াই এ সামিল হবে। মনে মনে এই শপথই নেয়।

—কি কাকীমা! পড়াটা দেখিয়ে দেবে তো? নাহলে ক্লাসের টাস্‌ক্ হবে কি করে। মিনির মত আমার তো বাড়িতে আণ্টি পড়াতে আসে না।

অপরাজিতার যেন হুঁস ফেরে। সন্ধ্যাবেলায় সুজাতা ওদিকের হেসেলে ব্যস্ত থাকে। অপরাজিতাই অণি—রীণাকে পড়ায়।

অপু বলে—তোমার সব পড়া হয়ে যাবে অণি। রীণা বলে—আমারও'

তারপরই শিশু মনের বঞ্চনার কথাই বলে রীণা।

জানো কাকীমা, মিনি গাড়িতে করে স্কুলে যায় ঝকঝকে পোষাক পরে। ওর টিফিন বক্সে কতকি খাবার। শুকনো রুটি আর গুড় ছাড়া আমরা কিছুই পাই না টিফিনে।

অপরাজিতা সব শোনে। এবাড়ির ওরাই আসল দাবীদার, আর মিনি ওই জোয়ারের জলে ভেসে আসা মহামায়ার প্রথম স্বামীর সন্তান নন্দনের মেয়ে।

আজ এ বাড়ির সব সুখসুবিধা ওর জন্যই বরাদ্দ, এই দুটো শিশুও ওই স্বার্থপর, লোভী মানুষগুলোর লোভের বঞ্চনার শিকারে পরিণত হয়েছে। এ বাড়ির মালিক বৃদ্ধ অমরবাবুর অবস্থাটা সে নিজের চোখেই দেখেছে।

তাই অপরাজিতাই এবার নিজেই এর বিহিত করবে। তার পরমায়ু এ বাড়িতে মাত্র এক বছর। এ বাড়ির উপর স্বামীনামক পুরুষ ওই চন্দনের উপরও তার বিন্দুমাত্র মোহ নেই।

তাই কঠিন হতেও তার বাধবে না।

সকালে নন্দন স্নান সেরে পোষাক বদলে ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসেছে। চন্দনও এসেছে। মহামায়া-মালা জগুমাসীও হাজির।

হাঁক পাড়ে জগুমাসী সুজাতার উদ্দেশ্যে—কই হল নবাব নন্দিনীর। টোস্ট-দুধ-ডিম-কলা এসব দাও নন্দনকে। আমাদের জন্য গরম পরটা দাও—ফুলকপির তরকারিটা মাখামাখা করো। আর ফিরিজে কালাকাঁদ আছে চারটে করে দিও। হাত চালাও—

বের হয়ে আসে অপরাজিতা। খাবারের প্লেটগুলো এনে দেয় টেবিলে, আর খাবার দেখে নন্দন, চন্দন অবাক হয়। মহামায়ার চোখ কপালে উঠেছে, জগুমাসীর ফাটাকাঁসার মত গলা খনখনিয়ে ওঠে।

—এই জলখাবার! কুকুরেও খায় না। বাসি পোড়া রুটি, কালকের ডাল, শুকনো আর পচা গুড়।

নন্দন প্লেটটা মেঝেতে ছিটিয়ে ফেলে বলে—এই অখাদ্য খাওয়া যায় মা? টোস্ট, ডিম, কলা—ওমলেট।

অপরাজিতা ওর কথার উপরই সতেজ স্পষ্ট স্বরে বলে,—এ বাড়ির আসল মালিককে যদি ওই খাবারই খাওয়ানো হয়—অন্য সকলকেই ওই খাবারই খেতে হবে।

চমকে ওঠে জগুমাসী, মহামায়া চাইল জগুর দিকে। জগু বুঝেছে কাল কর্তার ঘরে ওকে দিয়েই খাবার পাঠিয়েছিল—তাইতেই সব জেনে গেছে মেয়েটা। ভুলই করেছে সে।

চন্দন কথাটা শুনে অবাক হয়।

—বাবাকে এই খাবার দেওয়া হয়?

জগুমাসী নীরব, অপরাজিতা বলে—হ্যাঁ কোনদিন কি দেখেছো কেমন আছেন, কি ভাবে আছেন তিনি? কি খাচ্ছেন? বাড়ির ছেলে যদি নিজের বাবার কোন খবর না রাখে—রাখবে অন্যলোক?

চন্দন কি ভাবছে, নন্দন ওই খাবার ছিটোনোর পরও অন্য খাবার না পেয়ে বলে—চলি, এসব মীমাংসা তোমরা করো। আমার জরুরী কাজ আছে।

নন্দন একবার অপরাজিতার দিকে কঠিন তীব্র দৃষ্টি মেলে চলে গেল হনহন করে।

মহামায়া ও উঠে চলে যায়। পিছুপিছু মালা—জগুমাসী ও চলে যায়।

যদুচাকর সব ব্যাপারটাই দেখেছিল। সে এই প্রতিবাদে খুশি হয়েছে সব থেকে বেশী।

সুজাতা বলে—এ কি করলি অপু ?

অপরাজিতা বলে—অন্যায়ের প্রতিবাদ করবো না ? তাই ভীমরুলের চাকে ঢিলই মারলাম।

—এরপর কি হবে জানিস ?

সুজাতার কথায় অপরাজিতা বলে—ভালোই হবে। যদুদা—তুমি বাজার থেকে আজ ভালো মাছ, টম্যাটো-মটর সুটি-ফুলকপি আনো।

যদু বলে—আনছি বৌদি।

এদিক ওদিক চেয়ে গলা নামিয়ে যদু বলে,—বেশ যুৎসই ওষুধ দিয়েছো বৌদি। ওই জগুমাসীই যত নষ্টের মূল। মন্থরা গো—বদ মতলব দে সংসারটারে রসাতলে দিচ্ছে। অপরাজিতা শোনে সবই। এবার সে নিজের পথেই এগোবে। অপরাজিতা বলে সুজাতাকে—ওরা নিজেরাও জানে কি করছে। তাই ভয় ওদেরই বেশী। আমি ওদের সামনে তাই মাথা উঁচু করেই নিজের পথে চলবো।

জগুমাসী বুঝেছে ওই মেয়েটাকে সহজে থামানো যাবে না। ওর জেদও কঠিন। নাহলে চরম অপমান করল ওকে চন্দন। সেই অপমান মুখ বুজে সহ্য না করে পুলিশ জজসাহেবকে ধরে চন্দনকে বিয়ে করতে বাধ্য করালো।

মহামায়ার ঘরে জরুরী বৈঠক বসেছে। নন্দনও ফিরে এসেছে, সে এখন নীরব শ্রোতা। আজকের খাবার ঘরে ওই অপমানটাকে ভোলে নি সে।

মহামায়া বলে—সূচ হয়ে ঢুকে ফাল চালাবে ওই মেয়ে ? সব তছনছ করে দেবে ?

নন্দনের ভয় হয়। ওই মেয়ে যদি তার কুকীর্তির খবর জেনে ফেলে বিপদ হবে। তাই গর্জে ওঠে নন্দন।—তার আগে ওর বিহিতই করবো। নন্দনের পিছনে লাগার মজা টের পাইয়ে দেব ওকে।

নন্দন এমনিতেই গোঁয়ার, হয়তো কিছু আনসান করে ফেলবে, তাতে ঝামেলাও বাড়বে।

জগ্‌মাসী বলে,—মাথা গরম করে কোন কিছু করিস না নন্দন। হিতে বিপরীত হবে। আমি বলি দুচারদিন চুপ চাপ থেকে মেয়েটার মতিগতি—কাজকর্মের দিকে নজর রাখ। তারপর ভেবেচিন্তে একটা পথ নিতে হবে। এখন কিছু করে কাজ নেই।

মহামায়া বলে—তখনই জানতাম ওমেয়ে সাংঘাতিক, এখন কি বাধায় কে জানে।

জগ্‌মাসী বলে—নন্দন, চন্দনকে হাতে রাখ। ওই বৌটার পাল্লায় যেন না পড়ে। ওমেয়ের পাল্লায় পড়লে চন্দনের কি হবে তা জানি না। তবে তোর সর্বনাশ হবে। নন্দন ভাবছে কথাটা।

বলে নন্দন—ও নিয়ে তুমি কিছু ভেবনা। চন্দনকে দাঁড়ের ময়নার মত পোষ মানিয়ে সোনার শিকল পরিয়ে রাখবো, ও জীবনেও ট্যা ফু করতে পারবে না।

নিশ্চিন্ত হয় জগ্‌মাসী।—তা জানিরে। জয় রাধে—সবই তোমার ইচ্ছা রাধারানী।

জগ্‌মাসী মাঝে মাঝে রাধারানীর জয়ধ্বনি দিয়ে মনের ময়লা সাফ করার চেষ্টা করে।

চন্দন যেন নতুন করে ভাবছে ব্যাপারটাকে। তার সারা মনে ওই অপরাজিতার জন্য রয়েছে জ্বালা আর গ্লানি, জীবনে দুচারজন মেয়েকে নিয়ে এসব ব্যাপার সে এর আগেও করেছে, টাকা পেয়েই তারা চুপচাপ সরে গেছে।

কিন্তু এই অপরাজিতার ব্যাপারটা একেবারে নতুন মোড় নিয়েছিল। হাজতবাসও হয়ে গেছে, জেলেও যেতে হতো। কোন মতে বিয়ে করে বেঁচেছে, কিন্তু এই অপমানটাকে চন্দন ভুলতে পারে নি।

তাই এ বাড়িতে এসেও তার কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি অপুর সঙ্গে। দুজনেই দুজনকে এড়িয়ে চলে।

চন্দন তবু স্ত্রীকে সমীহ করে, ওকে দেখেছিল প্রথম দিনই রুখে দাঁড়াতে। আবার দেখেছে কাল খাবার ঘরে এক চরম নাটকই করলো।

আর বাবার সম্বন্ধে কথাগুলো অপু যেন তাকে ইচ্ছা করেই শুনিয়েছিল।

চন্দন তাই আজ এসেছে অমরবাবুর ঘরে, ঘরে ঢুকে অবাক হয়। কদিন আগে একবার এসেছিল এ ঘরে।

বন্ধ ঘরটায় একটা ভাপসা গন্ধ, সেদিন দেখেছিল বাবার গালে দাড়ি

গোঁফের জঙ্গল, পরনে ময়লা পাঞ্জাবী পাজামা, যেন অসুস্থ একটা মানুষ।

বেশীক্ষণ থাকতেও পারে নি। চলে গেছল চন্দন।

আজ সেই বন্ধঘরের সব জানলা খোলা সাফ সুতোরা করা হয়েছে ঘরটা। জানালায় নতুন পর্দা—অমরবাবুর দাড়ি গোফও কামানো, পরনে ধোপদুরস্ত পায়জামা।

অপরাজিতা সেদিন বিকেলেই যদু আর অন্য কাজের লোক ডেকে এনে ঘরদোরের হাল ফিরিয়েছে, নাপিত ডাকিয়ে একদিন অন্তর দাড়ি গোঁফ কামানোর ব্যবস্থাও করেছে।

খবরের কাগজও পাচ্ছে অমরবাবু।

চন্দনকে ঢুকতে দেখে চাইল।

—এসো চন্দন।

চন্দন শুধোয়—কেমন আছেন?

অমরবাবু বলে—ভালোই। নতুন বৌমা খুব ভালোরে—দ্যাখ কেমন ঘরের হাল ফিরিয়েছে, আমারও। বড় লক্ষ্মীরে।

চন্দন শুনছে কথাগুলো। মনে হয় অপরাজিতার এও একটা মতলবই। বাড়ির কর্তাকে হাতে আনার জন্যই সে হিসাব করেই এগোচ্ছে। কথাটা হয়তো প্রকাশই করতো, কিন্তু সময় পায় না। অপরাজিতা অমরবাবুর খাবার নিয়ে ঢুকছে।

সেও চন্দনকে দেখে চাইল। এগিয়ে যায় অপরাজিতা অমরবাবুর দিকে। যদু খাবার টেবিলটা এগিয়ে দেয়। অপু খাবার রাখে।

অমরবাবু বহুদিন পর আজ সুখাদ্য দেখে খুশী হয়।

—বা, বাশমতি চালের ভাত, উচ্ছে ভাজা, পোনার কালিয়া, পাবদা মাছের ঝাল—দারুণ পছন্দ করি পাবদা মাছ মা, জানলে কি করে? আমের চাটনী—

অপরাজিতা বলে—খেয়ে নিন বাবা। তৃপ্তিভরে খাচ্ছে অমরবাবু অনেকদিন পর। চন্দন দেখেমাত্র, চলে যায় সে।

অপরাজিতা খাওয়াচ্ছে অমরবাবুকে। অমরবাবু বলে—হাটা চলা করতে পারি না মা, ওই ওষুধ খেলে পাগুলো যেন আরও অবশ হয়ে আসে, বুক ধড়ফড় করে।

অপরাজিতা বলে—ওসব ওষুধ আর খেতে হবে না বাবা।

অমরবাবু বলে—তুমি বরং ডাঃ সেনকে ফোন করো—আমার পুরোনো ডাক্তার, নাম্বারটা দিচ্ছি, সে এসে দেখুক।

—তাই হবে বাবা।

দরজার বাইরে জগন্মাসী এসে দাঁড়িয়েছে। উঁকি মেরে জগন্মাসী চমকে ওঠে। ঘরের সব জানালা খোলা—ঝকঝকে রোদ, অমরবাবুর চেহারা একদিনেই যেন বদলে গেছে।

জগুকে দেখেই অমরবাবু চমকে ওঠে।

—তু—তুমি!

জগু দেখছে ওকে। অপরাজিতাই বলে। —আপনাকে ওর সেবা করতে হবে না মাসীমা। আমিই করবো আপনি যান।

জগন্মাসী হতচকিত হয়ে বের হয়ে আসে, আজ বুঝেছে জগু তাদের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের মত এসে পড়েছে ওই মেয়েটা। যে কোন মুহূর্তে সর্বনাশা ঝড় উঠবে, তার আগেই একটা বিহিত করতেই হবে।

ডাঃ সেন এ বাড়ির পুরোনো ডাক্তার। কিন্তু মহামায়া এ বাড়ির কর্তৃত্ব হাতে পেতে তাকে আর ডাকা হয় না। মহামায়ার কোন চেনা ডাক্তারই আসতেন অমরবাবুকে দেখতে।

তারপর অমরবাবুর অসুখও বেড়ে যায়। হাটা চলার শক্তিও শেষ হয়ে যায়।

বেশ কিছুদিন পর ডঃ সেনকে এ বাড়িতে আসতে দেখে মহামায়া বিস্মিত হয়। নন্দন ও রয়েছে।

চন্দন খবরটা পায় মাত্র, দেখে অপু ডাঃ সেনকে নিয়ে তেতলায় উঠে গেল অমরবাবুর ঘরে।

মহামায়া এসেছে এ ঘরে। স্বামীর অসুখের জন্য সেও চিন্তিত সেটা প্রকাশ করতে চায়।

ডাঃ সেন দেখে শুনে বলেন—আগেকার প্রেসক্রিপশনগুলো পেলে ভালো হতো, আমার মনে হচ্ছে চিকিৎসায় বোধহয় একটু ভুল হয়ে গেছে, নাহলে ওর এত বাড়াবাড়ি হবার কারণ তো দেখি না।

কিন্তু আগেকার প্রেসক্রিপশনগুলো ছিল—কোথায় যে রাখলাম—মহামায়া এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই করে। জগন্মাসী নীরবে নিপাট ভালো মানুষের মত মালা জপছে। নন্দনও চুপচাপ থাকে।

ডাঃ সেন বলেন—এখন কোনও ওষুধ দেবেন না। আমি ব্লাড, ইউরিন-গুলো টেষ্ট করে তবে ওষুধ দেব। আর খাওয়া দাওয়া যেমন চলছে চলুক।

সকালে বাগানে যেতে পারেন।

মহামায়া বলে—হাটা চলা করতে পারেন না তো!

অপরাজিতা বলে—হুইল চেয়ারেই নামিয়ে নেব।

—তাহলে তো ভালোই হয়।

ডাঃ সেন চলে যান। মহামায়া—নন্দনরা নেমে যায়।

এবার অপরাজিতা বলে অমরবাবুকে।—শুনলেন তো—তেমন কোন অসুখই নয় আপনার, সেরে উঠবেন।

অমরবাবু বলে—তোমার জন্যই সারবো মা। কিন্তু এভাবে পঙ্গু হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি!

অপরাজিতা বলে—হতাশ হচ্ছেন কেন? দেখবেন ঠিক ভালো হয়ে যাবেন।

অণি, রীণা সকালে বাগানে খেলা করে। ক'দিন ধরে তাদের নতুন সাথীও জুটেছে। অমরবাবুও অনেকদিন পর বাগানে এসেছে। সকালের রোদে ঝলমল করে বাগান, সবুজ ঘাসের বুকে শিশির কণা রোদে ঝিকমিকি তোলে, বাতাসে কোন ফুলের সুবাস মিশেছে।

হুইল চেয়ারে করে অপরাজিতা অমরবাবুকে নিয়ে বাগানে ঘোরে। অমরবাবু বলে,

—অনেক চেষ্টা করে নানা গাছাগাছালি দিয়ে বাগানটাকে সাজিয়ে ছিলাম, ওদিকে গোলাপই ছিল কত জাতের। নিজে অসুখে পড়লাম আমার বাগানের সব ফুলও ঝরে গেল।

অপরাজিতা বলে—আবার ফুল ফুটবে।

অনি—রীণারা দাদুর কাছে যেতে পারে নি এতদিন জগু দিদা আর বড় মায়ের পাহারা এড়িয়ে। আজ দাদুকে কাছে পায় তারা।

অমরবাবুও শুধোন ওদের—পড়াশোনা করছিস তো।

—হ্যাঁ। নতুন কাকীমা পড়ায়। স্কুলে এবার আমি ফার্ষ্ট হয়েছি দাদু।

অণিকে কাছে টেনে নেয় অমরবাবু।

—বাঃ। তাহলে তো প্রাইজ দিতে হবে।

রীণা আবদার করে।—একা দাদাকে দিলেই হবে না। আমাকেও দিতে হবে প্রাইজ।

পরদিনই লাল বল একটা আনায় যদুকে দিয়ে।

বল পেয়ে ওরা খুশী।

অমরবাবু দেখছে ওদের খুশির খেলা।

রোদ বাড়ে। অপরাজিতা ওকে নিয়ে আসে ওর ঘরে। অমরবাবুর কাছে এই সকালটুকু যেন মুক্তির স্বাদ আনে।

·

সেদিন সকালে বাগানে বেড়াচ্ছে ওরা। যদুও রয়েছে। অমরবাবুকে নিয়ে ওরা ফিরছে বাড়ির দিকে। হঠাৎ সাতসকালে গেটের বাইরে একটা টাক্সি এসে থেমেছে।

অপরাজিতা দেখে নন্দন ওই টাক্সির কাছে গিয়ে টাক্সিতে বসা একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। মেয়েটার সঙ্গে রয়েছে একজন লোক। শীর্ণ লম্বা বেয়াড়া ধরণের চেহারা।

মেয়েটিও সাতসকালে উগ্রপ্রসাধন করে এসেছে, পোষাকও তেমনি জমকালো। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে যে নয় তা বোঝা যায়।

অপরাজিতা যদুর হাতে অমরবাবুকে দিয়ে কি কৌতূহল বশে সে গিয়ে গেটের ওদিকে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়ালো। নন্দনের ব্যাপারেও তার জানা দরকার, আজ সেই সুযোগ আসতে অপরাজিতা এগিয়ে যায়। শুনছে ওদের কথাগুলো।

নন্দন ভাবতে পারেনি রীমাবাঈ সটান তার বাড়িতে এসে হানা দেবে। রীমাবাঈজীকে মাসে মাসে বেশ মোটা টাকাই দিতে হয়। আর তাদের বেআইনী হেরোইন-এর চালানচক্রের সেও একজন।

নন্দন বলে—কি ব্যাপার ?

রীমাবাঈ বলে—কতদিন যাওনি ওদিকে। টাকাও পাইনি দুমাস। মালের টাকাও বাকী পড়েছে। তাই এসেছি। আজ গেট অবধি এসেছি, এরপর টাকা না পেলে বাড়ির ভিতরই যেতে হবে। ফুর্তি করবে—টাকা দেবে না ?

নন্দন রীমাকে এখান থেকে বিদায় করতে চায়। এ বাড়ির আর কারো নজরে পড়ুক রীমাবাঈ এটা সে চায় না। তাই নন্দন বলে—তুমি চলে যাও, আমি রবির হাতে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। রবি তুই নেমে আয়।

শীর্ণ লম্বা লোকটা নামল। রীমাবাঈ বলে—আজই টাকা সব চাই, তাহলে কিন্তু ভালো হবে না। টাকার জন্য বসও তাড়া দিচ্ছে।

রীমা চলে যেতে নন্দন রবির জামার কলার ধরে গর্জায়—তুই ওকে

এ বাড়িতে এনেছিস ?

রবি বলে—না নন্দনবাবু, আমি ওকে আনতে চাইনি এখানে, ও নিজেই এলো, টাকার খুব দরকার।

নন্দন ওকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। দেখছে অপরাজিতা, খবরটা, সব পায় নি। তবে বুঝেছে একটা রহস্য রয়ে গেছে।

রবি টাকা নিয়ে ফিরছে, বেশ খুশী হয়েই ফিরছে সে। তবে নন্দনবাবু সেই বেআইনী মালের টাকা দেয় নি। নন্দনকে বলে রবি।

—নন্দনবাবু, শেঠজী ওসব মালের টাকা না পেলে তোমাকে ছাড়বে না। রামাবাঈও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

নন্দন বলে—এখন যা, ওসব টাকা পরে পেঁছে দেব।

রবি নামছে সিঁড়ি দিয়ে, হঠাৎ সামনে অপরাজিতাকে দেখে টাকাগুলো পকেটে পুরে থমকে দাঁড়ালো।

—শোনো!

ওর কঠিন কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে রবি। অপরাজিতা শুধোয়—মেয়েটি কে ?

না—মানে—আমতা আমতা করে রবি। এবার অপরাজিতা কড়া স্বরে বলে।

—ঠিক ঠিক জবাব না দিলে তোমাকে পুলিশে দেব।

পুলিশের নামে রবি চমকে ওঠে। নানা ধরণের অন্ধকারের কাজই তাকে করতে হয়। তাই পুলিশের ঝামেলায় যেতে চায় না। বলে সে।

—আজ্ঞে বলছি।

অপরাজিতা বলে—সব ঠিক ঠাক বলতে হবে—না হলে পুলিশেই ফোন করবো। কে ওই মেয়েটি ? কেন এসেছিল এখানে ? জবাব দাও।

রবিও বুঝেছে বেশ শক্ত লোকের পাল্লাতেই পড়েছে সে, তাই রবিও সব কথাই প্রায় জানিয়ে দেয়। নন্দনের অন্যদিকের এই পরিচয় পেয়ে অবাক হয় অপরাজিতা।

—এমনি ধরণের মানুষ নন্দন বাবু ?

অপরাজিতার কথায় রবি বলে, আজ্ঞে। তবে আমি বলেছি বলবেন না। নন্দনবাবু আমাকেই তাহলে ফিনিশ করে দেবে।

অপরাজিতা ওকে আশ্বাস দেয়।

—না না। ভয় নেই। কেউ জানতে পারবে না। যেন ছাড়া পেয়ে রবি লম্বা লম্বা পা ফেলে সরে পড়ে।

অমরবাবু কিছুদিন থেকে দেখছেন মহামায়া অফিস, কারখানার সব কাজের দায় দায়িত্ব তার হাত থেকে তুলে নিয়ে নন্দনের হাতেই দিয়েছে। অমরবাবু এটা চান নি। তিনি ভেবেছিলেন চন্দন নিজে ব্যবসাপত্র দেখবে, কিন্তু চন্দন তার কথায় কান দেয় নি।

অমরবাবু অসুস্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু শরীরে মনে জোর পাচ্ছে এখন। তাই ভাবছে কথাগুলো। নিজে অন্ততঃ হিসাবপত্রও দেখবে।

এমনি সময় অপরাজিতার মুখে আজ নন্দনের কাছে ওই রীমাবাঈজী আসার খবর পেয়ে, একটু অবাক হয় অমরবাবু।

অপরাজিতা বলে—বৌবাজারের ওদিকে থাকে ওই রীমাবাঈ। নিজের বাড়ি—ওর ওখানে যায়। কি সব ব্যবসা ও করে সেখানে, আর তার জন্য ওকে অনেক টাকাও দিতে হয়।

—ব্যবসা করে! ওখানে? টাকা দিতে হয় ওকে, অমরবাবু ভাবছেন কথাটা। নন্দনের ব্যাপারগুলো এবার দেখতে হবে, কে জানে তাকে আড়াল করে কি সর্বনাশ করছে নন্দন।

মহামায়া—জগু দুজনেই আজ অমরবাবুকে যেন সর্বস্বান্ত করতে চায়। মহামায়ার নামে কারখানা—তার হিসাব, টাকাকড়িও ওর নামে।

অমরবাবু বলেন—সেরে উঠবো কিনা জানি না মা। চন্দন যদি নিজেরটা বুঝে নিত নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু সে এসব বোঝার চেষ্টাও করল না। তুমি ওকে একটু বলো।

অপরাজিতা ওই অসহায় বৃদ্ধকে জানাতে পারে না তাদের প্রকৃত সম্পর্কের কথা। ওসব শুনলে লোকটা দুঃখই পাবে মাত্র। সে দুঃখ ঘোচাবার সাধ্য অপরাজিতার নেই। তাই চুপ করেই থাকে অপরাজিতা।

অমরবাবু বলে—এই সর্বনাশ থেকে বাঁচার পথও জানি না মা।

অমরবাবু কথাটা মনে মনে ভেবেছেন ক'দিন ধরেই। মহামায়া সেদিন এসেছে এ ঘরে। ইদানীং ডাঃ সেনই আসছেন। ফিজিওথেরাপি, ম্যাসেজও চলছে, অপরাজিতাই দেখাশোনা করে।

মহামায়া এসেছে খবর নিতে। সে দেখে কর্তা হাঁটা চলা করতে পারছে কিনা। ভয় হয়—সুস্থ হয়ে উঠলে অমরবাবু আবার অফিস—কারখানায় বের হবে, এটা সে চায় না।

নন্দনও চায় না।

অবশ্য জগু বলে—তুই ভাবিস না দিদি। ওই বুড়ো আর কোনদিন দাঁড়াতে পারবে না, হাঁটা চলাতো দূরের কথা।

মহামায়া তাই খবর নিতে আসে।

অমরবাবু বলে—নন্দন আছে?

—কেন?

অমরবাবু শোনায়—ওকে একবার দেখা করতে বলো। অফিস, কারখানার হিসাবপত্র ওযেন আনে। দরকার হলে ম্যানেজারকে যেন সঙ্গে নিয়ে আসে। কথাটা শুনে মহামায়া চমকে ওঠে। অর্থাৎ ও আবার সব দেখাশোনা করতে চায় বিছানাতে বসেই।

এ বোধহয় ওই বৌ-এর মন্ত্রনাতেই বলছে ও। মহামায়া তখনকার মত বলে।

—ঠিক আছে। নন্দন ফিরুক বলবো।

—হ্যাঁ। বছর শেষ হয়ে আসছে। সব হিসাবপত্র করে ট্যাক্স রিটার্ন দিতে হবে।

মহামায়া তবু বলে,—এ নিয়ে ভেবো না। নন্দন তাই নিয়ে ব্যস্ত। ওসব ঠিকই করবে।

তবু বলে অমরবাবু—না-না আমি নিজে দেখতে চাই। বলো নন্দনকে।

এসব শুনে নন্দন বেশ বুঝেছে পিছনে এবার খোঁচা মারার লোকও জুটেছে। নাহলে এতদিন হিসাবের কথা ওঠে নি। আজ উঠলো কেন।

মহামায়া বলে—তাই তো ভাবছি! এমন শত্রুতা কে করছে? চন্দন নয়তো,

জগুমাসী বলে—চন্দনই যদি বা কিছু বলে সে নিজে থেকে নিশ্চয়ই বলেনি। তাকে বলিয়েছে এই পাজী মেয়েটা। বলিনি—ও সাংঘাতিক মেয়ে।

নন্দন ভাবছে, ইদানীং তার আমদানীও কমছে। বিশেষ করে রীমা বাঈএর সেই নেশার জিনিষের দাম মিটিয়ে দিতে হয়েছে, অন্ধকারের লোকদের টাকা হজম করা যায় না। জান নিয়ে নেয় তারা।

তাই টাকা মিটিয়ে দিতে হয়েছে, আর রীমা বাঈও বেশ কিছুদিন ধরে একটি হারের জন্য ধরেছে, সেটা দেব দেব করে এখনও দিতে পারেনি নন্দন। ঘরের টাকা ভেঙ্গে হার দেবার পাত্র সে নয়, অথচ হার না পেলে রীমাও মুখ

ভার করে থাকে. আসরই জমে না।

সুতরাং হার দিতেই হবে নন্দনকে, ক'দিন ধরেই কথাটা ভাবছিল নন্দন। আজ হঠাৎ যেন সমস্যা সমাধানের পথও পেয়ে যায়, সুজাতার গলার হারটা দেখে।

নন্দন দেখছে হারটা। পুরানো হলেও বেশ ভারিই, ওতেই কাজ হবে, তাই নন্দন বলে মালাকে—মালা, মায়ের মন্দিরে মানসিক করেছি সোনার হার দেব। একটা বড় অর্ডারও পেয়েছি মায়ের আশীর্বাদে। সেই মাল কিনতে সব টাকা শেষ, সাপ্লাই দিলেই টাকা পাবো। মোটা টাকা। তার আগে মায়ের মানসিক শোধ করতে চাই। কিন্তু হার কেনার মত টাকাও নাই— তোমার তো দুতিনটে হার আছে, ওই যেটা পরে আছো ওটাই দাও।

মালা সেদিকে খুব সাবধানী। বলে সে,—ওমা! এ হার দেব কেন? সখ করে গড়ালাম, না বাপু।

চিন্তিত কণ্ঠে বলে নন্দন,—তাহলে মায়ের মানসিক শোধ করা হবে না।

—ওমা মহামায়া দেখছে ছেলেকে। এর আগেও নানাভাবে অনেক টাকা নিয়েছে নন্দন। ফেরৎ দেয়নি, আজ আবার হারের বায়না ধরেছে। মহামায়া জবাব দেয়না। চুপ করেই থাকে।

জগুমাসীই বলে--তা বাছা মায়ের মানসিক তো শোধ করতেই হবে।

সুজাতার গলার হারটা দেখে বলে নন্দন,—বড়বৌদি, তোমার হারটাই না হয় দাও। টাকা পেলেই আবার গড়িয়ে দেব।

জগুমাসী বলে—তাই দাও বাছা। তাছাড়া কপালই যখন পুড়েছে তখন আর হার অলংকার কি হবে। তবু শুভকাজে লাগবে। দিয়েই দাও।

সুজাতা চমকে ওঠে। এই হারটুকুই তার স্বামীর শেষ চিহ্ন। আর যা গহনা ছিল সে সব বাঁচার লড়াই-এ কোনদিকে চলে গেছে। রয়ে গেছে এই টুকুই।

সুজাতা বলে, না—না—মাসীমা। এটুকুর দিকে আর নজর দেবেন না। ওর শেষ চিহ্ন—

নন্দনই এবার এগিয়ে আসে। হারটা ধরে খুলে নিতে সুজাতা চমকে ওঠে। আর্তকণ্ঠে বলে,—আমার হার!

কঠিনকণ্ঠে নন্দন বলে—এনিয়ে গোলমাল করো না। একদম চুপ করে থাকবে। নাহলে ছেলেমেয়েকে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। আর কথা দিচ্ছি একমাসের মধ্যে নতুন হার পাবে।

জগন্মাসী বলে—তবে ঃ দুদিনের জন্য দেওরকে হারটা দিচ্ছ মাত্র, হার তো পাবে। যাও—উনুনে ডাল চাপিয়েছি পুড়ে যাবে।

সুজাতা চোখের জল মুছে সরে এল। আজ তার শেষ সম্বলটুকুই চলে গেল, অথচ মুখ ফুটে কিছু বলার নেই। জানে ওরা কতবড় শয়তান—ছেলেমেয়েকে নিয়ে পথে বের করে দিতেও ওদের এতটুকু বাধবে না। তাই চুপ করেই থাকে সুজাতা।

কিন্তু রাতে অপরাজিতার কাছে ধরা পড়ে যায়, অপুই শোয় ওর ঘরে। প্রথমদিন থেকেই এই ব্যবস্থা চলে আসছে, রাতের বেলায় ওদের সুখ দুঃখের কথা হয়।

সুজাতা দেখছে দূর থেকে পঙ্গু শ্বশুরকে নিয়ে বাগানে ঘোরে অপু, তার ছেলেরাও দাদুর কাছে যায়। কথা বলে।

আর অমরবাবুকে সেবা করার জন্য জগন্মাসী মহামায়ারা আদৌ খুশী নয় তাও জানে সুজাতা।

কিন্তু অপরাজিতা কিছুটা বেপরোয়া। সে বলে সুজাতাকে—আমি ভয় করিনা।

আজ অপরাজিতা সুজাতার গলা খালি দেখে বলে—বড়দি তোমার হারটা ?

সুজাতা প্রথমে এড়াতে চায়। বলে ইতি উতি করে—খুলে রেখেছি।

কিন্তু অপু বলে—উঁহু, কিছু লুকোতে চাইছ! বলনা।

সুজাতা শেষ অবধি বলে—কোন গোলমাল করবি না কথা দে!

ঠিক আছে। কথা দিলাম, বলো!

সুজাতা বলে--কথা দিচ্ছিস কিন্তু!

অপু বলে— হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ। বলোতো কি ব্যাপার।

আর ব্যাপারটা শুনে জ্বলে ওঠে অপরাজিতা,—ওই শয়তা। বল্লে—আর তুমি দিয়ে দিলে! তুমি না বলতে পারতে, আমি নন্দনকে ছাড়বো না।

সুজাতা বলে—কথা দিয়েছিস গোলমাল করবি না। ওরে অপু, আমার ভাবনা ওই ছেলেমেয়েটার জন্য। ওদের জন্যই মুখ বুজে থাকতে হবে তোকেও। নাহলে ওরা যদি তাড়িয়ে দেয়—কোথায় যাবো বল!

কথাটা মিথ্যা নয়। অপরাজিতা বলে—ঠিক আছে। চুপ করেই রইলাম। কিন্তু একমাসের মধ্যে যদি হার গড়িয়ে না দেয় তখন কিন্তু মুখ খুলবই

বড়দি।

এখনতো চুপ চাপ থাক। অপরাজিতা ভাবছে নন্দনের কথা। মনে হয় ওই হার সে নিয়েছে মা কালীকে দেবার জন্য নয়। ওই হার নিশ্চয়ই দিয়েছে সেই রীমা বাঈকেই। সেই বৌবাজার অঞ্চলের বাঈজীর ওকে শাসানোর দৃশ্যটা ভোলেনি অপরাজিতা। এর জবাবও তাকে দিতেই হবে।

নন্দন কিছুদিন ধরে অসুবিধাতেই রয়েছে। তাই চন্দনের সঙ্গে দেখা করে নি। কারণ টাকা দিতে হবে চন্দনকে। চন্দনও ক'দিন ধরে টাকা পয়সা পায় নি। তাই সকালেই নন্দন বের হবার আগে তার ঘরে এসেছে।

জগুমাসী বলে,—আয় বাবা চন্দন। বোস।

চন্দন বসতে আসেনি। তবু বসতে হয়। সে আসলে এসেছে টাকার জন্যই। নন্দন সেটা বুঝেছে।

জগুমাসী ততক্ষণে সুরু করে—তোর বউ-এর কথা বলছি, কোথা থেকে হাভাতের ঘরের মেয়েটাকে আনলি চন্দন। উনি নীচের ঘরে ওই বড়বৌ-এর কাছে থাকে। স্বামীর সেবাযত্ন করবে—তা নয়।

চন্দন এদিকে কান দেয় না। সে জানে জগুমাসীর টেপ রেকর্ডার চালু হলে থামে না।

তাই বলে সে—ওসব কথা থাক মাসীমা!

জগু বলে—থাকবে কেন? ঘরে তো আর একটা বৌ রয়েছে। মালাকে দেখে শিখুক। কি করে স্বামী শাশুড়ীর সেবা করতে হয়।

এদিকে নন্দন ততক্ষণে তৈরী হয়েছে। বের হচ্ছে। চন্দন বলে—একটা কথা ছিল নন্দনদা। নন্দন জানে কি কথা বলবে চন্দন। তাই এড়াবার জন্য বলে নন্দন।

—খুব জরুরী একটা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে রে। দেরী হয়ে গেছে। ওবেলায় কথা হবে। চলি—

নন্দন বের হয়ে যায়।

তখনও জগুমাসী চন্দনকে পতিব্রতা স্ত্রীর পবিত্র কর্তব্য সম্বন্ধে লেকচার দিয়ে চলেছে। অবশ্য চন্দনের সে সব শোনার মত মানসিক অবস্থা নেই।

সে বের হয়ে যায় হতাশ হয়েই। বেশ বুঝেছে নন্দনদা তাকে এড়িয়ে গেল। তার মনেও নতুন একটা ভাবনার সূত্রপাত হয়।

বের হয়ে আসছে চন্দন, দেখে অপরাজিতা নীচের ঘরে অণি আর রীণাকে

পড়াচ্ছে। জানলা দিয়ে দেখা যায় অপুর ফর্সা গাল—ওর স্নেহময়ী চেহারার কিছুটা। থমকে দাঁড়ায় চন্দন।

পরক্ষণেই সরে যায়। ওই মেয়েটিকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারে না। তবু সমীহ করে। আগেকার সেই জ্বালাটা তত নেই—কিন্তু স্বীকার করার প্রশ্নও ওঠে না।

সেদিন সকালে বাগানে বল খেলছে অণি আর রীণা। সকালের আলো তখন সবে ফুটছে, অপরাজিতা অমরবাবুকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে বাগানে ঘুরছে।

অমরবাবু এখন অনেকটা সুস্থ। কিন্তু হাঁটতে তখনও পারেন না।

যদু ওদিকে বাগানে ফুল তুলছে। এর মধ্যে অমরবাবুই বাগানের মালিকে দিয়ে কিছু ফুলগাছও লাগিয়েছেন।

ওদিকে ফুটবল খেলছে অণি, রীণা। বলটা এসে পড়েছে এদিকে অমরবাবুদের সামনে, লাল রঙীন বল।

অণি হাক পাড়ে—দাদু, দাদুভাই বলটা দাও না।

রীণা বলে—দাও না বলটা—অ দাদু!—দাদু!

বলটা সামনে পড়ে আছে।

ওরা ডাকাডাকি করছে, অমরবাবু শুনছে ওদের ডাক—দেখছে ওই বলটাকে।

—দাও না—দাদুভাই। বলটা—

—বলটা।

অমরবাবুর সারা মনে দেহে যেন ঝড় ওঠে। সামনে ঘাসের উপর পড়ে আছে লাল বলটা—ওদের কাতর অনুরোধ কানে আসে।

দিতেই হবে বলটা—

সারা দেহের শিরায় শিরায় একটা আলোড়ন ওঠে, কাঁপছে ওর সারা শরীর।

তবু অমরবাবু ওঠার চেষ্টা করে।

পারে না—না, পারতেই হবে তাকে। আবার সর্বশক্তি একত্রিত করে ওঠার চেষ্টা করে সে। সব শিরা উপশিরায় টান ধরে—যেন ছিটকে পড়বে বুদ্ধ।

কিন্তু না। দাঁড়াতেই হবে তাকে।

হুইল চেয়ার থেকে দেহটাকে তুলেছে সে—হ্যাঁ দাঁড়াতে পেরেছে। হাত-পা যেন সবল হয়ে ওঠে তার।

···হ্যাঁ—এক পা—দু'পা—ঠিক হাঁটছে। সামনের বলটাকেও তুলে নিতে যায়—হাতগুলোও এবার সাড়া দিচ্ছে তার ইচ্ছায়, পা দুটোও চলছে, হ্যাঁ—হাঁটতে পারছে অমরবাবু।

সামনে পড়ে থাকা বলটা তুলে নিয়ে দুহাত দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে নিজেই খুশীতে ফেটে পড়ে।

—বৌমা! দ্যাখো—দ্যাখো আমি হাঁটতে পারছি, আমি হাঁটছি।

অপরাজিতা দেখছে ওর খুশীতে উচ্ছ্বসিত মুখ, চোখ। সে ধরেছে অমরবাবুকে। বলে অপু,—হ্যাঁ—হ্যাঁ। হাটবেন, নিশ্চয়ই হাটবেন এবার।

অমরবাবু বলে,

—তোমার জন্যই আবার বাঁচার, পথ চলার শক্তি পেয়েছি মা—তুমি, তুমিই এই পঙ্গু বুড়োটাকে বাঁচিয়ে তুললে মা—

চন্দনও দোতলার ব্যালকণিতে বের হয়ে এসেছে বাবার গলা শুনে, চন্দনও দেখছে অসুস্থ পঙ্গু মানুষটা আবার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। চলছে—খুশীতে তাই ফেটে পড়েছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে ওই অপরাজিতার জন্যই। এতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে সে ওকে সুস্থ করে তোলার জন্য।

অণি রীণাও ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে দাদুকে। আজ অমরবাবু যেন নতুন করে বাঁচার আশ্বাস পান।

খবরটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

জগুমাসী সকালে আহ্নিকে বসে, আজও বসেছিল।

কিন্তু বাগানে ওদের চীৎকার কলরব শুনে চমকে ওঠে। কেজানে বুড়ো বোধ হয় বাগানেই হার্টফেল করেছে।

—জয় রাধে! খুশীতে লাফ দিয়ে উঠেছে পুজো আহ্নিক ছেড়ে, আর ছুটে আসে ব্যালকণিতে মহামায়াকে খবরটা দিতে।

—বুড়ো বোধহয় শেষ হয়ে গেছে মহামায়া। আপদ সরেছে। জয় রাধে।

মহামায়া ঠিক ঠাওর করতে পারে না। নন্দন তখনও ঘুমুচ্ছে। মালার ডাকে উঠে বসে। মালাই নন্দনকে সুখবরটা দেয়।

—বুড়ো বাগানে নাকি হার্টফেল করেছে।

—তাই নাকি!

নন্দন ও খুশীতে ডগমগ হয়ে ছুটে আসে বারান্দায়। এর মধ্যে জগুমাসী

মহামায়াও এসেছে। নন্দন এসে দেখে কোথায় কি। বুড়ো মরবে কি—আবার চাঙ্গা হয়ে বাগানে হাটা চলা করছে, খুশীতে ঝলমল অবস্থায়।

জগুমাসী চোখ কপালে তুলে বলে।

—ইকি হল রে নন্দন।

নন্দন বলে—তাই তো দেখছি।

জগু বলে--আরও কত দেখবি এবার কে জানে। ওই মেয়ে যাদু জানে। বুড়ো ঠেলে উঠল, এবার কি ঝামেলা বাধায় দ্যাখ।

ওই মেয়েটাই এ সবের মূলে। ওরা এবার রীতিমত ভাবনায় পড়েছে।

তাই নন্দন চায় চন্দনকে হাতে রাখতে। সেদিন চন্দনকে পাত্তা দেয় নি। আজ নন্দন এসেছে চন্দনের ঘরে।

বেশ কিছু টাকা দিয়ে বলে, সেদিন কথা বলার সময় ছিল না। টাকার দরকার তাও বলিস নি। নে রাখ টাকাটা।

চন্দন টাকাটা নেয়। কিন্তু আগেকার মত উচ্ছাস আর দেখায় না সেটা দেখছে নন্দনও। তাই সেও কিছুটা চিন্তায় পড়েছে। বেশ বুঝেছে যা করার তাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। কারখানা—অফিস এর লুণ্ঠন পর্ব তাড়াতাড়ি শেষ করতে না পারলে ঠকতে হবে তাকে।

চন্দনও কেমন নীরব হয়ে গেছে। ওদিকে অমরবাবুও সুস্থ হয়ে উঠছে। শুধুমাত্র ডাঃ সেন এখনও তাকে ব্যবসাপত্রের টেনশন, ভাবনা চিন্তা মাথায় নিতে নিষেধ করেছেন তাই নন্দন টিকে আছে।

বুড়ো সেরে উঠলে বিপদ, আর এই বিপদ সৃষ্টি করেছে ওই অপরাজিতা।

অপরাজিতা এত ভেবেচিন্তে কাজ করে না। এটা সে করেছিল অসহায় বৃদ্ধকে দেখে। আজ সেও খুশী হয়েছে।

একতলার ঘরে কাজ করছে, জানালা দিয়ে দেখা যায় বাগানে অণি, রীণা খেলছে।

অণি, রীণা এ বাড়িতে পড়ে থাকে এদিকেই। দোতলায় যাবার হুকুম নেই ওদের। ওদের খাবার নীচেই খেতে হয়।

তবু চঞ্চল ছেলেমেয়ে দুটো কখনও উপরে চলে যায়। দেখে প্রাচুর্যভরা অন্য আর এক জগৎকে। নানা খাবার চকোলেট; সন্দেশ, ফলমূলও থাকে মিনির জন্য।

জগু দিদা ওদের দেখে বলে।—এখানে কেন এসেছিস! যা—

অণি বলে মহামায়াকে—দুটো সন্দেশ দেবে দিদা!

জগু বলে—ঠিক গন্ধ পেয়ে এসেছে। যা তো!

অণি বলে—তুমি একাই সব খাবে?

—ওমা কি সাহস ছোঁড়ার! ডাকাত নাকি রে!

রীণাই বলে—চলে আয় দাদা। মা জানতে পারলে বকবে।

ওরা ব্যর্থ হয়েই ফিরে আসে। ওই প্রাচুর্যে তাদের কোন অধিকারই নেই। শিশু মনে এই বঞ্চনাটা গভীর ভাবেই বাজে। তাই আড়ালে চোখের জল ফেলে।

রীণা বলে—আমাদের বাবা তো নেই মিনির মত। তাই ওসব কে দেবে বল!

অণি বলে—আমি বড় হয়ে অনেক পয়সা রোজগার করবো—তোকেও সন্দেশ চকোলেট সব দেব।

ওই সান্ত্বনা নিয়েই থাকে তারা।

সেদিন বাগানে ওরা খেলছে। দেখে মিনি সেজেগুজে বের হয়ে আসে।

মিনি ওদের দেখে। রীণাই শুধোয়—কোথায় চল্লিরে মিনি?

মিনি বলে—সিনেমায়। সিংহ, হাতি নিয়ে ছবি এসেছে, তাই দেখতে যাচ্ছি।

সিনেমায় যাবার খুব ইচ্ছা অণির। বলে সে—আমাদের নিয়ে যাবি? গাড়িতে চড়াবি—এমন সময় এসে পড়ে নন্দন, মালা। ওদিকে গাড়ির কাছে দেখছে রীণা, অণিকে। এগিয়ে এসে নন্দন ধমকে ওঠে ওদের—এ্যাই। এখানে কি করছিস!

অণি বলে—আমাদের সিনেমায় নিয়ে যাবে? চলনা। গাড়িতে চড়ে সিনেমা দেখতে খুব ইচ্ছা হয়।

নন্দন ধমকে ওঠে—সিনেমা দেখবে গাড়িতে চড়বে, চলতো—ভিখারীর বাচ্চাদের সখ কত। মিনি গাড়িতে ওঠো। ওরা গাড়িতে ওঠে। সশব্দে ওদের দুজনের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে চলে যায়।

কাঁদছে অণি রাগে অপমানে। রীণারও ঠোঁট ফুলে ওঠে। অপরাজিতা দেখছে ব্যাপারটা, এগিয়ে আসে সে।

—একি। অণি সোনা কাঁদে কেন?

অণির চাপা অশ্রু এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বলে সে—মিনিরা সিনেমায়

গেল কাকীমা, আমাদের নিয়ে যেতে বল্লাম—নন্দন কাকু যা তা বলে গেল। আমরা নাকি ভিখারীর বাচ্চা—

অপরাজিতার দুচোখ জ্বলে ওঠে। ওই নন্দনকে তার জবাব দেওয়া হয় নি আজও। এবার তাকেই জবাব দেবে সে।

আপাততঃ সেই প্রসঙ্গ চেপে বলে অপরাজিতা,—এর জন্য কান্না। আমি তোমাদের সিনেমার চেয়ে অনেক ভালো হাতি, বাঘ, সিংহের গল্প শোনাবো। গান শোনাবো আজ।

—সত্যি!

হ্যাঁ গো!

আজ অপরাজিতা ওই দুটি বঞ্চিত শিশুর সামনে তার গল্পে গানে কল্পনার এক নতুন জগতের স্বপ্ন রঙ্গীন ছবি আঁকে।

ওই দুটি শিশুও তাদের সব দুঃখবঞ্চনা ভুলে কাকীমার স্নেহডোরে বাঁধা পড়েছে।

ওদের ঘিরেই গড়ে ওঠে অপরাজিতার পৃথিবী।

সুজাতাও দেখছে। দেখছে অপরাজিতার কাছেই ওদের নানা আবদার, বায়না। সুজাতা বলে,—ওরা তোকে বড় জ্বালায় নারে অপু?

অপরাজিতা বলে—না-না। আমার খুব ভালো লাগে ওদের আবদার।

সুজাতা বলে—তুই এসেছিলি তাই এ বাড়ির সব কষ্ট ভুলে বেঁচে আছি রে। নাহলে কি যে হতো ভগবান জানেন। মনে হয় ভগবানই এই হত-ভাগিনীর কাছে তোকে পাঠিয়েছে। আর তাদের জন্য নিজের ভবিষ্যৎ ভুলে তুইও মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়েছিস।

অপরাজিতা বলে—ভবিষ্যৎ এর কথা কি বলছিলে?

সুজাতা দেখছে ওকে। বলে সে—নিজের ঘর সংসারে এলি, স্বামীকেও কাছে পেলি না—হাসে অপরাজিতা।

—ওসব ভাবনা ভাবিনা দিদি, বেশতো আছি। স্বামী সংসার ওসব?

হাসল অপরাজিতা। রহস্যময়ী হাসি, সুজাতা ওসবের অর্থ বোঝে না। তার দুঃখই হয়।

মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর সুবিনয়বাবুর মনে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। সাধারণতঃ মেয়েদের যে ভাবে বিয়ে হয় ঘটা-পটা করে, মধ্যবিত্ত বাবা দেনাদার হয়েও উৎসবের ত্রুটি করে না মেয়ের বিয়েতে। আত্মীয়-স্বজন,

সমাজের আপনজন, বন্ধু বান্ধবদের ডেকে এনে বিয়ে হয়। পাঁচজনে ভুরি ভোজন করে। চোখের জলে মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠায়।

সুবিনয়বাবু তার মেয়ের বিয়ে সে ভাবে দিতে পারে নি। নেহাৎ একটা দুঃস্বপ্নের রাতে নাটকীয়ভাবে বিয়েটা হয়েছিল অপরাজিতার।

তারপর শ্বশুর বাড়িতে গেছে।

বড়লোকের বাড়ি। তাদের রীতি রেওয়াজ আলাদা। তাছাড়া সুবিনয় বাবু ভোলেনি, সেই বর্ষার রাতে সে গিয়েছিল অমরবাবুর বাড়ি, তার মেয়েকে যদি বিয়ে করে তার ছেলে।

কিন্তু অমরবাবুর স্ত্রী তার বোন আর নন্দন তাকে নিদারুণ অপমান করে তাড়িয়েছিল। সেই কথাটা আজও ভোলেনি সুবিনয়বাবু।

তাই বিয়ের পর আর অপরাজিতার খোঁজ নিতেও যাওয়া হয়নি। দু', একবার ফোনে কথাবার্তা হয়েছে মাত্র। আর অপরাজিতা যে ভালো আছে এ বাড়িতে সেই কথাটাই জানিয়েছে বারবার।

আর তাই শুনেই খুশী হয়েছে সুবিনয়বাবু।

তবু সমাজে মুখ রক্ষা হয়েছে এই তার পরম ভাগ্য। তাই মেনে নিয়েই সুবিনয়বাবু আবার তার স্কুল, পড়াশোনার মধ্যেই ডুবে যায়।

কিন্তু মায়ের মনের ব্যাকুলতা অনেক বেশী। তাই মৃণ্ময়ীদেবী স্বামীকে বলে—বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গেল মেয়েটা—সেখানে কেমন রইল একবার দেখে আসবে না?

সুবিনয়বাবু বলে—ফোনে তো কথা হলো! ভালোই আছে।

মৃণ্ময়ী বলে—ব্যস তাতেই হয়ে গেল।

তুমি ও বাড়িতে কেন যেতে চাও না তা জানি।

অপমান তখন হয়তো করেছিল তারা, এখন তো একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাহলে কেন যাবে না।

সুবিনয়বাবু কি ভাবছে।

মৃণ্ময়ী বলে—মেয়ের বিয়ে দিয়েছ, মেয়ের বাবার জ্বালা অনেক। তাকে মান সম্মানের কথা ভাবলে চলবে না। একবার গিয়ে দেখে এসো মা কেমন আছে। জামাই ওর বাবা মায়ের সঙ্গেও দেখা হবে। তারাও হয়তো ভাবছে—এ কেমন বাবা মা। মেয়েকে পরের ঘরে বিদেয় করে একবার খবরও নিলনা।

কথাটা মিথ্যা নয়।

স্ত্রীর চাপেই সুবিনয়বাবু রাজী হয় অপরাজিতার এখানে আসার জন্য।

অপরাজিতা ভাবতে পারেনি যে তার বাবা সত্যিই আসবে এ বাড়িতে তার খবর নিতে।

তাই সকালেই বাবাকে আসতে দেখে অবাক হয় অপু। জানে এবাড়ির মানুষদের প্রকৃতি। শ্বাশুড়িকেও জানাতে পারে না তার বাবার আসার খবর।

বাবাকে নীচের ঘরেই বসায় অপরাজিতা।

- হঠাৎ সুবিনয়বাবু দেখছে অপরাজিতাকে। পোষাক আশাক ভালোই— এ বাড়ির ঐশ্বর্যও চোখে পড়ে তার আসবাব পত্র, বাড়িটার অবয়বে। বাগানে ফুলের সমারোহ গৃহস্বামীর ঐশ্বর্য আর শান্তির আভাসই দেয়।

সুবিনয়বাবু বলে—বিয়ের পর আর দেখিনি। মন কেমন করছিল, তোর মাও বল্লেন, তাই চলে এলাম।

এর মধ্যে সুজাতাই চা, খাবার পাঠিয়েছে।

সুবিনয়বাবু শুধোয়।

—কেমন আছিস মা?

অপরাজিতা বলে—খুব ভালো আছি বাবা।

এ বাড়িতে আমার কোন অসুবিধাই হয় নি।

সুবিনয়বাবু শুধোন—তোর শ্বশুর, শাশুড়ী, মাসী শাশুড়ি ওরা—

অপরাজিতা তার পথ ঠিক করে নিয়েছে। তার নিজের সমস্যা তাকেই সমাধান করতে হবে। এ নিয়ে বাবাকে সে কিছুই জানতে দেবে না। তার পরম দুর্ভাগ্যের কথা বেমালুম চেপে রেখে বলে অপরাজিতা খুশী ভরা স্বরে—ওরা আমাকে খুব ভালোবাসেন। শাশুড়ীর মত মানুষ হয় না। মাসী ও তাকে নিজের মেয়ের মতই দেখেন। আমার এখানে কোন অসুবিধাই হয়নি। সবার ভালোবাসা স্নেহ নিয়ে বেশ আছি বাবা।

সুবিনয়বাবু নিশ্চিন্ত হয়। বলে—বড় ভালো লাগলো মা। তা শাশুড়ী মানে বেয়ান ঠাকরুণ— বেয়াই মশায়ের সঙ্গে দেখা হবে না?

চন্দন নেমে এসেছিল, বাইরের ঘরে অপুকে ওর বাবার সঙ্গে কথা বলতে দেখে সে বাইরেই দাঁড়ায়, শুনছে চন্দন অপরাজিতার কথাগুলো।

অবাক হয় সে।

অপরাজিতা এ বাড়িতে কিভাবে আছে তা চন্দনই জানে। বৌ হয়ে এসেছে কিন্তু বৌ-এর কোন অধিকারই তাকে দেয়নি চন্দন। সেদিক থেকে নিষ্ঠুর বঞ্চনার শিকার হয়েছে মেয়েটা।

আর শাশুড়ী, মাসীমার ব্যবহার কি তাও জানে চন্দন। অপরাজিতাকে তারা সহ্য করতে পারে না। অপমান লাঞ্ছনা করে পদে পদে।

তবু ওই মেয়েটা তার পঙ্গু বাবাকে সুস্থ করেছে।

আজ নিজের বাবার কাছে এ বাড়ির স্বার্থপর লোভী মানুষগুলোর নোংরা স্বভাবের কথা বিন্দুমাত্র প্রকাশ করেনা। বরং তাদের স্নেহময় কর্তব্যপরায়ণ বলেই বর্ণনা করে চলেছে।

চন্দন চলে যায় নিজের ঘরে। অপরাজিতার এই সুন্দর স্বরূপটা আজ চন্দনের মনেও কি অপরাধবোধই আনে। বিবেকের কশাঘাতে সেও যেন জর্জরিত। এত নিঃস্বার্থ ভালো মেয়েটাকে সেও ভুল বুঝে কি নিদারুণ ভাবে অপমান করে চলেছে তাকে।

অপরাজিতা এই ব্যাপারটা টেরও পায় না। বাবার সঙ্গে কথার জাল বুনে চলেছে সে। মিথ্যা কথার রঙীন জাল।

সুবিনয়বাবুর শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করার কথায় একটু বিব্রতবোধ করে অপরাজিতা, সে বলে—শ্বশুর মশাই তো পঙ্গু এখনও ওঠেননি। আর শাশুড়ী মানে স্নান করে পুজোর ঘরে ঢুকেছেন। বেরুতে ঝাড়া দুটি ঘণ্টা। খুব পুজো পাঠ করেন কিনা। ওই নিয়েই সারাদিন রয়েছেন।

সুবিনয়বাবু বলেন—তা ভালো। ধর্মেমতি থাকা ভালোই, আজ তাড়া রয়েছে যেতে হবে। অন্য একদিন সময় নিয়ে এসে ওদের সঙ্গে দেখা করবো।

তা জামাই বাবাজীকে দেখছি না? তার সঙ্গে দেখা করে যাই, নাহলে কি ভাববে।

অপরাজিতা এবার সত্যি সত্যি বিপদে পড়ে। এবার বাবাকে এড়াবার মত কোন অজুহাত বের করতে পারে না।

তাই বলে—বোসো, দেখি সে আছি কিনা! বলছিল সকালেই বের হবে।

অপরাজিতা চন্দনের সন্ধানে বের হয় বাবাকে বসিয়ে রেখে।

চন্দনের ঘরেও বড় একটা আসে না অপরাজিতা, সেই চা নিয়ে ঘটনাটা ঘটার পর থেকে। দুজনে দুদিকে থাকে। তাদের ঘরও আলাদা।

এনিয়ে এ বাড়িতে আলোচনা যৎসামান্য হয়েছে মাত্র, এ বাড়ির ওই মহামায়া এণ্ড কোম্পানী কোন কথাই তোলেনি। বরং তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটায় এমনি স্থায়ী ফাটলই ধরে থাকুক এইটাই তারাও চায়।

তাই অপরাজিতা-চন্দনের মনের ফারাকটাও রয়ে গেছে। দু'একবার কদাচিৎ দেখা হয় মাত্র, অপরাজিতা যেন চন্দনকে চেনে না।

চন্দনও নীরবে চেয়ে দেখে মাত্র।

সকালে চন্দন চা খাচ্ছে নিজের ঘরে এমন সময় অপরাজিতাকে ঢুকতে দেখে চাইল,

—তুমি! এখানে?

চন্দনের প্রশ্নে অপরাজিতা জানায়—আসতে হ'ল এখানে!

—হঠাৎ! আমার কাছে?

এবার অপরাজিতা জানায়,

—বাবা এসেছেন এ বাড়িতে। এখানে ভালোই আছি তাই বলেছি।

চন্দন শুনেছে ওসব কথা, এ নিয়ে সেও আজ ভাবছে, তাই অপরাজিতার কথায় বলে,

—এসব বলতে গেলে কেন?

অপরাজিতা বলে,

—নিজের সমস্যা, দুঃখ কষ্টের কথা ওঁকে জানিয়ে তো কোন লাভ হবে না। উনি দুঃখ পাবেন, তাই বলিনি।

চন্দন শুধায়—কিন্তু আমি কি করতে পারি?

অপরাজিতা বলে—এ নিয়ে কাউকেই কিছু করতে হবে না।

—তবে!

অপরাজিতা বলে,

—বাবা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। বল্লেন এ বাড়িতে এসে অন্ততঃ তোমার সঙ্গে দেখা না করে গেলে খারাপ দেখাবে, তাই যদি একবার যেতে ওর সামনে।

চন্দন দেখছে অপরাজিতাকে।

অপরাজিতা বলে,—নিছক ভদ্রতার খাতিরেই, বাবা খুশী হতেন।

চন্দন বলে—ঠিক আছে। তুমি যাও—আমি আসছি।

সুবিনয়বাবু নীচের ঘরে আছে—অপরাজিতা বলে—তোমার জামাই আসছে।

সুবিনয় বলে—যাক, বাড়িতে রয়েছে। তাহলে ওকেই বলি মা, বিয়ের পর ও বাড়িতে তো একবারও যায় নি চন্দন। তোকে নিয়ে না হয় দু'এক-দিনের জন্য ও বাড়িতে চলুক।

ঘরে ঢোকার মুখে চন্দন কথাগুলো শুনেছে।

তার এসব ভালো লাগে না। অপরাজিতার এই বাড়ির সম্বন্ধে এত প্রশংসার কথাও তার ভালো লাগেনি। অপু কেন এসব অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করে পড়ে আছে তা জানে না।

বরং এ বাড়িতে ঝড়ই উঠেছে ওর জন্য। এ নিয়ে হয়তো আরও গোলমাল হতে পারে। তাই মনে হয় অপরাজিতার চলে যাওয়াই ভালো।

চন্দন সুবিনয়বাবুর কথায় বলে,

—আমার ওখানে যাওয়া হবে না। আপনি বরং অপরাজিতাকেই নিয়ে যান।

সুবিনয় দেখছে চন্দনকে। বলে সুবিনয়বাবু,

—জোড়ে যেতে হয়। এইটাই শুভ লক্ষণ—

চন্দন বলে ওঠে—শুভ লক্ষণ, ওসব প্রশ্ন এখানে ওঠে না।

অপরাজিতা চাইল চন্দনের দিকে। ওর কথায় যেন অন্য সুর ফুটে ওঠে।

অপরাজিতা বলে—

—এখন ওর সময় নেই বাবা। আমরা নাহয় পরেই যাবো ও বাড়িতে। শ্বশুরমশাই-এর শরীর ভালো নয়—আমার যাওয়া হবে না।

চন্দন আজ কঠিন সত্যটাই প্রকাশ করতে চায়। বলে সে সুবিনয়বাবুকে—না। আপনি ওকে আজই নিয়ে যান এ বাড়ি থেকে। যত তাড়াতাড়ি যায় ততই ওর পক্ষে ভালো।

সুবিনয়বাবু ওর কথায় অবাক হয়। কি যেন অন্যসুর ফুটে ওঠে। বলেও সুবিনয়।

চন্দন শোনায়—ঠিকই বলছি। ও যা বলেছে এ বাড়ির সমন্ধে সব মিথ্যা কথা। এ বাড়িতে অপরাজিতা মোটেই ভালো নেই। ভালো থাকতে পারে না—এ বাড়ির মানুষরা ওকে কেউ কিছুমাত্র দেয় নি।

ওইই দিয়ে চলেছে সব কিছু, বিনিময়ে কিছুই পায় নি। পেয়েছে শুধু অবিশ্বাস—বঞ্চনা আর ঘৃণা। এ বাড়িতে থাকলে হয়তো এমনি সব দিয়ে নিজেই একদিন ফুরিয়ে যাবে।

তাই বলছি—ওকে নিয়ে যান এ বাড়ি থেকে। যত শীঘ্র পারেন।

কথাগুলো সুবিনয়বাবুর মুখে যেন তাজা বোমার মত ছুঁড়ে দিয়ে বিস্ফোরণের প্রতীক্ষা না করে সে চলে গেল।

সারা ঘরে কি স্তব্ধতা নামে, অপরাজিতা ভাবতেই পারেনি যে এইভাবে

কঠিন সত্য কথা, তার জীবনে পরম বঞ্চনা, পরাজয়কে ঘোষণা করে যাবে চন্দন বাবার কাছে।

সুবিনয়বাবু মেয়ের খুশীতে খুশীই হয়েছিল। এই সে চেয়েছিল। তাই মেয়ের সুখের খবর তার মনেও এনেছিল আনন্দের সাড়া।

কিন্তু সেটা একেবারে অর্থহীন, মিথ্যা এটা ভাবতেও তার দুঃখ হয়। সুবিনয়বাবু দেখছেন অপরাজিতাকে।

বলেন, আমাকে ওসব মিথ্যা কথা কেন বললি মা। চন্দন বলে গেল এখানে তুই মোটেই ভালো নেই! এত দুঃখ সহ্য করে—অপমানকে মেনে নিয়ে এখানে থাকতে হবে না মা!

অপরাজিতা বলে—বাবা!

—না মা। কোন কুণ্ঠা করিস না। তুই ও বাড়িতে চল মা। যেভাবে হোক আমাদের দিন চলে যাবে। তোকে এত বড় বঞ্চনা—অপমানের মধ্যে ফেলে রেখে আমি যাবো না।

অপরাজিতার মনে সেই কঠিন অপরাজেয় সত্তাটাই জেগে উঠছে। তার এ বাড়িতে অনেক কাজই বাকী। এ বাড়ির সব পাপকে মুছে দেবে, এদের অহমিকা স্বার্থপরতার জবাব সে দেবেই। তাই তাকে এখানেই পড়ে থাকতে হবে।

বাবার কথায় তাই বলে অপরাজিতা,

—না বাবা। এ বাড়ি ছেড়ে এখন আমার যাওয়া হবে না।

—তবু পড়ে থাকবি দুঃখ অপমান সয়ে?

বাবার কথায় বলে অপরাজিতা,

—আমার কোন কষ্টই এখানে নেই—আমি ভালো আছি। খুব ভালো আছি বাবা। খুব ভালো আছি।

সোচ্চার করে তার সেই ভালো থাকার কথাটাই জানাতে চায় আজ অপরাজিতা।

তবু কি দুঃসহ বেদনায় তার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নামে। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করেও পারে না অপরাজিতা।

অসহায় সুবিনয়বাবু দেখেন মাত্র নীরব দর্শকের মত।

অমরবাবু একটু সুস্থ হয়েই যদুকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে একাউনটেন্টকে ডেকে এনেছে।

বয়স্ক কর্মচারী। অনেক দিন থেকেই অমরবাবুর ফার্মে কাজ করছে শশীবাবু। অমরবাবু বলে,

—এই এক বছরের হিসাবপত্র, কারখানার হিসাব, আয়-ব্যয়ের সব কাগজ পত্র আমাকে দিয়ে যাবে।

শশীবাবু বলে—নন্দবাবুই তো সব দেখছেন—

অমরবাবু শোনায়—ও যা করছে করুক। কাগজপত্র আমাকে দিয়ে যাবে, কথাটা যেন নন্দনবাবু জানতেও না পারে।

শশীবাবু বলে—তাই দেব।

সেই মত কাগজপত্র, খাতাও এসেছে।

আর অমরবাবু এবার অপরাজিতাকে বলে,

—রোজ দুপুরে আমার ঘরে এসে বসতে হবে মা। কিছু কাজ করতে হবে।

অপরাজিতাই এখন অমরবাবুর কাছে এ বাড়ির মধ্যে বিশ্বস্তজন। তাকে ভরসা করতে পারে অমরবাবু।

অপরাজিতা বলে—কাজ!

—হ্যাঁ। একটু গোপনীয়ই।

অপরাজিতা অবাক হয়।

অমরবাবু বলে—কাজে বসলেই জানতে পারবে।

দুপুরে এ বাড়িতে স্তব্ধতা নামে।

মহামায়া—মালার খাওয়ার পর দিবানিদ্রা দেবার অভ্যাস বহুদিনের। নন্দনও বাইরে।

চন্দন ওদিকে দুপুরে ঘুমোয়—কারণ সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বের হয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে বারে মদ্যপান মৌজ মস্তি করে ফেরে মধ্যরাত্রে, তখন হুঁসও থাকে না। তাই দুপুরে সেও ঘুমোয়।

সুজাতাও হেঁসেল সামলে দুপুরে ঘরে একটু গড়িয়ে নেয়। অণি—রীণা তখন স্কুলে। ফলে দুপুরে এ বাড়িতে ঘুম নামে।

কিন্তু ঘুমোয় না অমরবাবু আর অপরাজিতা।

অপরাজিতা ওই সব হিসাবের খাতা থেকে জমা-খরচ আয়-ব্যায়ের হিসাব গুলো তুলছে। হিসাব মেলাবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু হিসাব আর মেলে না। বহু টাকার গোলমাল দেখা যায়—বিল, ভাউচারও অনেক জাল, সবমিলিয়ে বোঝা যায় বছর খানেক ধরে অফিস,

কারখানায় লাখ লাখ টাকা নয় ছয় হয়েছে।

অপরাজিতা কাগজগুলো দেখায় অমরবাবুকে। ওই হিসাবের গরমিলও দেখে অমরবাবু। অনেক টাকা নিয়েছে নন্দন—কোন ভাউচার না দিয়ে। আর ভাউচার যদি বা থাকে সেটা জালই।

শশীবাবু বলে—কথাটা বলতেই চেয়েছিলাম বড়বাবু !

—তাহলে বলনি কেন ?

শশীবাবু জানায় কাতর স্বরে,

—চাকরী যাবার ভয়ে। নন্দনবাবু নিজের মর্জিমত কাজ করেছে। যখন তখন টাকা নিয়েছে। আগেকার একাউনটেন্ট এ নিয়ে কথা বলতে তাকেই চোর সাজিয়ে চাকরী থেকে তাড়ালেন। আমি বলতে গেলে আমাকেও তাড়াতেন নন্দনবাবু, হয়তো জেলেই দিতেন ! তাই ভয়ে বলতে পারি নি। ছাপোষা মানুষ, চাকরী গেলে সগুষ্ঠী উপোস দিতে হবে। নন্দনবাবু সাংঘাতিক লোক স্যার।

অপরাজিতা বলে—তাই বলে তিনি লাখ লাখ টাকা চুরি করবেন, কোন প্রতিকার হবে না ?

দুপুরে জগুমাসীই জেগে থাকে এ বাড়িতে। তার ঘরে শোয় মাত্র, বাড়ি সুনসান হলে জগুমাসী বের হয়। কিন্তু চাকরদের উপরও নজর রাখে। কে কি করছে তাও তার জানা দরকার।

জগুমাসীই কিছুদিন ধরে দেখছে দুপুরে ওই বুড়ো কর্মচারী শশীবাবু আসে কত্তার ঘরে, অপরাজিতাও যায়। ওরা খাতাপত্রের হিসাব নিকাশ দেখে।

ব্যাপারটা জগুর কেমন কেমন ঠেকে ছিল। ওরা গোপনে কিছু চক্রান্ত করছে নিশ্চয়। অফিসের কাজের ব্যাপারেও খোঁজ খবর নিচ্ছে। মনে হয় নন্দনের উপর নজরদারি চলছে। তাই জগুমাসীও তক্কে তক্কে ছিল। আজ সেও সন্তর্পণে এসে অমরবাবুর ঘরের বাইরে দাঁড়ায়।

বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে চোখ মেলে দেখে, হিসাবের খাতায় লাখ লাখ টাকার গরমিল করেছে নন্দন, অপরাজিতা এই কথাটাই জানাচ্ছে।

চমকে ওঠে জগুমাসী।

যা ভয় করেছিল তাই ঘটতে চলেছে, অমরবাবুকে পঙ্গু, অথর্ব করে ঘরে বন্দী রেখে তারা এ বাড়িতে রাজত্ব করছে, নন্দনকে পাইয়ে দিয়েছিল ওই কারখানা, ব্যবসা। বেশ চলছিল তাদের ভাগ্যের চাকাটা। শোষণ, লুণ্ঠনপর্ব

চলছিল অবাধে। ভেবেছিল অমরবাবু ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে মারা গেলে চন্দন, সুজাতাদের এ বাড়ি থেকে তাড়াবে। ওদের ব্যবসা, বিষয় আশয়ও পাবে মহামায়া, নন্দনই।

জগুমাসীর রাজত্বও কায়েম থাকবে।

কিন্তু ওই মেয়েটা এসেই এ বাড়ির সব হাল এক এক করে বদলে দিয়েছে। অমরবাবুকে সুস্থ করে তুলে আবার নন্দনের হাত থেকে সর্বস্ব কেড়ে নিতে চায় ওরা। শুধু তাই নয়—নন্দনকে চোর প্রতিপন্ন করে তাড়াতে চায়।

জগুমাসী শুনছে ওদের কথাগুলো।

অমরবাবু বলে—নন্দনকে আজই ডেকে পাঠাচ্ছি। এসব হিসাবের ফাঁক দিয়ে লাখ লাখ টাকা সরানোর কৈফিয়ৎ দিতে না পারলে জেলেই দেব ওকে।

চমকে ওঠে জগু!

জেল মানেই থানা, পুলিশ, ওই পুলিশকে জগুর খুই আতঙ্ক।

অপরাজিতা ঘরের মধ্যে বলে অমরবাবুকে।

—এখনই কিছু বলবেন না নন্দনবাবুকে।

—কেন? শুধোয় অমরবাবু।

অপরাজিতা বলে,

—সব কাগজপত্র, বাকী জাল ভাউচার ওর ফলস্ সইকরা রসিদ এসব কাগজপত্র হাতে নিন, প্রমাণগুলো হাতে না নিয়ে কিছু করতে যাবেন না। কেস টিকবে না।

অমরবাবু বলে—ঠিক বলেছ মা। শশীবাবু, ওইসব কাগজপত্র আমার চাই। গোপনে সব কাগজপত্রগুলো অফিস থেকে সরিয়ে আনুন—নন্দন যেন টের না পায়।

শশীবাবু বলে—তাই হবে।

জগুমাসী সবই শুনেছে, আর এবার যে ওই মেয়েটা একটা নিদারুণ কাণ্ড বাধাবে তাও বুঝেছে।

ওরা নন্দনকে জেলেই পাঠাবে, ওই মেয়েটা তারই পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে চলেছে।

জগুমাসী প্রথমদিন ওই মেয়েটার এ বাড়িতে চড়াও হবার দৃশ্যটা ভোলেনি, তখনই ভেবেছিল ও মেয়ে এ বাড়িতে চুপ চাপ সব মেনে নিয়ে থাকবে না।

একটা কিছু করবেই, আর সেই সর্বনাশই করতে চলেছে।

মহামায়াও এসবের বিন্দু বিসর্গ জানে না। নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে, নন্দনও টের পায় নি যে তার পিছনে এতবড় একটা ষড়যন্ত্র চলেছে।

রাত্রে নন্দন ফিরলে আজ জগুমাসী ওদের সামনে সেই বোমাটাই ফাটায়।

রাত্রি নেমেছে,

এ বাড়ির মানুষগুলো তখনও জেগে আছে যে যার ঘরে।

আর এতবড় খবরটা শুনে নন্দনের ঘুম ছুটে যায়। মহামায়াও চমকে ওঠে,

—বলো কি দিদি ?

যোগেশ্বরী অর্থাৎ জগু বলে,

—তবে আর বলছি কি! কদিন ধরেই দেখছি দুপুরে তোদের অফিসের বুড়ো সেই শশীবাবু আসে খাতাপত্র নিয়ে। আর ওই অপু যায় ও ঘরে, লেখাপড়া হয়, হিসেব কিতেব দেখে, তুই নাকি ওদের লাখ লাখ টাকা চুরি করেছিস!

নন্দন চমকে ওঠে।

ওই এক বছরে নন্দন নানা ভাবে নানা খাতে অফিস, কারখানা থেকে টাকা নিয়েছে, চুরি করেছে তার বেআইনী নেশার জিনিস পাচার করেছে কোম্পানীর লেবেল সেঁটে, তবু বলে নন্দন,

—কে বলে এসব কথা ?

জগুমাসী বলে,

—ওই মেয়েটা। ও নাকি তোর সই করা রসিদ, জাল কাগজপত্র সব হাতিয়ে তারপর তোকে জেলে পাঠাতে চায়। কর্তাবাবু তো এখন ওর কথাতেই ওঠাবসা করে।

নন্দন গর্জে ওঠে

—আমাকে জেলে পাঠাবে ? তার আগে ওকেই শেষ করবো। খতম করে দেবো। আমাকে চেনে না।

রেগে উঠেছে নন্দন,

গোঁয়ার গোবিন্দ সে, এখুনিই একটা কাণ্ড বাধাতে পারে। তাতে সমস্যার সমাধান তো হবেই না, উল্টে বিপদই বাড়বে,

মহামায়া কি বলবে জানে না।

তার ছেলেকে সে চেনে। জগুমাসী বলে,

—মাথা গরম করলে কাজ হবে না নন্দন। যা করবি মাথা ঠাণ্ডা করে করতে হবে, সাপও মরবে লাঠিও ভাঙ্গবে না। কাক পক্ষীতে টেরও পাবেনা অথচ কাজ হাসিল হবে।

নন্দন বলে—কি করে তা হবে বলতে পারো?

মহামাহায়াও বলে,

—একটা পথ ভাব জগু, তোর তো অনেক বুদ্ধি, নাহলে নন্দনকে ওরা মিথ্যে চোর সাজিয়ে জেলে পাঠাবে। ওরে জগু।

জগু মাসী হরিনামের ঝুলিতে দ্রুত আঙ্গুল ঘুরিয়ে কর জপতে জপতে বলে—দেখি ভেবে চিন্তে, জয় রাধে!

অর্থাৎ পথ একটা সে পেয়ে গেছে রাধারানীর দয়ায়। জগু বলে—যা—যা বলবো ঠিক সেইমত করতে হবে। তবে কাজ হয়ে গেলে আমার তীর্থ ভ্রমণে যাবার খুব সাধ, প্রয়াগ বৃন্দাবনে যে যেতে হবে বাবা নন্দন।

নন্দন জগুমাসীর কাছে নানা ভাবে কৃতজ্ঞ।

ওর ভাগ্য ফিরিয়েছে জগুমাসীই। তারপর এই অপরাজিতার সমস্যাটা যদি সহজে সমাধান হয়ে যায় নন্দনকে আর পায় কে!

নন্দন বলে—নিশ্চয়ই, শুধু তীর্থই নয় তোমাকে আর খেটে খেতে হবে না। তোমার নামে ব্যাঙ্কে মোটা টাকাই জমা করে দেব, তার সুদে সারা দেশের তীর্থে ঘুরবে, নিশ্চিন্তে থাকবে।

জগুমাসী বলে—ঠিক তো নন্দন।

মহামায়াও বলে—নন্দনের জন্য এত করছো, ও এটুকু করবে না?

জগুমাসী বলে,—তাহলে কথাটা মন দিয়ে শোন!

নন্দন, মহামায়া—জগুমাসীর কথাগুলো শুনছে। কি করে ওই অপরাজিতাকে সরানো যাবে নিরাপদে তারই মতলব বাতলাচ্ছে জগু মাসী।

এ বাড়িতে অমরবাবু পুজো অর্চনার ব্যবস্থা করেছিল, দোতলার একদিকে একটা বড় হলঘর মত, তার একপাশে কুলদেবতাও প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু কিছুদিন ধরে অর্থাৎ অমরবাবু অসুস্থ হবার পর থেকেই ওই কুলদেবতা বাড়ির আর পাঁচটা আসবাবের মতই সাজানো রয়েছে মাত্র।

অপরাজিতাই এসে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালে, আর মাইনে করা এক পুরোহিত আসে—সেই সঙ্গে আতপচাল কলা বাতাসা নিয়ে এসে নমো নমো করে পুজো সেরে যায়।

এ বাড়ির গন্নী বা অন্যদের সেই দেবতা সম্বন্ধে কোন ভক্তি, বিশ্বাস এসব কিছু নেই।

মহামায়া ঘটা করে মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে যায়, অবশ্য সে পুজোয় ভক্তি কতটা তা কে জানে, মহামায়া কেনাকাটা সারতে যায়, ফেরার পথে মন্দিরে পুজো দিয়ে আসে মাঝে মাঝে। আর একগাদা সন্দেশ কিনে আনে নিজেদের জন্য।

এর আগেও এমন পুজোর ব্যাপার ঘটেছে। আর কেউ না জানলে অণি, রীণারা জানে, কারণ অনেক সন্দেশ, ভালমন্দ কিনে আনে মহামায়া, মালা সেদিন।

ওরা প্রসাদের লোভে অর্থাৎ সন্দেশের লোভে গিয়ে হাজির হত নিষেধের বেড়া ভেঙ্গে দোতলায় মহামায়ার ঘরে।

কিন্তু কোন কোনদিন দু'একটা টুকরো মিলতো তবে অধিকাংশ দিন জগুদিদার তাড়া খেয়ে শূন্য হাতে নেমে আসতে হতো।

ব্যাপারটা সুজাতা জানতো।

সে নিষেধও করতো ওদের। তবু শিশুমন—সন্দেশের লোভে চলে যেত।

কিন্তু অপরাজিতা সেটা দেখে ফেলার পর সে ডাকে অণি আর রীণাকে। কাকীমাকে ভালোও বাসে—ভয়ও করে তারা।

অপরাজিতা বলে—কেন গেছলে উপরে?

চুপ করে থাকে তারা।

অপরাজিতাও জানে বঞ্চিত শিশুদের মানসিক অবস্থাটা। তার হাতেও তেমন পয়সা নেই যে সন্দেশ কিনে এনে খাওয়াবে ওদের।

অপু বলে—ওরা পছন্দ করে না—যেও না।

অণির সন্দেশের ওপর খুবই লোভ। আর রীণা সন্দেশ নয়, আচার ইত্যাদি কি ঝাল বস্তুর ওপরই লোভ বেশী।

অণি বলে—জানো কাকীমা ওরা কত সন্দেশ আনে।

অপরাজিতা শোনায়

—আমার হাতে পয়সা এলে একদিন তোমাদের সিনেমা দেখাবো আর দারুণ খাওয়াবো। সন্দেশ, রাজভোগ, কালাকাঁদ, রাবড়ি আবার ফুচকা—

—সত্যি!

—হ্যাঁ। তবে সর্ত একদম ওপরে ওদের ঘরে যাবে না।

অণি, রীণা ওই সব পাবার আশায় কথা দেয় ওপরে যাবে না আর ওদের ঘরে, তবে তারাও আবদার ধরে—একটা গল্প শোনাও !

রাত হয়েছে, সুজাতা দিনভোর খেটে ক্লান্ত।

কিছুদিন ধরে অপরাজিতাও দুপুরে ঘুমোতে সময় পায় না।

অমরবাবুর ঘরে রাজ্যের ফাইল, খাতা, কাগজ, হিসাব নিয়ে বসতে হয়।

সুজাতা বলে—রাত হয়েছে, ঘুমো—আর জ্বালাসনে তোরা, কাল সকালে স্কুল।

অণি বলে,

বা রে। আজ শনিবার। কাল রবিবার। ছুটি না। বলো না গল্প একটা !

সুজাতা ধমক দিতে যাবে,

অপরাজিতা বলে—বকো না দিদি ! তুমি ঘুমাও, আমি ওদের গল্প শোনাচ্ছি, ওরাও ঘুমিয়ে পড়বে।

অপরাজিতার দুদিকে দুজন শুয়েছে।

অপু গল্প শোনায়, কোন রাজকন্যা আর রাক্ষসের গল্প ! রাক্ষস রাজকন্যাকে ধরে এনে সোনার খাঁচায় বন্দী করে রেখেছে।

এ যেন তারই জীবনের ব্যর্থতার, বঞ্চনার কাহিনী।

—তারপর ?

অপরাজিতা বলে,—রাজকন্যাও রাক্ষসের এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেই। তাই সে আকাশের সুখ-সারী পাখীদের নিয়েই গান শোনে আর মতলব ভাঁজে—কি করে রাক্ষসকে জব্দ করা যায়।

রাত বেড়ে ওঠে।

ঘুমন্ত পাখীদের কলরব ওঠে মাঝে মাঝে। বাড়িটা নিস্তব্ধ। হঠাৎ বাইরে গাড়ি থামার শব্দ শুনে চাইল। নীচে গাড়িটা এসে থেমেছে, চন্দন ফিরলো এতক্ষণে। সেই রাক্ষস যেন ফিরেছে।

অপরাজিতা বের হয়ে আসে।

এ বাড়ির সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। ওদিকে গাড়ি থেকে নামছে চন্দন। চলবার শক্তি তার নেই। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে পা টলছে ; অসহায় একটা প্রাণী।

ছিটকে পড়তে পড়তে সামলে নেয় কোনমতে, আবার উঠে চলার চেষ্টা করে, পারে না। টলছে।

অপরাজিতা এসে ধরে ওকে। অসহায় চন্দন যেন এমনি একটি নির্ভরই খুঁজছিল। ওর হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। অপরাজিতা ওকে ধরে নিয়ে চলেছে, দোতলার সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে তুলছে চন্দনকে।

তেতলার ব্যালকণিতে দাঁড়িয়ে ছিল অমরবাবু। ক্রমশঃ এখন সে ভাবছে এর আগে ব্যবসা—আর রোজকার নিয়েই মেতে ছিল। আর সংসারের সব ভার দিয়েছিল মহামায়াকে।

বড় ছেলে চলে গেছে। বাড়িতে রয়েছে চন্দন আর নন্দন। অমরবাবু ভেবেছিলো মহামায়া তাদের মানুষ করবে, এই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিল সে।

কিন্তু আজ মনে হয় বাবার ছেলের প্রতি কর্তব্যও সে পালন করে নি। তাই চন্দনও আজ দূরে সরে গেছে, নিজেকে যেন কি অভিমানে এমনি করে শেষই করে দেবে।

তবু ভরসা হয় অপরাজিতাকে দেখে।

এত রাত অবধি জেগে আছে সে মত্ত স্বামীর প্রতীক্ষায়। জীবনে সে পায়নি কিছুই, তবু তার কর্তব্য সে ঠিকই করে চলেছে।

চন্দন নেহাৎ মন্দ ভাগ্য—নাহলে এই মেয়ের মর্মও সে নিশ্চয়ই বুঝতো।

অমরবাবু ভিতরে চলে যায়।

অপরাজিতা চন্দনকে তার ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়। আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে চন্দন। অপরাজিতা ওর জুতো জামা খুলে ভালো করে শুইয়ে বের হতে যাবে,

—শোনো!

চন্দন চেয়ে আছে তার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে।

অপরাজিতা ফিরে চাইতে, বলে চন্দন।

—চলে যাচ্ছো যে! থাকবে না?

অপরাজিতা জবাব দিল না।

চন্দনই বলে,—থাকো! হাজার হোক তোমার স্বামী তো!

অপরাজিতার চোখের কোণে হাসির আভা ফুটে ওঠে। জীবনটা যেন তার বিদ্রূপে ভরা। বিদ্রূপেরই হাসি আসে ওই চন্দনের স্বামীত্বের দাবীর কথা শুনে।

অপরাজিতা বলে,—স্বামীত্বের অধিকার অর্জন করতে হয়, তার যোগ্য হতে হয়। সেই যোগ্যতা যেদিন তোমার আসবে সেদিন আমি আসবো। তার আগে নয়।

তীক্ষ্ণ কথাগুলো—ওর জ্বালাটাও বেশ জোরালো। তাই ওই কথাগুলো অর্ধঅচেতন চন্দনের মনেও সাড়া তোলে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে সে অপরাজিতাকে, কথাগুলো বলে সে আর দাঁড়ায় না।

চলে যায় নীচে, তার ঘরের দিকে, নিঃশব্দ বাড়িতে তার পায়ের শব্দটা কেমন বিচিত্র শোনায় চন্দনের কাছে।

নিজেকে অপরাধীই মনে হয় তার। এই অপরাধবোধটা তার কাছে নতুন। বিচিত্র একটা অনুভূতি।

ব্যাপার আর একজন দেখেছিল, সে সুজাতা। অপরাজিতার মনের অতলের এই বেদনাটার সেও নীরব সাক্ষী।

অপরাজিতা ফিরে এসে শোয়।

সুজাতা কিছু বলে না। নারীত্বের ব্যর্থতার—শূন্যতার বেদনার অদৃশ্য বাঁধনে তারা দুজনে যেন এক সূত্রে বাঁধা পড়েছে। এ বাড়ির মানুষদের সে খবর জানার প্রয়োজনও নেই। এ বাড়িতে কেউ তাদের খবরও রাখে না।

স্বার্থপর কুচক্রী মানুষ সমাজে বাস করে সাপের মত। ওরা থাকে মাটির নীচের অতল অন্ধকারে, বের হয় মাঝে মাঝে বিষফণা তুলে। আবার ছোবল মেরে বিষ ঢেলে তারা সঙ্গোপণে সরে যায় মাটির অতলে।

সমাজে এরাও রয়েছে।

এদের চেনা যায় না—কিন্তু এদের অস্তিত্বকে অস্বীকারও করা যায় না।

জগুমাসী সেই জাতের মানুষ। তার পরিকল্পনাটা নন্দনের মনে ধরেছে।

এই নিয়ে ভেবেছে নন্দন। বলে,

—কোন গোলমাল হবে না তো মাসী ?

জগু বলে না-না, কাকপক্ষীতেও টের পাবেনা।

দেখবি মেয়েটাও ফৌত হয়ে যাবে—তোর পথও সাফ। আর আমিই সব করে দেব, কোন ভয় নেই।

নন্দন খুশীতে ডগমগ হয়ে ব্রিফকেস থেকে একটা পাঁচ হাজার টাকার বাণ্ডিল বের করে দেয়।

—তোমার তীর্থযাত্রার খরচা—কাজ ভালোয় ভালোয় শেষ হলে আরও পাবে।

জগুমাসী টাকাটা তার হরিনামের ঝোলায় পুরে বলে—জয় রাধে।

দেখিস মা—যেন সব কাজ ভালোয় ভালোয় হয়ে যায়।

পরদিন জগ়ু ঘটা করে কোন মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রসাদ, প্রসাদী সিন্দুর আনে, সে প্রসাদ বাড়ির চাকর বাকরদেরও দেওয়া হয়। সকলেই জেনেছে মাসীমা মানসিকের পুজো দিয়ে এসেছে। আর প্রসাদও এনেছে দেদার।

অণি—রীণারাও খবরটা পেয়েছে।

তাদের মন চায় প্রসাদ পেতে। ভালো সন্দেশ এনেছে জগু দিদা। কিন্তু কাকীমাকে কথা দিয়েছে তাই ওপরে যেতে পারে না।

বাগানে খেলছে ভাই বোনে, কিন্তু মন পড়ে আছে প্রসাদের দিকে ওদের।

অণি কি ভেবে বাড়ির ভিতর আসে, খেলায় ঠিক মন দিতে পারে না। রীণা এদিক ওদিক দেখে, বারন্দায় কেউ নেই।

রীণা সিঁড়ি দিয়ে দোতোলায় উঠে যায়।

দোতলার বারান্দাও শূন্য। রীণা নিঃশব্দে গিয়ে জগু মাসীর ঘরে উঁকি মারে।

জগু মাসী টেবিলে একটা থালায় অনেক সন্দেশ সাজিয়ে একটা ছোট্ট শিশি থেকে সেই সন্দেশগুলোর উপর ফোঁটা ফোঁটা কি যেন ঢালছে আর এদিক ওদিক চাইছে।

ওর চোখ মুখের চেহারাও কেমন বদলে গেছে।

ভয় হয় রীণার।

পায়ে পায়ে সরে আসে সে।

অপরাজিতার কাজ সুরু হয় সকাল থেকেই।

সুজাতা ভোরে উঠে স্নান সেরে রান্নাঘরে ঢোকে।

অপরাজিতা অণি, রীণাকে স্কুলে পাঠিয়ে অমর বাবুর খাবার নিয়ে যায় ওপরে।

আজ স্কুলের ছুটি।

ওরা বাগানে খেলছে। অপরাজিতা স্নান সেরে চুল আচড়াচ্ছে।

—বৌমা ?

অপু কার ডাক শুনে চাইল। এ বাড়িতে এতদিন এসেছে ওইভাবে স্নেহভরা স্বরে কেউ তাকে ডাকেনি এক অমরবাবু ছাড়া।

তাই মেয়েদের গলায় ওই ডাক শুনে চাইল অপরাজিতা।

জগ্ন মাসী ঢ্নকছে। স্নান, প্নজো সারা, কপালে তিলক ছাপ, পরনে গরদের থান, একেবারে ভক্তিমতীর প্রতীক। এ যেন অন্য মান্নষ।

অপরাজিতা চাইল।

জগ্নমাসী বলে,

—আসা হয়ে ওঠে না মা। আজ গ্নর্নদেবের প্নজো দিয়ে এলাম। ওঁর জন্মোৎসব কিনা। পরম কর্নণাময় আমাদের গ্নর্নদেব আর গ্নর্নমা তো সাক্ষাৎ জগৎজননী। তাদের প্নজোর প্রসাদ, প্রসাদী সিন্দ্নর আনলাম মা। ভাবলাম এয়োস্ত্রী রয়েছো—প্রসাদ দিয়ে যাই। নাও মা প্রসাদ। ভক্তি করে খেও—সব মনস্কামনা প্নর্ণ হবে মা। জয় গ্নর্ন—জয় রাধে।

অপরাজিতা তখন চুল বাঁধতে ব্যস্ত।

বলে সে—মাসীমা প্রসাদটা টেবিলে রেখে দিন, আমি নেব হাত ধ্নয়েই।

জগ্নমাসী বলে—তাই রাখছি মা। হ্যাঁ—প্রসাদের অগ্রভাগের মাহাত্মই বেশী মা। ওসব তুমি নিজে খাবে। আর শোন—খোলা হাওয়ায় প্রসাদ বেশীক্ষণ রাখতে নেই। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিও। চলি—জয় রাধে।

জগ্ন প্রসাদ রেখে চলে গেল রাধারাণীকে স্মরণ করে।

অপরাজিতা চুল বাঁধতে ব্যস্ত।

প্রসাদের কথাও তার মনে নেই। অণি ঘরে ঢ্নকেছে। আর টেবিলে ওই সন্দেশ ক'টা দেখে তার লোভও হয়। এমন সন্দেশ অনেকদিন পায়নি সে। আজ চোখের সামনে ওই সন্দেশগ্নলো দেখে বলে অণি।

—কাকীমা, সন্দেশ নেব ?

—সন্দেশ ?

অপরাজিতা চাইল। এবার তারও খেয়াল হয়। অণিকে সন্দেশ খাওয়াবে বলেছিল।

অপ্ন বলে,—তুই চারটেই নে।

অণি চারটে সন্দেশের মালিকানা পেতে তক্ষ্নণি খেতে স্নর্ন করে। আর গোটা চারেক সন্দেশই শেষ করে এনেছে প্রায়, এমন সময় রীণা ঢ্নকে ওই থালা আর সন্দেশগ্নলো দেখে চমকে ওঠে। একট্ন আগে ওগ্নলো জগ্নদিদার ঘরে দেখেছিল—ওই সন্দেশে কি মিশোচ্ছিল সে।

রীণা বলে ওঠে—খাস্ নে—খাস্ নে দাদা ওই সন্দেশ। কাকীমা—

—খাবে না ? কাকীমা খেতে বলেছে। তুই থামতো।

রীণা বলে—ওতে জগ্নুদিদা একটা ছোট্ট শিশি থেকে কি মিশোচ্ছিল কাকীমা। ওকে খেতে নিষেধ করো।

—সেকি। চমকে ওঠে অপরাজিতা।

রীণা বলে—হ্যাঁ। আমি আড়াল থেকে নিজে দেখেছি।

ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে।

বুভুক্ষু ছেলেটা দামী সন্দেশ পেয়ে বাছবিচার না করেই খেয়ে ফেলেছে। জগুমাসী ওই সন্দেশগুলো বার বার করে অন্যকে নয়,তাকেই খেতে বলেছিল। আর সেটা কেন বলেছিল তাও বুঝতে পারে এবার অপরাজিতা।

ছুটে আসে সে অণির কাছে।

চমকে ওঠে শূন্য প্লেট দেখে। অপরাজিতা আর্তনাদ করে ওঠে।

—সব খেয়ে নিয়েছিস। এখন কি হবে?

ঘটনাটা নিয়ে বেশী হৈ চৈ করতে চায় না অপরাজিতা। মনে হয় রীণা ভুলই দেখেছিল। সে রকম কিছু হলে অণি অসুস্থ হয়ে পড়তো।

তেমন কিছু না হতে দেখে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয় অপরাজিতা। রীণাকে বলে,

—কি দেখতে কি দেখেছিস! ওসব কিছু নয়। যাও খেল গে! কাউকে এসব কথা বলিস না।

ব্যাপারটা তখনকার মত চাপা পড়ে যায়।

দুপুরটাও ভয়ে ভয়েই কাটায় অপরাজিতা।

তবু চোখ কান খোলা রেখেছে সে।

দেখেছে জগুমাসী দু'একবার এসেছে রান্নাঘরে। তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে. আবার চলে যায়। জগুমাসীও জানে না যে তার দেওয়া সন্দেশগুলো অন্যজন খেয়েছে, ও ভেবেছে তার তীর ঠিক লক্ষ্যেই বিঁধেছে আর তার শিকার যথা সময়েই কাৎ হয়ে যাবে। তাই ঘন ঘন আজ রাধারাণীকে ডেকে চলেছে যোগেশ্বরী।

তার ডাক ব্যর্থ হয় না।

সন্ধ্যা হতেই অণি অসুস্থ হয়ে পড়ে। বমি আর পেটে অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায় ছেলেটা।

সুজাতা ছুটে আসে।

—অপু, অণি কেমন করছে।

অপরাজিতা হাতের কাজ ফেলে ওঠে।

অমরবাবুর ঘরে সে হিসাবপত্র দেখছিল।

সুজাতা ছেলের ওই বমি আর যন্ত্রণা দেখে তার কাছেই ছুটে এসেছে।

অপু চমকে ওঠে।

—কখন থেকে শুরু হ'য়েছে ?

—একটু আগে থেকে। ছটফট করছে ছেলেটা।

অপু বলে—অণির খুব অসুখ বাবা।

অমরবাবু বলে—সেকি! ডাঃ সেনকে ফোন করো, এসে দেখে যান।

অপরাজিতাও সেইমত ফোন করেছে।

তার কিছুক্ষণ পরই ডাঃ সেনও এসে পড়েন। অপুই তাকে নিয়ে আসে তাদের ঘরে।

ছেলেটা বিছানায় শুয়ে আছে। মুখ চোখ বিবর্ণ—এক দিনেই একেবারে যেন নিস্তেজ হয়ে গেছে।

সুজাতা দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে জল, এছাড়া আর তার করার কিছু নেই। চিকিৎসার খরচ তাকে কেই বা দেবে।

ডাঃ সেন পরীক্ষা করে বলেন,

—একে এখুনিই নার্সিং হোমে নিয়ে চল মা, বেশ কঠিন হয়ে গেছে কেসটা। ডি হাইডেশনও শুরু হয়ে গেছে। একে বাড়িতে না রেখে নার্সিং হোমেই নিয়ে এসো, ওখানেই চিকিৎসা করতে হবে। দেরী করোনা।

কথাগুলো বলে চলে যান তিনি।

কিন্তু এবার বিপদে পড়ে সুজাতা। অসহায় কণ্ঠে বলে সে,

—কি হবে অপু? টাকা পয়সাও নাই। শেষ সম্বল গলার হারটা ছিল তাও ওরা নিয়ে নিল, এখন নার্সিং হোমের খরচ কোত্থেকে জোটাবো!

কথাটা ভাবছে অপরাজিতা।

টাকার দরকার। অপরাজিতা বলে,

—ওসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে যেভাবেই হোক। অণিকে এখুনি নার্সিংহোমে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি দিদি, এভাবে ফেলে রাখা যাবে না।

সুজাতা কি বলতে চায়, কিন্তু অপু সেসব কথায় কান না দিয়ে যদুদাকে খুঁজতে গেল ট্যাক্সি ডাকার জন্য। অণিকে বাঁচাতেই হবে, নার্সিংহোমের টাকা যেভাবে হোক যোগাড় করবেই।

সুজাতা দিশাহারা হয়ে গেছে। ছেলেকে নিয়েই ব্যস্ত।

অপরাজিতাই ওকে যদুকে নিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে সোজা নার্সিংহোমে নিয়ে আসে।

সুজাতার চোখে জল, বলে সে ডাঃ সেনকে,

—অণিকে বাঁচিয়ে তুলুন ডাক্তারবাবু, ওই টুকুই আমার মত অভাগিনীর সব।

ডাঃ সেন বলেন—চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না মা।

এর পরই প্রশ্ন করেন ডাঃ সেন।

—কেসটায় আমার সন্দেহ হচ্ছে মা। এটা যেন কেস অব পয়েজনিং। ওকে বিষ দেওয়া হয়েছে, ওর শরীরে বিষের লক্ষণই দেখছি।

—সেকি! চমকে ওঠে অপরাজিতা।

যে ব্যাপারটা সে চেপে যেতে চাইছিল এখন সেইটাই বড় হয়ে উঠেছে।

অপু বলে—তেমন কিছু হবে কেন? একটা শিশুকে কে বিষ দেবে! ওসব পরে বিচার করবেন—এখন ওকে বাঁচান ডাক্তারবাবু।

ডাঃ সেন বলেন—সে চেষ্টাতো করছিই। কিন্তু এরও একটা তদন্ত হওয়া দরকার মা। পরে কথা হবে।

ডাঃ সেন ভিতরে চলে যান।

বাইরে বারান্দায় অপেক্ষা করছে অপরাজিতা। এ যেন অন্তহীন প্রতীক্ষা। সুজাতার চোখে জল।

সে বলে—ডাক্তারবাবু কি বলছিলেন?

অপরাজিতা বিষের কথাটা চেপে গিয়ে বলে,

—না, অণির চিকিৎসার কথাই বলছিলেন।

ওদিকে ছেলেটাকে নিয়ে যমে মানুষে যেন টানাটানি চলেছে। ডাঃ সেন কোনোমতে ছেলেটিকে বিপদ থেকে বাঁচান।

তখন সকাল হয়ে আসছে।

বারান্দায় জেগে বসে আছে অপরাজিতা আর সুজাতা।

ডাঃ সেন এবার অবাক হন।

এতবড় দুর্ঘটনার পরও এবাড়ি থেকে এসেছে মাত্র একজন, সে যদু চাকর। বাড়ির আর কেউ আসেনি।

অপরাজিতা জানে ওদের আসার মত অবস্থা নেই। চন্দন কখন রাতে ফেরে—কি অবস্থায় ফেরে তার ঠিক নেই। নন্দনের আসার কোন কারণই নেই।

জানে অপরাজিতা অমর বাবুই জেগে আছেন। তার আসার মত শক্তি নেই। তাই তিনিই যদুকে পাঠিয়েছেন।

ডাঃ সেনকে দেখে অপরাজিতা এগিয়ে আসে। ব্যাকুল কণ্ঠে জানায়,

— কেমন আছে অণি?

—খুব সময়ে এনেছিলে, তাই এযাত্রা বেঁচে গেছে, ছেলেটা এখন ঘুমুচ্ছে দেখে আসতে পারো। তবে ওকে জাগিওনা, ঘুমুতে দাও।

সুজাতা নিশ্চিন্ত হয়।

অপরাজিতার জন্যই ছেলেটা এযাত্রা বেঁচে গেল। সে নিজে ওকে এখানে না আনলে কি সর্বনাশ হতো কে জানে।

বের হয়ে আসছে তারা, এমন সময় ইনস্পেক্টার তরুণ ঘোষালকে দেখে চাইল অপরাজিতা।

—স্যার আপনি!

তরুণ ঘোষাল পাকা পুলিশ। একবার দেখলে সেই লোককে মনে রাখে। আর সব কেশ হিস্ট্রীও মনে পড়ে যায় তার। তাই অপরাজিতাকে দেখেই চিনেছেন তিনি, তার হিসাবও মিলে যাচ্ছে।

জোর করেই অপরাজিতা শ্বশুর বাড়িতে গেছে। তার কিছু দিনের মধ্যে এই বিষের কেস ঘটে গেল ওবাড়িতে। পুলিশের হিসাবে এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই। তাই খবর পেয়েই তিনি এসেছেন।

সুজাতা পুলিশ দেখে ঘাবড়ে যায়।

অপরাজিতা কিন্তু ঘাবড়ায়নি। তরুণ ঘোষাল ওকে ওদিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে শুধোয়।

—তোমার কাকে সন্দেহ হয়?

অপরাজিতা বুঝেছে ব্যাপারটা। পুলিশ কেসের তদন্ত করলে তাদের বাড়ির সম্মানই বিপন্ন হবে। তাছাড়া প্রমাণও করা যাবে না। শুধু শুধুই বদনাম হবে।

তাই অপরাজিতা অবাক হয়ে বলে,

—কি বলছেন আপনি? না-না' ফুলের মত ছেলেটাকে কেউ বিষ দিয়ে মারার কথা ভাবতেই পারেনা।

ছেলেমানুষ, কিছু খেয়ে ফেলেছিল—তাতেই এমন হয়েছে।

তরুণ ঘোষাল এত সহজে ভোলার লোক নয়।

বলে সে—আসলে তাকে মারার জন্য বিষ দেয়নি, দিয়েছিল অন্য কাউকে

মারার জন্য। মিস্ ফায়ার হয়ে গেছে, তাই জানতে চাই কাকে তোমার সন্দেহ হয় ?

অপরাজিতা ওই কাহিনীকে আমল দিতে চায় না। তাই সে বলে।

—ওসব কিছুই নয়। জাস্ট এ্যান একসিডেণ্ট।

এ নিছক দুর্ঘটনাই বলতে পরেন।

ইনস্পেক্টর ঘোষাল দেখছেন অপরাজিতাকে।

ওর কথায় কোন দ্বিধা বা জড়তা নেই। সহজভাবেই বলছে কথাটা।

—চলি! তরুণ ঘোষাল কিছুটা হতাশ হয়েই ফিরে যায়।

সুজাতা এগিয়ে আসে। ভীত কণ্ঠে বলে,

—কি বলছিলেন উনি!

অপরাজিতা বলে—ওসব কিছু নয়! চলতো ?

ছেলেটা এখন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলে নিশ্চিন্ত হই।

সুজাতা বলে—কিন্তু নার্সিং হোমের টাকার কি হবে ?

অপরাজিতা এতক্ষণ অন্য চিন্তা আর উৎকণ্ঠায় ডুবেছিল। এবার তারও মনে হয় হাজার তিনেক টাকা লাগবে।

হাতে তেমন কিছু নাই। ওই টাকা তাকে যোগাড় করতেই হবে। বেশ জানে ব্যাঙ্কের বই টাকা সব মহামায়ার হাতে। যেভাবে হোক টাকার যোগাড় করবেই সে।

সুজাতার কথায় বলে অপরাজিতা।

—চলতো—টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে ও বাড়ি থেকেই।

এ বাড়িতে এখন ঝড়ের পর স্তব্ধতা নেমেছে।

নন্দন ভেবেছিল জগুমাসীর তীর সঠিক লক্ষেই বিঁধবে। তার কাজও হাসিল হয়ে যাবে।

কিন্তু সব চালই ফস্‌কে গেছে।

সেই সন্দেশ খেল অণি। অপরাজিতা বেঁচে গেল। শুধু বেঁচেই যায়নি, সেইই চেষ্টা করে ছেলেটাকে বাঁচিয়েছে।

পুলিশও এসেছিল নার্সিংহোমে কারণ ডাঃ সেনই পুলিশকে জানিয়েছিলেন বিষের খবর।

মহামায়ার ঘরেই তাই জরুরী আলোচনা সভা বসেছে। নন্দন গুম হয়ে বসে আছে, জগু ঠাকরুণের মুখ ভার। এইভাবে তার সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে

তা ভাবেনি সে।

মহামায়া কিছুটা জানতো ওদের ষড়যন্ত্রের কথা। কিন্তু এই বিষ দিয়ে মেয়েটাকে সরাবার চেষ্টা করবে তা জানতো না। এখন সব শুনে মহামায়াও বেশ ঘাবড়ে গেছে।

বলে সে—যা করছিলি কর, তাই বলে বিষ দিয়ে মারতে গেলি? এখন পুলিশও ঘুরছে। মেয়েটা যদি কিছু বলে দেয়, সবকটার কোমরে দাঁড়ি পড়বে, তা জানিস? ছিঃ ছিঃ এইসব করতে গেলি?

নন্দন ভাবতে পারে না যে এমনি কাণ্ড ঘটবে।

সে বলে—জগুমাসী বল্লে সব ব্যবস্থা ঠিক ঠিক হয়ে যাবে।

মহামায়া শোনায়,—তোরা যাস ডালে ডালে। ও মেয়ে যায়, পাতায় পাতায়। এখন কি হতে কি হবে কে জানে।

জগুমাসী যেন বোবা হয়ে গেছে। তার চালে ভুল হয় না। কিন্তু এবার তাই হয়েছে।

মহামায়া বলে, —এখন কিছুই করবি না। চুপচাপ থাকবি।

নন্দন এটা মানতে রাজী নয়। তার শিহরে শমন দাঁড়িয়ে। তাকে বাঁচতেই হবে, নাহলে মেয়েটা এবার তাকেই ফাঁসিয়ে জেলে পাঠাবে চোর বদনাম দিয়ে।

নন্দন বলে—চুপ করে থেকে ওই মেয়েটার সব জুলুম সইতে হবে!

—হ্যাঁ, তোদের যা বুদ্ধি তাতে এ ছাড়া আর পথ নেই। এখন চুপ করে থাক। পরে যা করার ভাবতে হবে।

জগুমাসী আজ অসহায়। সে বলে,—মহামায়া যা বলছে তাই কর। গোলমাল থিতুলে তারপর ভাবা যাবে কি করা যাবে।

কি ভাবছে নন্দন।

রাতভোর ঘুমুতে পারে নি অমরবাবু। চোখের সামনে ভাসছে তার বড়ছেলের মুখ। রাগে অভিমানে ছেলেটা এ বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছল আগেই। মহামায়ার মত মেয়েকে সে তার মায়ের আসনে বসাতে পারে নি। তাই চলে গেছল এ বাড়ি থেকে সব ছেড়ে।

নিজের চেষ্টায় ঘর বেঁধেছিল। তার ঘরে এসেছিল দুটি সন্তান। অণি তারই বড়ছেলে। অমরবাবুর বংশধর। কিন্তু এ বাড়িতে মহামায়া তাদের কি করুণ অবস্থায় রেখেছে তা জানে অমরবাবু।

তবু অপরাজিতা তাদের দেখাশোনা করে—ভালোবাসে। অমরবাবুর সঙ্গে রোজ সকালে বাগানে দেখা হয় তাদের। কেমন মায়া পড়ে গেছল ছেলেটার উপর। হাজার হোক রক্তের টান—ঠিকই কাছে চলে আসে। ওদের নিয়েই বাঁচার স্বপ্ন দেখছিলো অমরবাবু। হঠাৎ এমনি সময় ছেলেটা অসুস্থ হয়ে পড়ল। নার্সিংহোমে পাঠাতে হয়েছে তাকে।

অপরাজিতা—সুজাতাও গেছে সেখানে। অমরবাবু চন্দনের খোঁজ করে —ফেরেনি। নন্দন বলে পাঠায় তার শরীর খারাপ।

অর্থাৎ এ বাড়ির ছেলের জন্য ওদের বিন্দুমাত্র কোন ভাবনাও নেই। মানুষের স্বার্থপরতার কুশ্রী রাগটাকেই দেখেছে অমরবাবু বারবার।

তার ধারণাও বদলাচ্ছে এদের সম্বন্ধে।

রাত ভোর হয়েছে, পাখীদের কলরবে ঘুম ভাঙ্গে। রাত জেগে—ভোরের বেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলো অমরবাবু।

মনে পড়ে বৌমারা এখনও ফেরে নি। যদুও ফেরেনি।

নীচে ট্যাক্সির শব্দ শুনে চাইল! নামছে অপরাজিতা, সুজাতা সঙ্গে যদুও রয়েছে। অণি ওদের সঙ্গে নেই।

চমকে ওঠে বৃদ্ধ। তাহলে কি বিপদই ঘটেছে। পায়চারী করছে উত্তেজিত ভাবে। অপরাজিতাকে ঢুকতে দেখে চাইল।

—অণি! অণি কেমন আছে মা?

অপরাজিতা বলে,—ভালোই। এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেল বাবা।

অমরবাবু বলে,—তোমার জন্যই বাঁচলো মা। তাড়াতাড়ি নার্সিং হোমে নিয়ে গেছলে। সবই ঠাকুরের দয়া। কখন ছাড়বে ওকে।

অপরাজিতা বলে,—কাল। কিন্তু বাবা—নার্সিং হোমে প্রায় চার হাজার টাকা লাগবে।

—তাতো লাগবেই। ছেলেটা বেঁচে গেছে এই ঢের। ও টাকা তুমি আমার নাম করে তোমার শাশুড়ীর কাছ থেকে নিয়ে আজই দিয়ে দিও।

অপরাজিতা নিশ্চিন্ত হয়। টাকার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। অমরবাবু বলে,—যাও মা, রাত জেগেছো। হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও গে। রাতভোর যা ঝড় গেল! যাক তবু মুখ রক্ষা করছে মা। এ বাড়ির কেউ তো কারো খবরও রাখে না। সুস্থ হই, এর জবাব এক এক করে দেব। আর মুখ বুজে থাকবো না যদি ঠাকুর দিন দেন।

অমরবাবুও এবার কঠিন হতে চায়। এই অন্যায়গুলো তার মনেও ঝড়

তুলেছে। এবার তারই প্রতিবিধান করতে চায় সে।

সকালে স্নান সেরে ফেলেছে অপরাজিতা। চা খেয়ে টাকাটা নিয়ে নার্সিং হোমে যাবে। জেগে উঠে কাউকে দেখতে না পেলে অণি কান্নাকাটি করবে।

তাই টাকার জন্য অপরাজিতা দোতালায় মহামায়ার ঘরের দিকে এগোয়।

তখন সেখানে বেশ গভীর আলোচনা চলেছে। মহামায়া, নন্দন, জগদ্-মাসীকে বেশ কড়া ধমক দিয়ে বলে।

—যা বলছি তাই কর। এখন সাড়া শব্দ করবি না। মেয়েটার উপর নজর রাখ। তারপর যা করার ভেবেচিন্তে করতে হবে, এসব গোলমাল চুকে গেলে।

এমন সময় অপরাজিতাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ওদের কথা থেমে যায়। অপরাজিতা দেখছে ওদের।

জগদ্মাসীর শয়তানির পরিচয় পেয়েছে সে। অপরাজিতা ওই নন্দনকেও দেখছে কঠিন চাহনিতে, তার চাহনিতে আগুন থাকলে ওরা ভস্মই হয়ে যেত। নেই, তাই এ যাত্রা যেন রক্ষা পায় তারা।

নন্দনই বলে,—হুটহাট ঘরে ঢোকো—জানিয়ে আসতে পারো না? অপরাজিতা দেখছে নন্দনকে।

বলে সে,—আপনারা নিশ্চয়ই কাউকে শেষ করার জন্য ষড়যন্ত্র করছেন না। তাই লুকোবার মত কিছু নেই জেনেই এসেছিলাম বিনা নোটিশে—যদি অন্যায় করে থাকি মাপ করে দেবেন। অপরাজিতা কথাগুলো বেশ শান্ত স্বরেই বলে, কিন্তু এর জ্বালাটা বেশ তীব্র। নন্দন—জগদ্মাসী দুজনের পিঠেই কথাগুলো যেন চাবুকের মত বাজে।

অপরাজিতা বলে,—একটা দরকারে এসেছি, দরকার মিটে গেলেই চলে যাবো। মহামায়া শুধোয়—দরকার!

—হ্যাঁ। চার হাজার টাকা চাই এখুনি। পেলেই চলে যাবো। নন্দন চোট খেয়ে রাগে ফুঁসছিল। এবার সে বলে ওঠে।

—চার হাজার টাকা দিতে হবে?

—হ্যাঁ! অপরাজিতা সাড়া দেয়।

নন্দন গর্জে ওঠে—টাকা কি খোলামকুচি, যে চাইলেই পাওয়া যাবে?

অপরাজিতা বলে,—হ্যাঁ পেতেই হবে। এ বাড়ির কেউ নয়—সে না

চাইতেই যদি হাজার হাজার টাকা পায়, ওড়ায় তাহলে এ বাড়ির বংশধরের চিকিৎসার টাকা পাবার হক নিশ্চয়ই মুছে যাবে না।

নন্দনের গালে যেন চড়ের ঘা মারে ওই কথাগুলো। কি বলতে যাবে সে, অপরাজিতা ওকে থামিয়ে দেয়। এখন ওসব কথা শোনার সময়, মানসিক অবস্থা তার নেই। অপরাজিতা বলে মহামায়াকে,

—টাকাটা দিন।

নন্দন বলে—টাকা নেই।

জগুমাসী দেখছে মেয়েটাকে। অল্পের জন্য ফসকে গেছে তার শিকার। নাহলে আজ এতক্ষণ ওর সব কিছুই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু হয়নি।

তাই এবার যেন মেয়েটা এসেছে তাদের ঘরে ঢুকে দাবী জানাতে।

অপরাজিতা নন্দনের কথায় কান না দিয়ে মহামায়াকে শুধোয়—আপনারও কি এই জবাব? টাকা পাবো না?

মহামায়া রেগেই ছিল ওকে চড়াও হয়ে টাকা চাইতে দেখে। আর ওর ওই তীক্ষ্ন কথাগুলোও তার ভালো লাগে নি। মহামায়া নন্দনের সুরেই বলে।

—এত টাকা কোথায় পাবো? তোমাকে দেবার মত টাকা নেই।

নন্দন বলে চলেছে,—একি তোমার বাপের টাকা জমা আছে, যে চাইলেই পাবে? যাও তো—

অপরাজিতা কথার জবাব দেয় না। কি ভাবছে সে। টাকা তার চাইই। মহামায়ার সামনে টেবিলের আলমারির চাবিটা রাখা।

অপরাজিতা সটান দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে এসে টেবিল থেকে আলমারির চাবিটাই তুলে নিয়ে পিছনের আলমারি খুলে দেখে তাড়াবন্দী নোট রয়েছে। তার থেকে মাত্র চারখানা হাজার টাকার বাণ্ডিল তুলে নিয়ে আলমারির চাবি ফের লাগিয়ে চাবিটা ফেরৎ দেয়।

সব কাজটা ঘটে যায় কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই। মহামায়াও ভাবতে পারে নি যে এমনি একটা কাণ্ড ঘটে যাবে। বাধা দেবার সময়ও পায় না।

নন্দন ব্যাপারটা দেখে উঠে আসে। গর্জে ওঠে সে।

—কি হচ্ছে? দিনে ডাকাতি কারার মতলব—

অপরাজিতা বলে,—ডাকাতি আমি করিনি। ন্যায্য প্রাপ্য বুঝে নিলাম মাত্র। আর এরপর আসল ডাকাতকে ধরেই জেলে পুরবো! সেদিন সবাই জানবে ডাকাত কে?

কথাগুলো নন্দনের মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে সে চলে গেল টাকা নিয়ে।

সারা ঘরে যেন একটা ঝড়ের থমথমে ভাব নামে। জগৎমাসী এবার মুখ খোলে।

—শুনলি মহামায়া, মেয়েটার কথা শুনলি? আর কেমন দস্যি তাও দেখলি। আজ আলমারির চাবি ফেরৎ দিয়ে গেল, এরপর, ওই চাবিটাই না তোর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

মহামায়া এবার তার সাহস ফিরে পায়। আজ এই ঘটনায় সেও নিদারুণ চটে উঠেছে, বলে মহামায়া—তাই দেখছি। এতদিন চুপ করে ছিলাম। আর চুপ করে থাকবো না। একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। এতবড় সাহস—আলমারি খুলে টাকা নিয়ে যায়।

জগৎমাসী বলে—শুধু কি তাই। নন্দন খেটে খেটে নাকদম হয়ে ব্যবসা-পত্র টিকিয়ে রেখেছে? আর ওকেই শাসায় চোর, ডাকাত বলে। বলে কিনা জেলে পুরবে? ওমা—বেইমান, নেমকহারাম মেয়ে—

নন্দন বলে,—তোমরা তো কিছু করতে পারলে না। এবার দ্যাখো এই নন্দনের এলেম। এমন ব্যবস্থা করবো—যে এখান থেকে পালাতে পথ পাবে না ওই মেয়ে।

অপরাজিতা নার্সিং হোমের বিল মিটিয়ে অণিকে এ বাড়িতে নিয়ে আসছে। একদিনেই ছেলেটা নেতিয়ে পড়েছে।

ডাঃ সেন বলেন—মা, বিপদ কেটেছে ওর কিন্তু সাবধানে রাখবে। খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর দিতে হবে। আর সাতদিন বিশ্রাম নিতে হবে। খুব জোর বরাত—তাই বেঁচে উঠেছে।

সুজাতার চোখে আনন্দের অশ্রু নামে। আজ অপরাজিতার জন্যই ছেলেকে ফিরে পেয়েছে সে।

বলে সুজাতা,—তুমি না থাকলে অণিকে ফিরে পেতাম না অপু। অপু থামায় ওকে।

—চলতো দিদি। বাড়ি ফিরতে হবে। যদুও এসেছে। সেইই ট্যাক্সি ডেকে এনে ওদের তুলে বাড়ি রওনা হয়।

অমরবাবু আজ নিচে নেমে এসেছে। এখন ছড়ি নিয়ে নিজেই চলাফেরা করছে। তাকে নীচে আসতে দেখে জগৎমাসী চাইল।

তার উর্বর মস্তিষ্কে সব সময়ই বুদ্ধিগুলো গজিয়ে ওঠে। কি ভেবে জগৎমাসী মহামায়ার ঘরে ঢুকে বলে।

—অ মহামাযা, কর্তা নীচে নেমে গেল। শুনলাম বড় বৌ ছোট বৌ দুই মূর্ত্তি গেছে হাসপাতাল থেকে বংশের দুলালকে আনতে। কর্তা ও তাই নেমেছে। তুই ও যা।

মহামায়া ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। বলে সে—আমি গিয়ে কি করবো?

জগুমাসী বলে,—হাওয়া যখন যেদিকে বয় সেই দিকেই পাল তুলতে হয়, নাহলে নৌকা টলমল করে। এখন কর্তাও ওদিকে ঝুকেছে। তুইও তাই ওদিকেই ঝুকবি। কত খুশী হয়েছিস এই ভাব দেখাবি। ওরা যেন তোর আসল মতলব বুঝতেই না পারে। যা নীচে যা। আমিও সব ব্যবস্থা করে নিয়ে যাচ্ছি। যা যা বলবো ঠিক তাই করবি!

নন্দন নেই,—মালাও শুনেছে কথাটা। জগুমাসীর কথার উপর এরা কথা বলে না। তাই মহামায়াও নীচে নেমে গেল।

অপরাজিতা—সুজাতা ছেলেকে নিয়ে ফিরেছে বাড়িতে। আর ব্যাপারটা দেখে অবাকই হয় অপরাজিতা।

বাড়ির দরজায় মঙ্গলঘট পাতা হয়েছে এর মধ্যে। ডাব আম্রপল্লব—সব দিয়ে সাজানো হয়েছে ঘট।

এর মধ্যে জগুমাসী ঠাকুর ঘর থেকে বরণ ডালা সাজিয়ে এনেছে। ধুপ দীপ জেবলেছে। গাড়িটা থেকে নামছে ওরা অণিকে নিয়ে।

জগুমাসীই এগিয়ে যায়।—দাঁড়াও বৌমা। সোনার চাঁদ এত বড় ফাঁড়া কাটিয়ে ঘরে ফিরলো—ও মহামায়া, সব আপদ দূর করে ওকে বরণ করে নে বাছা। অ মালা—উলু দে।

ওরা ঘটা করে বরণ করে অণিকে।

আজ জগুমাসী—মহামায়া যেন একেবারে অন্যমানুষ।

জগুমাসী বলে সুজাতাকে—বড় বৌমা, কদিন হেসেলে তোমাকে যেতে হবে না, ছেলের সেবা যত্ন করো, ঠাকুর সামলে নেবে। আমরা তো রয়েছি। আগে ছেলেকে সুস্থ করো মা। ছোট বৌমা—ওষুধপত্র যেন ঠিকমত পড়ে তাই দেখবে। অপরাজিতা দেখছে ওদের।

অমরবাবু বলে—হ্যাঁ, ছোট বৌমা ওসবদিকে খুব এক্সপার্ট, আমাকে সারিয়ে তুললো। অণিকেও ফিরিয়ে এনেছে। সবই ঠাকুরের দয়া।

আজ অমরবাবুও খুশী হয়েছেন মহামায়াদের এসে এই ভাবে বরণ করতে দেখে। মনে হয় তার ভাঙ্গা সংসার আবার জোড়া লাগছে।

চন্দন উপরের ব্যালকনি থেকে দেখছে এসবই তাঁর কুলদেবতা নারায়ণেরই ইচ্ছায় ঘটছে।

তাই অমরবাবু আজ মহামায়াকে ডেকে পাঠিয়েছে তার ঘরে। জগুমাসীও এসেছে ওর সঙ্গে কি কাজের আছিলায়।

অপরাজিতা ও রয়েছে ঘরে।

আজ জগুমাসী বলে,—বৌমা, ক'দিন তো ঝড় বয়ে গেল। তুমি বরং নাওয়া খাওয়া সেরে আজ বিশ্রাম করোগে। বাছা দিনরাতই খাটছে। ধন্যি মেয়ে যাহোক। লক্ষী মেয়ে।

অপরাজিতা একটু অবাকই হয়। একদিন এ বাড়ির বিদ্রোহী, স্বার্থপর মানুষগুলো যেন আমূল বদলে গেছে। তারা আজ তাকে ভালবাসছে, তার জন্য ভাবছে। কথাটা ভাবতেও কেমন বিস্ময় লাগে।

অমরবাবু বলে,—মা আমার লক্ষ্মী। হ্যাঁ—বড়বৌ তোমাকে ডেকেছিলাম মানে কতদিন বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো হয় নি। কাল পুর্ণিমা—কাল পুজোর আয়োজন করো। আর বাড়ির সবাইকে বলে দাও কাল যেন তারা পুজো—হোমের সময় থাকে। সস্ত্রীক হোমের আহুতি দেবে—টিকা পরবে—শান্তি জল নেবে সবাই।

জগুমাসী বলায় আগেই খড়কুটো ধরে। আরও দেখাতে চায় পুজো আশ্রার ব্যাপারে তারই আগ্রহ বেশী। তাই বলে জগু,

—এতো খুব ভালো কথা অমরদা, বাড়িতে পুজো হোম হলে সব অমঙ্গল, অকল্যাণ দূর হয়।

অমরবাবু বলে,—ঠাকুরের দয়াতে অণি এতবড় বিপদ থেকে বেঁচে এল। ওই মানসিকেই পুজো দেব কাল। সবাই যেন থাকে। নন্দন—চন্দনদের বলে দিও জগুদি।

জগু বলে—হ্যাঁ-হ্যাঁ। সবাইকে বলছি। আর মহামায়া, ফর্দ করে দিই, যদুটাকে বাজারে পাঠা, সব পুজোর জিনিস যেন ফর্দমত নিয়ে আসে। ঠাকুর মশায়কেও খবর দিতে হবে।

চলি অমরদা, পুজোর হোমের আয়োজন করতে হবে।

যাবার আগে জগুমাসী অপরাজিতাকে বলে—বৌমা। কাল তুমিও পুজোর আয়োজনে হাত লাগাবে! বাড়ির বৌ—এসব শিখে রাখো, কবে আছি কবে নেই। তখন কে শেখাবে। জয় রাধে। চলে যায় ওরা।

সারা বাড়ির আবহাওয়ায় যেন বসন্তের খুশীর হাওয়া নামে। সুজাতাও

অবাক হয়। বলে সে,

—কি ফুস্ মন্তর দিলি রে অপু জগুমাসীকে, যে মাসী তোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ঃ মাও অন্যচোখে দেখছে তোকে!

অপু অণির হরলিক্স ঠিক করতে করতে বলে—কি জানি বড়দি। তবে বেশ বুঝেছি ওরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। তুমি চুপচাপ থাকো তাই তোমার উপরই ওদের বেশী জুলুম। ফোঁস করো—দেখবে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

নে, হরলিক্সটা খেয়ে নে অণি। পুজোর মন্দিরে যেতে হবে।

অণি বলে,—আমি তো ভালো হয়ে গেছি কাকীমা। আমি বাগানে যাবো?

—না। কালকের দিন অবধি রেষ্ট। তারপর যাবে।

অণি চুপ করে থাকে। কাকীমার শাসন তাকে মেনে চলতে হয়। কোন প্রতিবাদ করার সাহস নেই।

মহামায়াকে যোগেশ্বরীর কথা মত চলতে হয়। জগুমাসী কপালে তিলক ছাপ কেটে, হাতে হরিনামের ঝুলিতে মালা ঘোরাতে ঘোরাতে বলে।

—বুঝলি নন্দন, যা করবি গোপনে। কাকপক্ষীতে ও টের পাবে না। কিন্তু বাইরে একেবারে অন্যরকম। যেন কত আপনার জন। গুরুদেব মহাজনী পদাবলী গান—

বলিবি পশ্চিমে, যাইবি দক্ষিণে,
দাঁড়াবি পুরব দিকে।
গোপন পীরিতি গোপনে রাখিবি,
তবে তো রহিবি সুখে"
আহা! কি মধুর পদ। জয় রাধে"

মনে যা বলবি তার উলটোটাই করবি, তবেই সুখে থাকবি। মহাজনরাই বলে গেছেন, তাই কাল পুজোর সময় থাকবি, মালা আর তুই। বুড়ো যেন তোকে কোন রকম সন্দেহ না করে।

মহামায়া বলে,

—মাসী যা বলছে, তাই কর নন্দন।

নন্দন রাগ চেপে বলে—ঠিক আছে, কাল থাকবো।

তবে ওই অপরাজিতাকে আমি ছাড়ব না। ওই বিষবৃক্ষ আমি নির্মূল

করে দেব !

—আস্তে। জগন্মাসী চাপাস্বরে সাবধান করে দেয়। দেওয়ালেরও কান আছে। যাই দেখিগে, পুজোর আয়োজন কতদূর হ'ল। আর মহামায়া, তুই গিয়ে চন্দনকেও বল, কাল যেন থাকে।

মহামায়া বলে—আমি যাবো ?

—তা যাবি না ? এ বাড়ির গিন্নী তুই, ছেলেপুলেদের তুই তো দেখভাল করবি, যা।

চন্দন কিছুদিন থেকে যেন বাইরের জীবনে ক্লান্তি বোধ করে। ভোগেরও বোধ হয় শেষ সীমা একটা আছে। মানুষ প্রথমে ভোগ বিলাসের মোহে জড়িয়ে পড়ে। সেই জগতটাকেই পরম সত্য বলে জানে। সবকিছু ভুলে সেই ভোগের জগতে হারিয়ে যেতে চায়।

কিন্তু তারও একটা সীমারেখা আছে !

সেখানে পৌঁছালে মানুষ এবার পিছন ফিরে চায়। তার হিসাবী মন কি পেলাম আর কি হারালাম তার হিসাব কসতে বসে। কিন্তু যখন দেখে হারানোর মাত্রাই বেশ, জমার ঘরে শূন্য, তখন সে চমকে ওঠে।

শুরু হয় ফেরার পালা।

যা হারিয়েছে তাকে ফিরে পাবার জন্য অদম্য চেষ্টা।

চন্দনের মনে এখন সেই হিসাব নিকাশই চলছে। দেখেছে তার জীবনের শূন্যতার পরিচয়ই।

বিয়ে করেছিল বাধ্য হয়েই।

মনের দিক থেকে বিন্দুমাত্র সায় ছিল না। তাই বিয়ের পর অপরাজিতা এ বাড়িতে রয়েছে। তার সেবাও গ্রহণ করেনি। চন্দন তাকে আঘাতই দিয়েছে—অপমানই করছে বারবার।

চন্দনের অবচেতন মনে আজ সেই আঘাত যেন নিজে থেকেই এসে লাগছে।

অপরাজিতা তার ঘরে আসে না বড় একটা।

তবু রাত জেগে বসে থাকে, কখন ঘরে ফিরবে চন্দন অর্দ্ধঅচেতন অবস্থায়।

অপুই তাকে ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

পায়ের জুতো, পোষাক খুলে কপালে মুখে জল দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা

করে।

ওর ছোঁয়ায় সেদিন চন্দনও যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। কাছে পেতে চায় তাকে। কিন্তু অপরাজিতা তাকে এড়িয়ে যায়। স্বামীত্বর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

চন্দন নিজেকে ক্রমশঃ অপরাধী বোধ করে।

কর্তব্য! স্বামীর কর্তব্য সে কিছুই করেনি। আজ তাই চন্দনের জীবনে শূন্যতাটাই বড় হয়ে উঠেছে।

কি এক মোহে এক উন্মাদনায় জীবনের পথে ছুটেছিল মরীচিকার দিকে ছুটে যাওয়া হরিণের মত। তাই আজ শূন্যই রয়ে গেছে সে। তার জীবনে ছায়া স্নিগ্ধতার সন্ধান নেই—রয়েছে মরুভূমির শূন্যতা আর নিস্তব্ধতা।

তাই অপরাজিতাকে তার প্রয়োজন।

কাকে ঢুকতে দেখে চাইল চন্দন।

—মহামায়া ঢুকছে তার ঘরে।

চন্দনের কাছে মহামায়ার তেমন কোন গুরুত্ব নাই।

নন্দন এলে বরং চন্দন খুশী হতো।

টাকার তার দরকার। তবু মহামায়াকে দেখে চাইল চন্দন।

—তুমি!

মহামায়া বলে,—কাজের চাপে আসা হয়নি তোর ঘরে।

—আজ এলে যে!

—কাল বাড়িতে পুজো হোম। কর্তা তোকেও বার বার করে থাকতে বলেছেন, হোমে আহুতি দিতে হয় স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে, তুই থাকবি।

চন্দন বলে—আমি কি করবো?

মহামায়া বলে—আহুতি দিবি, শান্তিজল নিবি। কর্তাও থাকবেন।

কথাগুলো বলে চলে যায় মহামায়া।

চন্দন ভাবছে, সস্ত্রীক অঞ্জলি দিতে হবে—আহুতি দিতে হবে। অর্থাৎ অপরাজিতাও থাকবে কাল। স্বামীস্ত্রীর পরিচয়ে তাদের সমাজে সকলের সামনে হাজির হতে হবে।

অথচ এই খবরটা তাকে অপরাজিতা দিতে আসে নি, এসেছে মহামায়া।

অপু যেন সব জেনেও ইচ্ছা করেই তাকে আজও এড়িয়ে গেছে। যত কর্তব্য স্বামীরই, স্ত্রীর একবার এসে জানানোর প্রয়োজনও বোধ করে নি

অপরাজিতা।

তাকে আজও কোন স্বীকৃতি দিতে চায় না অপু এইটাই মনে হয় চন্দনের।

অপরাজিতা পুজোর আয়োজন নিয়েই ব্যস্ত। আজ বাড়ির পরিবেশ যেন বদলে গেছে, জগুমাসী সকালে স্নান সেরে গরদের থান পরে মন্দিরে তদারক করছে।

মহামায়াই বলে সুজাতাকে,

তুমিও চল মা মন্দিরে। অণি, রীণাকে স্নান করিয়ে নতুন জামা কাপড় পরিয়ে আনো, ওরা সবাই এসে গেছে, পুজো শুরু হয়েছে।

বাড়ির পুজার ঘরটা ধূপ ধুনোর সৌরভে ম'ম করছে।

অমরবাবু, মহামায়া এসেছে। ওদিকে নন্দন-মালাও বসে আছে ভক্তি গদগদ ভাব নিয়ে।

জগুমাসীও হাজির।

পুরোহিত হোম শুরু করেছে। হোমাগ্নি জ্বলছে, যজ্ঞকুণ্ডে ঘি দিয়ে মন্ত্র পড়ছে পুরোহিত।

ওদিকে দুটো আসনই খালি। চন্দন আসেনি—

অপরাজিতা ভেবেছিল চন্দন আজ নিশ্চয়ই আসবে পুজোর সময়। পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রী বসে আহুতি দেবে।

চন্দনের দেখা নেই।

অপরাজিতা তাই আসনে বসেনি। ওই সকলের সামনে চন্দন আজ তাকে স্ত্রীর পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত তাই আসেনি।

অমরবাবু দেখেন শূন্য আসন দুটো। অপরাজিতা ওদিকে এক পাশে স্তব্ধ পাথরের মূর্তির মত কি বঞ্চনার বেদনা নিয়ে বসে আছে একা।

জগুমাসী আড় চোখে দেখে ওই শূন্য আসন দুটো, চাইল নন্দনের দিকে—

নন্দন মালা যুগলে বসে আছে।

নন্দনও দেখে চন্দন আসেনি।

অমরবাবু তবু যদুকে বলে,

—ছোটবাবুকে ডেকে আন যদু, বলবি আমি ডাকছি।

জগুমাসী কথাটা শোনে, সেও বলে,

—যা বাবা যদু, আহুতির সময় হয়ে এল, কাল বলে পাঠালাম ওকে আসার জন্য, দ্যাখ।

পুজো হোম চলেছে।

বাতাসে ঘি পোড়ার গন্ধ। অমরবাবু যেন ওই পবিত্র হবির সঙ্গে তার ঘরের সব অমঙ্গল, অকল্যাণ পুড়িয়ে দূর করতে চায়।

অপরাজিতাও শোনে চন্দনকে ডেকে আনার কথা। যদু গেল—তাও দেখে সে নীরবে, মনে আশার আলো জাগে, চন্দন নিশ্চয়ই আসবে।

চেয়ে থাকে সে দোতলার দিকে।

ফিরে আসে যদু, জানায় অমরবাবুকে।

—ছোটবাবু ঘরেও নেই।

—সেকি!

কথাটা অপরাজিতার বুকে বাজে।

—আহুতির সময় হয়ে গেছে। নিন—ফুল বিল্বপত্র নিন, পুরোহিত এদের হাতে ফুল বেলপাতা দিচ্ছে।

অমরবাবু মহামায়া, নন্দন মালা ফুল নেয় স্বামীস্ত্রীতে, অপরাজিতার চোখে জল নামে, তার এই সামান্য অধিকারটুকুও নেই। চন্দন তাকে এইভাবে অবজ্ঞা করবে সকলের সামনে তা ভাবেনি অপরাজিতা।

চন্দন এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই করেছিল। তাই সকালেই সে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছল। কোথায় যাবে জানেনা, এক বন্ধুর বাড়িতেই গেছল।

কিন্তু দেখে সেখানে স্বামী স্ত্রী দুজনে বের হয়ে যাচ্ছে কোন মন্দিরে পুজো দিতে। বন্ধুর স্ত্রী বলে—এ সময় এলেন যে! বেরুচ্ছি

চন্দন দেখছে ওদের! ওরা দুজনে খুশীতে ডগমগ।

স্কুটারে চেপে তাকে ফেলে রেখেই চলে গেল।

ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তার যেন কোন ঠাঁইই নেই।

হঠাৎ মনে পড়ে অপরাজিতার কথা।

চন্দন বারবার তুচ্ছ মান অভিমানের জন্যই নিজেকে অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিতও করেছে।

মনে পড়ে বাড়ির কথা।

শান্তির সন্ধান করার জন্য পথে পথে না ঘুরে তাই বাড়িতেই ফেরে চন্দন।

হঠাৎ নজরে পড়ে মন্দিরের দৃশ্যটা।

মনেপড়ে কাল বলেছিল ওকে আহুতির সময় হাজির থাকতে।

ওরা সকলেই এসেছে।

কিন্তু অপরাজিতাকে দেখেনা চন্দন, দেখে তাদের দুটো আসনই খালি রয়েছে। আর দেখে ওদিকে সিঁড়ির ধারে অবহেলিত—যেন অপরিচিত অপরাজিতা বসে আছে, ওর চোখে জল।

চমকে ওঠে চন্দন।

ওই মেয়েটির চোখেও জল! এ সংসারের হাল অনেকটা ফিরিয়েছে সে। পঙ্গু বাবাকে সুস্থ করেছে, প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে তার বড় ভাইয়ের ছেলে অণির।

এ সংসারে মুখ বুজে খেটেই চলেছে। বাড়ির ছন্নভঙ্গ অবস্থাটাও বদলেছে, বাড়িতে শ্রী ফুটে উঠেছে।

চন্দন যেন আজ নতুন করে চেনে অপরাজিতাকে। স্বামীর কর্তব্য সম্বন্ধেও ভাবছে সে।

—কই ছোট বউমা—ছোটবাবু আসুন, আহুতির পুষ্প নিন, আহুতি দিতে হবে!

অপরাজিতা হঠাৎ চেয়ে দেখে চন্দন এসেছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে আসনে বসে।

অপরাজিতার সারা মনে ঝড় ওঠে। তাহলে এসেছে চন্দন। তাকে স্বীকৃতি দিতে আজ চায় সে। এ যেন নারীত্বেরই স্বীকৃতি।

অপরাজিতাও এবার এসে চন্দনের পাশের শূন্য আসনে বসে।

দেখছে ওদের অমরবাবু! তার চোখে কি খুশীর আভাষ!

দেখছে জগুমাসী। তার চাহনিটা ক্ষণিকের জন্য নিষ্ঠুর, কঠিন হয়ে ওঠে।

দেখছে ওদের নন্দন কঠিন চাহনিতে। সে ভাবতেই পারে নি যে চন্দন সত্যিই আসবে। ওই মেয়েটাকে স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু তার হিসাব যেন সব গড়বড় হয়ে যাচ্ছে ওদের পাশাপাশি স্বামী স্ত্রী হিসাবে বসে আহুতি দিতে দেখে।

হাত পেতেছে পুরোহিতের সামনে অপরাজিতা ফুল নেবার জন্য—আরও একটা হাত এসে পড়ে তার হাতের পাশে, চন্দনও হাত পেতেছে।

কই দিন ফুল, বিল্বপত্র—

ওর হাতে ছোঁয়া লাগে অপরাজিতার নরম হাতের। এই স্পর্শটুকুতে

চমকে ওঠে চন্দন।

কি হিম চন্দন স্পর্শ। শান্ত একটি অনুভূতি। তার লাগামছাড়া অশান্তি আর লোভ লালসার আগুনজ্বালা জীবনে এই শান্ত কোমল স্পর্শ-টুকু কি এক অপূর্ব প্রশান্তি আনে সারা মনে—আনে কি পরম পাওয়ার প্রসাদ।

দুজনে আহুতি দেয় যজ্ঞে। একত্রে বসে শান্তিজল নেয়। পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করে শান্তিজল বর্ষণ করছে।

—সব জ্বালা—সব অকল্যাণের শান্তি হোক। বাতাসে জ্বলুক শান্তির সুধা, জীবনের সব পাপ বিধৌত হয়ে যাক এই শান্তি বারির স্পর্শে।

ওঁ শান্তি—ওঁ শান্তি—ওঁ শান্তি, এই মন্ত্রধ্বনি আজ চন্দনের মনে কি সাড়া আনে। মাথা পেতে সে ওই শান্তিজল নেয়।

অপরাজিতা দেখছে মাত্র।

দেবতার কাছে সেও কি প্রার্থনা জানায়। আজ অপরাজিতাও খুশী হয়েছে চন্দনের ওই পরিবর্তনে। অপরাজিতাও যেন মনে মনে এই চেয়েছিল।

সবচেয়ে খুশী হয়েছে অমরবাবু।

তার নিজের ছেলে চন্দন এতদিন দূরে দূরেই ছিল। যেন এ বাড়ির ও কেউই নয়—এমনি নির্লিপ্ত উদাসীন ভাবেই থাকতো। যা খুশী তাই করতো।

বেপরোয়া জীবনই যাপন করতো সে। আজ চন্দনকে এখানে বসে ব্যাকুলচিত্তে শান্তিজল নিয়ে দেবতাকে প্রণাম করতে দেখে অমরবাবু খুশী হয়। এসবই যেন সম্ভব হয়েছে ওই অপরাজিতার জন্য।

মেয়েদের চরিত্র এমনি রহস্যাবৃত। বহু বিচিত্র ওদের রূপ।

অমরবাবুর চোখেই নারী চরিত্রের বহু বিচিত্র রূপই ফুটে উঠেছে বারবার।

এই বাড়িতেই অমরবাবু দেখেছে মহামায়াকে—স্বার্থপর, অহঙ্কারী লোভী একটি মেয়ে। তার অনুচর যোগেশ্বরীকে ও দেখেছে, যেন দুজনে এক ছাঁচে গড়া। তবে জগুমাসীর একটু বিশেষ গুণ আছে। বুদ্ধিটা তার বেশী তীক্ষ্ণ।

আবার দেখছে অপরাজিতাকে। নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। ভোগবিলাসে ডুবে আছে এ বাড়িতে নন্দনের বৌ। শাড়ি-গহনা-গাড়ি সব

তার চাই। কারো কথা ভাবার সময় তার নেই।

অপরাজিতার ওসবে লোভ নেই। সে এবাড়িতে এসে এবাড়ির মানুষদের কথাই ভেবেছে। এই বাড়ির ছন্নছাড়া—হৃদয়হীন অবস্থাটাকে তার হৃদয়ের উত্তাপে নতুন করে সাজাতে চায়।

অমরবাবু নারীর এই কল্যাণী—মমতাময়ী রূপকেই প্রত্যয় করেছে অপরাজিতার মধ্যে।

তার জন্যই এবাড়ির এই পরিবর্তন আসছে। তাই অমরবাবু ওই মেয়েটির কাছে কৃতজ্ঞও। সেও ওই অপরাজিতার কাছে পেয়েছে অনেক, কিন্তু কিছুই দিতে পারেনি তাকে।

তাই বলে মহামায়াকে অমরবাবু,

—ছোট বৌমাকে বিয়ের সময় কিছু দিতে পারিনি। খুব ইচ্ছা হয় একটা হার দিই।

মহামায়া কিছু বলার আগেই জগুমাসী বলে ওঠে—দেবেন বই কি অমরদা। ওদের বিয়ের বাৎসরিকী হোক—তখনই দেবেন। দেওয়াই তো উচিত।

কিরে মহামায়া ?

মহামায়াও সায় দেয় অগত্যা।

তবে তারা কর্তার ছোট বৌ-এর প্রতি এত সদয় ভাবটাকে মনে মনে আদৌ পছন্দ করে না।

আড়ালে বলে মহামায়া জগুকে—কত্তার দেখি খুব দরদ ছোট বৌ-এর উপর ?

জগু শোনায়—তাইতো দেখছি। ভুলেও তোমার নন্দন মালার খবর নেয় না।

বলে না—আপনার জন সোনার কাঠি
অপরকে দেখলে দাঁতকপাটি !

ছোট বৌমা আমার লক্ষ্মী, ছোটবৌমাকে চেন নি—চিনবে যখন তখন দাঁত কপাটি লাগবে।

সারা বাড়িটায় ওই পুজোর পর কেমন একটা থমথমে আবহাওয়া ফুটে উঠেছে।

সুজাতা দেখেছে মহামায়া—জগুমাসীর আগেকার হুঙ্কার নেই। সারা

বাড়ি কাঁপিয়ে চীৎকাও শোনা যায় না।

এদিকের মহলেও যেন শান্তি নেমেছে। আর অণি—রীনাকে অযথা কারণ অকারণে মারধোরও করে না।

সুজাতা বলে অপরাজিতাকে,

—কিরে তুই কি যাদু জানিস যে এবাড়ির চেহারাটাকেই বদলে দিলি, মানুষগুলোকেও।

অপু অবাক হয়। শুধোয় সে,—কেন?

—কেমন শান্ত হয়ে গেছে বাড়িটা। আর সেই চীৎকার চেঁচামেচি নেই। আর চন্দনকে দেখলাম যেন বদলে গেছে। ঠাকুর দেবতা সে মানেনি এতদিন। কাল ওইভাবে বসলো—আহুতি দিল। শান্তিজল নিল—

অপরাজিতা ওসব ব্যাপারকে যেন গুরুত্বই দিতে চায় না। বলে সে—ওসব হয়ত নিছক খেয়ালই। কি দাম ওসবের? আর বাড়িতে শান্ত আবহাওয়া নেমেছে বলছ বড়দি—সর্বনাশা ঝড় ওঠার আগে চারিদিক থমথমে হয়ে যায়। তাইতো ভয় হয়—আবার কোন ঝড় সাইক্লোন না ওঠে।

সুজাতা হাসে। বলে,

—তোর কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি না। তা চন্দন কিছু বললো—

—মানে?

সুজাতা বলে—কচি খুকি। তোদের এই আলাদা থাকার ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না। যা হয় ব্যবস্থা কর এবার অপু। না হয় আমিই চন্দনকে বলি এবার।

অপরাজিতা বলে,—বড়দি। তোমার যদি এত বোঝা হয়ে থাকি, বল না হয় পাশের ওই ভাড়ার ঘরেই শোব—

সুজাতা জড়িয়ে ধরে।

—পাগলী। বোঝা হতে যাবি কেন রে। ঠিক আছে এ নিয়ে কোন কথাই আর বলবো না। যা ভালো বুঝিস কর।

সেদিন সকালে এবাড়ির শান্ত আবহাওয়াটায় হঠাৎ সেই ঝড় জেগে ওঠে।

সকালে খাবার টেবিলে ব্রেকফাষ্ট সাজাচ্ছে সুজাতা। জগুমাসী এসেছে। মালাও বসেছে টেবিলে। নন্দন স্নান সেরে ঢোকে, চন্দনও এসেছে। অপরাজিতা সুজাতাকে সাহায্য করছে। কারোও টোষ্ট মাখন, কারোও

দুধ সন্দেশ, কলা এসবের যোগান দিচ্ছে। এমন সময় মহামায়া ঝড়ের মত আলুথালু বেশে ঢুকে চীৎকার করে ওঠে—ওরে জগুদি, অ নন্দন—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। কি হবে রে—সর্বস্ব চলে গেল।

অমরবাবুও এখন সকালে ব্রেকফাষ্ট করতে নামে। অমরবাবু ঢুকছিল, মহামায়াকে কপাল চাপড়ে হাহাকার করতে দেখে শুধোয়,

—কি হল আবার সাতসকালে ?

মহামায়া এবার হাহাকার করে ওঠে—আমার আলমারির সিন্দুক খুলে কে সব টাকা—তিরিশ ভরির গহনা যা ঘরে রেখেছিলাম লকার থেকে এনে—সে সব নিয়ে গেছে। লাখখানেক টাকা আর ওই গহনা সব চুরি করে গেছে।

চমকে ওঠে ওরা সকলেই। জগুমাসী এবার টেবিল ছেড়ে উঠে আরও একপর্দা উপরে গলা তুলে বলে,—ওমা কি সর্বনেশে কথা গো—ঘর থেকে লাখ লাখ টাকা—গহনা চুরে হয়ে গেল।

মহামায়া বলে,—বিশ্বাস হচ্ছে না ? চলো—দেখবে চল।

মহামায়ার ঘরেই এসেছে ওরা, সকালের খাবার রইল পড়ে। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে গেছে। তাই ওরা খাওয়া ফেলে রেখে ছুটে এসেছে এ ঘরে।

অমরবাবু ও অবাক হয়। আলমারি, সিন্দুকের তালা নাকি ঠিকই ছিল। মহামায়া সংসার খরচের টাকা বের করতে আলমারী খুলে দেখে সব সাফ। কিছুই নেই।

এতক্ষণ নন্দন চুপচাপই ছিল। এবার সে গর্জে ওঠে—চুরি বাড়িরই কেউ করেছে।

অমরবাবু শুধোয়,—কেন এটা ভাবছো ? পুলিশে খবর দাও—তারাই যা করার করবে, চোরকে ধরবেই।

নন্দন বলে—পুলিশ কিছুই করবে না। চোরকে আমিই হাতে নাতে ধরে পুলিশে দেব। সব মালও বের হবে। এত এত টাকা—আলমারি খুলে কে আর নেবে। বাড়িরই কেউ।

জগুমাসী বলে,—তাই কর যা হয়! তাড়াতাড়ি না করলে মাল সব সাবার করে দেবে, তখন ?

মহামায়া কেঁদে চলেছে।

নন্দন ধমকে ওঠে—থামো তো, এর আগেও তোমার আলমারী অন্যলোক খুলে টাকা বের করে নিয়েছে—এখন দ্যাখো মাল কোথায় আছে। এ বাড়ির

সবাই-এর জিনিষপত্র সার্চ করবো।

অপরাজিতা চুপ করেই রয়েছে। দেখছে সে ব্যাপারটা, অমরবাবু বলে, —এত টাকা, গহনা গেল কোথায় ?

নন্দন বলে—সেইটাই তো বের করতে হবে। যদু সব ঘর থেকে বাক্স, সুটকেশ এনে ফ্যালো এখানে। এসব খুঁজে দেখতে হবে। আমার বাক্স-সুটকেস-ব্রিফকেসও আনবে। সবাই দেখবে—কার বাক্স থেকে কিছু মাল বের হয় কি না।

যেন সারা বাড়িতে ঝড় উঠেছে। মহামায়ার ঘরে সবার মালপত্র এনে ফেলা হচ্ছে।

অমরবাবু বলে,—এ সব কি করছ নন্দন ? বাড়ির লোকদের নিয়ে হেনস্থা করবে অকারণে। মাল এখানে নেই।

মহামায়া ফুঁসে ওঠে আজ—তবু দেখতেই হবে। নন্দন ঠিকই করছে—ওর কাজে বাধা দিও না। যাও এখান থেকে। নন্দন—ওর ঘরটাও দেখবি, চোরের সামালদার ও নিজে কিনা সেটাও দেখা দরকার !

অমরবাবু কি বলতে গিয়ে বলে না। বের হয়ে আসে, নন্দনকে দেখছে সে।

আজ অমরবাবুর চোখের সামনে নন্দনের এই অকারণ আগ্রহটাই সন্দেহ এনেছে।

ইদানীং নন্দনের উপর কারখানার ম্যানেজ্যারকেই বসিয়েছে অমরবাবু। নন্দনের হাত থেকে অনেক দায়িত্ব সরিয়ে দিতে কারখানায় চুরিও কমেছে।

ওর টাকার দরকার। তাছাড়া অমরবাবু জানে নন্দন বড় বৌ এর হারটা অবধি নিয়ে নিয়েছে কৌশলে, ফেরৎও দেয় নি। মহামায়ার কাছ থেকে কাঁচামাল কেনার জন্য অনেক টাকা নিয়েছে সে মাল কারখানায় পৌঁছয় নি।

টাকা সেইই নিয়েছে। আর সরিয়েছে এখান থেকে। তাই তার মালপত্রও সার্চ করাতে চায়।

কিন্তু কোথায় রাখতে পারে ওই টাকা ! অমরবাবুর হঠাৎ মনে পড়ে কথাটা। টাকার লেনদেন হয় নন্দনের এক জায়গায়। সেখানে মাসে মাসে টাকা দিয়ে আসে।

ছোট বৌমাই খবরটা দিয়েছিল। বৌ বাজার অঞ্চলে কি যেন ঠিকানাটা। অমরবাবু ওর ঘরের দিকে চলে যায়, নাম ঠিকানাটা লেখা আছে সেখানেই। অমরবাবু আজ দেখতে চায় নন্দন কতদূর অবধি এগোতে পারে।

বাড়িতে তখন হৈ চৈ অনুসন্ধান চলেছে। অমরবাবু ওদিকে না গিয়ে যদুকে নিয়ে বের হয়ে যায়।

বাড়িতে তখন নন্দনের ভূত নৃত্য চলেছে। চোর সে ধরবেই, সারা ঘরে বাক্স-প্যাটরা খুলে বের করছে সে জিনিষপত্র। সকলের বাক্স-প্যাটরাই দেখা হচ্ছে।

জগুমাসীও নজর রাখছে। আসল মালের পাত্তাই নেই।

তবু বলে—সবার বাক্স-প্যাটরা দ্যাখ মাল যাবে কোথায়? ডানা গজিয়ে উড়ে তো যাবে না। জয় রাধে!

অপরাজিতার একটা সুটকেশ আছে—ঘরের কোণে সেটা এমনিই খোলা পড়ে থাকে।'

অপুর সম্পত্তি বলতে কয়েকখানা শাড়ি-জামা-আর গহণা; তার গায়েই যৎসামান্য যা আছে। আর কোন সঞ্চয় তার নেই। প্রয়োজনও নেই।

—এটা কার সুটকেশ?

নন্দন জেরা করতে অপু বলে,—আমার, দেখুন ওটাও।

—দেখবোই তো। নন্দন গর্জায়। আর তারপরই সুটকেসটা উলটে দিতে তার থেকে বের হয় মহামায়ার গহনার বাক্সটা। আখরোট কাজ করা বাক্স—

—একি!

চমকে ওঠে মহামায়া।

শুধু মহামায়াই নয় অপরাপিতা চমকে উঠেছে তার সুটকেশে ওই বাক্সটা দেখে।

সেইই বলে—ওটা আমার ওখানে গেল কি করে?

জগুমাসী এবার মারমূর্তি ধরেছে। বলে সে—তা তুমিই ভালো জানো বাছা, অ মহামায়া—মহামায়া তখন বাক্সটা খুলে দেখছে গহনা কি আছে। আর তাই দেখে মহামায়া এবার এসে অপরাজিতাকেই ধরেছে।

—মাত্র একটা বালা পড়ে আছে। বাকী সব গহনা কোথায় রেখেছিস বল মুখপুড়ি। কোথায় রেখেছিস?

অপরাজিতা বলে—বিশ্বাস করুন, এসবের কিছুই জানি না। আমার সুটকেস খোলাই পড়ে থাকে। কে আমাকে চোর সাজাবার জন্যই ওখানে ওটা রেখেছে।

জগুমাসী এবার শোনায়—ন্যাকা। কচি খুকী তুমি, তোমার বাক্সে

গহনা কেউ রেখে যাবে। আহা—কি মেয়ে গা। তখনই বলেছিলাম মহামায়া —হা ভেতের ঘরের মেয়েছেলে বলে কৌশলে চন্দনের মত সোনার চাঁদকে এত বড় বদনাম দিয়ে জেল পুলিশের ভয় দেখিয়ে এ বাড়িতে ঢুকলো জোর করে।

মতলবটা তখন বুঝি নি, এবার বুঝেছিস তো—এ বাড়িতে ডাকাতি করে সরে পড়ার মতলবেই এসেছিল। তা বাছা ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। দেখলে তো—পার পেলে না।

অপরাজিতা বলে,—বিশ্বাস করুন মা—মাসীমা, আমি এ সবের কিছুই জানি না। জিজ্ঞাসা করুন বড়দিকে—

সুজাতা এককোণে পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। সব ব্যাপারটাই মনে হয় তার কাছে কোন দুঃস্বপ্নই, ভাবতেও পারে না সে, এসব ঘটল কি করে।

অপরাজিতা—নিশ্চয়ই এ সবের কিছু জানে না। তাদের ঘরও খোলাই পড়ে থাকে—সুটকেসও। কথাটা ঠিকই বলছে অপু।

সুজাতা বলে,—মা, মাসীমা অপু এসব করেনি—

জগুমাসী বলে ওঠে—চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। তুমিও কখনও—দুজনে সাট করে চুরি করেছো কিনা কে জানে।

মহামায়া বলে,—হা ভেতের ঘরের মেয়েটা সেদিন জোর করে চাবি নিয়ে আলমারী খুলে এত টাকা গহনা সব দেখেছিল—তারপরই এই কাণ্ড ঘটলো। কই আগে তো হয়নি চুরি—তারপরই হ'ল কেন?

নন্দন বলে—পুলিশে খবর দিই। বাকী খবর ওরাই থানায় নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে বের করবে চোরের কাছ থেকে।

জগুমাসী বলে—ঘরের বৌ চোর! ওমা! কালে কালে হ'ল কি! এ যে কালকেউটে একে নিয়ে ঘর করলে কোনদিন আমাদেরই বিষ ছোবল মারবে। ও মহামায়া—চোরের বিহিত কর।

চন্দন সবই শুনেছে চুরির খবর।

নিজেই বের হয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবই দেখছিল, শুনছিল।

নন্দন তার সুটকেশ—আলমারীও দেখে গেছে।

চন্দন এতে খুশী হয়নি। কিন্তু না দেখালে হয়তো ওরা তাকেই চোর ভাবতো তাই দেখিয়েছে চন্দন, কোন চোরের জন্য তাদেরও অপমানিত হতে হয়েছে। তাই আসল চোরকে পাওয়া যায় কিনা সেটার সম্বন্ধেও কিছু কৌতূহল ছিল চন্দনের।

তাই সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনছিল ওদের কথাবার্তা। হঠাৎ চোরকে ও

ধরেছে তারা হাতে নাতে। চন্দন চমকে ওঠে।

ওই অপরাজিতার সুটকেশেই পাওয়া গেছে চোরাই গহনার কিছু। বাকীটা সেই-ই কোথায় সরিয়েছে। হাতে নাতে ধরা পড়েছে—সুতরাং অপরাজিতারও স্বপক্ষে তেমন কিছু বলার নেই।

নিজেকে নির্দোষই বলছে সে।

কিন্তু চন্দন, জগুমাসী—মহামায়া আজ তাকে সাজা দেবেই। পুলিশেই দেবে।

অপরাজিতা পুলিশের কথা শুনে চমকে উঠেছে। অফিসার তরুণ ঘোষাল তাকে চেনে—তার সামনে এই চুরির অপবাদ নিয়ে দাঁড়াতে তার মাথা নীচু হয়ে যাবে। তাই বলে অপরাজিতা,

—বিশ্বাস করুন—চুরি আমি করিনি! এসব আপনাদের মিথ্যা ষড়যন্ত্র—

এবার এসে পড়েছে চন্দন।

সে দেখে ওই বলাটা—শূন্য গহনার বাক্স অপরাজিতার সুটকেশে, চন্দন ভাবতে পারেনি যে অপরাজিতা এমনি জঘন্য কাজ করবে।

তার সব ধারণাই আজ বদলে যায়।

চন্দনের মনে হয় অপরাজিতা সব অপমান সয়েও এ বাড়ির বৌ হয়ে এসেছিল এমনি কোনও চরম আঘাতই দিতে। আর দিয়েছিল ও, এত টাকা গহনা চুরি করেই সরে যেত, কিন্তু পারেনি। ধরা পড়ে গিয়ে নিজে সাধু সেজে এদের ষড়যন্ত্র বলে চালাতে চায়।

জগুমাসী বলে—দ্যাখ চন্দন—চোরের মায়ের বড় গলা। এমন মেয়ে ঘরে আনলি—চোর। গরীবের ঘরের মেয়ে—টাকা গহনার লোভ সামলাতে পারল না—

—না! চুরি আমি করিনি। এসব মিথ্যা—মিথ্যা বদনাম দিতে চান, অপরাজিতা গলা তুলে জবাব দেবার চেষ্টা করে।

চন্দনের কাছে এটা অসহ্য বলেই মনে হয়।

সে অপরাজিতার গালেই সশব্দে চড় কষিয়ে দিয়ে গর্জে ওঠে।—চুরি করে চোখ রাঙানো হচ্ছে? ছোটলোক—ইতর—চোর তুমি।

অপরাজিতা এতক্ষণ মাথা তুলে তেজদৃপ্ত ভঙ্গীতেই জবাব দিচ্ছিল। ভেবেছিল অন্ততঃ চন্দন তাকে সমর্থন করবে!

কিন্তু তাতো করেই নি, উলটে তার গালেই চড় মেরেছে সারা বাড়ির লোকজনের সামনে।

অপরাজিতা হতচকিত চাহনিতে দেখছে চন্দনকে। রাগে অপমানে বেদনায় কাঁপছে সে। এবার আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলে কান্নাভিজে স্বরে চন্দনকে,--তুমি - তুমি আমাকে মারলে! অবিশ্বাস করলে— ?

চন্দন গর্জায়—হ্যাঁ! চোর তুমিই। আর সেই চোরের বদনাম তোমাকে পেতেই হবে। যে পুলিশের সামনে মাথা তুলে তোমার সতীত্বের জন্য লড়েছিলে—তারাও জানবে আসলে তুমি চোর—।

চমকে ওঠে সুজাতা—কি নীরব বেদনায় সে মুচড়ে ওঠে।

অণি--রীণা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তারাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বলে তারা,—কাকীমা চোর নয়—না! না কাকু!

কাঁদছে অপরাজিতা। বলে সে চন্দনকে,

—এমনি করে মিথ্যা অপবাদ দেবে আমাকে—অপমান করবে ?

জগমাসী ফোঁড়ন কাটে,--সতীপনা দ্যাখো—চোর মেয়েটার! অ চন্দন—ডাক কর্তাবাবুকে··

এ বাড়ির কর্তা অমরবাবু ততক্ষণে ঠিকানা বের করে যদুকে সঙ্গে নিয়ে এসে পড়েছে রীমাবাঈ-এর বাড়িতে।

রীমাবাঈ বসার ঘরে ঢুকে বয়স্ক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে দেখে একটু অবাক হয়। কারণ তার এখানে এই বয়সী কেউ আসে না। তাই শুধোয়—আপনি!

অমরবাবু বলে—আমাকে তুমি চিনবে না মা।

মা ডাক শুনে রীমা একটু অবাক হয়।

অমরবাবু বলে,--নন্দনকে চেনো! একদিন বালিগঞ্জে ওর বাড়িতেই গেছলে। আমি নন্দনবাবুর আত্মীয়ই বলতে পারো।

—নন্দনবাবু!

রীমা ওই নামটা শুনেই চমকে ওঠে। নন্দনকে সে ভালো করেই চেনে।

অমরবাবু বলে,—তুমি আমার মেয়ের মত তাই পুলিশে না গিয়ে তোমার সম্মানের কথা ভেবেই এখানে প্রথমে এসেছি। অবশ্য তুমি যদি সহযোগিতা না করো —পুলিশেই যেতে হবে।

-কেন বলুন তো ? রীমা অবাক হয়।

অমরবাবু বলে—আমার বাড়ির মান সম্মানও জড়িত। নন্দন আমারই আশ্রিত। কিছুদিন ধরে তার সম্বন্ধে নানা বাজে খবর পাচ্ছি। সে তোমার

এখানে আসে—কি সব বেআইনী জিনিষের লেন দেন করে শুনেছি। রীমা চুপ করে থাকে।

বেশ বুঝেছে নন্দন সেখানেও কিছু করেছে। তাকেও জড়িয়ে দিয়েছে।

অমরবাবু বলে—কাল আমার বাড়ি থেকে লাখখানেক টাকা আর কিছু গহনা চুরি গেছে—আমার বিশ্বাস এ নন্দনেরই কাজ।

হঠাৎ রীমার গলায় সাত-নরী-হারটা দেখে চাইলো অমরবাবু। ওই হারটাও তার চেনা।

বড়বৌমাকে সে বিয়েতে ছেলের হাতে ওই হার পেঁাছে দিয়ে ছিল। তাই শুধোয় অমরবাবু।

—ওই হারটা নন্দন তোমায় দিয়েছে, না?

রীমা মাথা নাড়ে। বৃদ্ধের কথার প্রতিবাদ করার শক্তিও যেন তার নেই।

অমরবাবু বলে—ও হার আমার বড়বৌমার।

এটা মিথ্যা কথা বলে নন্দন তার কাছ থেকে নিয়েছিল। বেচারার শেষ সম্বল—স্বামীর স্মৃতি। সেটুকুও কেড়ে নিয়েছিল সে।

রীমা আজ নন্দনকে চেনে নতুন করে।

বলে রীমা—এত বড় শয়তান ওই নন্দন!

অমরবাবু বলে,—আমার মনে হয় চুরি যাওয়া মাল সে তোমাকে সব কথা না জানিয়ে এখানেই রেখে গেছে। যদি থাকে—দাও মা। নাহলে আমাকে এখান থেকেই পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে এ বাড়ি সার্চ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

তাতে তোমাকে পুলিশ এ্যারেষ্ট করে চুরির দায়ে জেলে পুরবে। তা আমিও চাই না মা।

তাই বলছিলাম যদি সহযোগিতা করতে বড় ভালো হতো।

রীমা কি ভাবছে। নন্দন যে এতবড় শয়তান—তারই আশ্রয়দাতার এতবড় সর্বনাশ করতে পারে তা জানা ছিল না। এখন পুলিশের হাঙ্গামায় পড়লে কেঁচো খুড়তে সাপ বের হবে।

কারণ রীমার ঘরে বেশ কিছু বেআইনী নেশার জিনিষও পাবে পুলিশ। তাতে বিপদই বাড়বে।

তাই রীমা বলে—আসছি।

অমরবাবু দেখছেন ওর ঘর এবং আসবাব। বেশ দামী আসবাবই। যদুও

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

রীমাবাঈ ভিতর থেকে ব্রিফকেস একটা নিয়ে ঢোকে। বলে সে অমরবাবুকে,

—কাল রাতে নন্দনবাবু এসে এটা রেখে গেছেন, কি আছে এর মধ্যে জানি না। দেখুন যদি আপনাদের মালপত্র থাকে।

তালাবন্ধও ছিল না সেটা।

চাপ দিতেই খুলে যায় আর দেখে তার ভিতরে ওই টাকা গহনাপত্রই রয়েছে।

অমরবাবু বলে—এই তো সব রয়েছে এতে!

রীমা বলে—আমি জানতাম না যে এসব চোরাইমাল, বিশ্বাস করুন।

অমরবাবু বলে—তোমাকে বিশ্বাস করি মা। মানুষ চিনতে ভুল করি না। আজ তুমি সত্যি আমার সম্মান রেখেছো মা। বাড়িতে কি হচ্ছে এখন কে জানে! এখুনিই ফিরতে হবে।

রীমা বলে—আমি এসব ওই নন্দনের মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসতে চাই।

অমরবাবু বলে—তাই হবে মা।

অমরবাবুর বাড়িতে তখন চোরকে নিয়ে কি করা যায় তারই জোর আলোচনা সুরু হয়েছে।

অপরাজিতার চোখে জল।

চন্দন ক্ষুব্ধ।

নন্দন বলে—আর গায়ে হাত দিসনি। পুলিশেই খবর দিই ওরা চোরকে তুলে নিয়ে যাক।

অপরাজিতা তবু বলে—আমি চোর নই—

—হাতে নাতে ধরেছি চোর নও? নন্দন ধমকে ওঠে।

এমন সময় ঢুকছে অমরবাবু।

ওকে দেখেই নন্দন সুটকেশের থেকে পাওয়া গহনার বাক্স আর একটা বালা দেখিয়ে বলে,

—দেখুন, চোর কে? আপনার ছোট বউমাই চোর—

অমরবাবু দেখছে নন্দনকে।

অপরাজিতার চোখে জল—গালে চড়ের দাগও লাল হয়ে ফুটে আছে।

চন্দন বলে—ওইই চোর। নন্দন ঠিক ধরেছে।

অমরবাবু বলে—একটা বালা তো দেখছি—অন্যটা কোথায় নন্দন ?

নন্দন বলে—সেটা ওইই জানে, শুধোন ওকে।

অপরাজিতা কান্নাভিজে স্বরে বলে,

—বাবা, বিশ্বাস করুন আমি এসব করিনি। এসব মিথ্যা ষড়যন্ত্র।

চন্দন ধমকে ওঠে—চুপ করো।

অমরবাবু বলে—ওকে চুপ করাতে পারলেও আমাকে চুপ করাতে পারবি না চন্দন। চোর কে তা আমি ধরেছি। ওই হারানো বালার অন্যটাও পেয়েছি। সব গহনা—চুরি যাওয়া টাকাও পেয়েছি।

মহামায়া বলে—কোথায় পেলে ? কে চুরি করেছিল—ওই মেয়েটা ?

জগুমাসী ফোড়ন কাটে, —নয়তো আবার কে ? তাড়াও এবার মেয়েটাকে।

নন্দন বলে—পুলিশেই দেব।

অমরবাবু এবার যেন একটা বোমাই ফাটিয়েছে।

বলে সে,—তাহলে তোমাকেই জেলে পাঠাতে হয় নন্দন।

চমকে ওঠে নন্দন!

—কি বলছেন আপনি ?

অমরবাবু বলে,—আমি বলছি না, যার কাছে চোরাই মাল রেখেছিলে সেই-ই বলবে সব কথা।

সারা ঘরে স্তব্ধতা নামে।

অমরবাবু বলে,—যদু, ডাক ওকে।

ডাকতে হয় না, রীমা নিজেই এসে ঢোকে।

ওকে দেখেই চমকে ওঠে নন্দন। অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে,

—তুমি! রীমা—

রীমা বলে,—বলিনি সেদিন গেটের বাইরে থেকে যাচ্ছি, দরকার হলে অন্দর মহলেও আসবো ? আজ তাই আসতে হয়েছে তোমার গুণের কথা প্রমাণ দিয়ে জানাতে। কাল তুমি এই ব্রিফকেস আমার ওখানে রেখে এসেছিলে। এ বাড়ির এত টাকা গহনা চুরি করে তাতে রেখেছিলে আর সেই চুরির দায়ে আমাকে তো বটেই এ বাড়ির বৌকেও ফাঁসিয়ে মিথ্যা বদনাম দিয়ে চোর সাজাতে চেয়েছিলে। ছিঃ ছিঃ নন্দনবাবু!

নন্দন বিড়বিড় করে কি বলার চেষ্টা করে।

চন্দন চমকে ওঠে।

রীমাবাঈ ব্রিফকেস ভর্তি টাকা গহনাগুলো অমরবাবুকে দিয়ে বলে,

—দেখে নিন মালপত্র।

নন্দনের দিকে এগিয়ে এসে বলে,

—আমাকে হার দিয়েছিলে জন্মদিনে তাও আর এক অসহায় মেয়েকে ঠকিয়ে। ছিঃ! নাও তোমার হার!

সুজাতা অবাক হয় হারটা দেখে,

—এটা আমার।

রীমা বলে,—নিন দিদি। আগুনে শুদ্ধ করে নেবেন। অপবিত্র আমি—আমার গলাতে ছিল ওটা।

অপরাজিতা দেখছে মেয়েটিকে।

আজ ওই মেয়েটিই তাকে চরম অপমানের, কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

বলে অপরাজিতা রীমাকে,

দিদি—আজ তুমিই আমার মুখ রেখেছো—নাহলে এ বাড়ির সবাই জানতো আমিই চোর। ওরা চক্রান্ত করে আমাকে চোর সাজাবার ব্যবস্থাই করেছিল। আমার স্বামীও বিশ্বাস করেছিল ওদের কথায়—ভেবেছিল আমিই চোর। শাস্তিও দিত, চরম শাস্তি। আজ সেই কলঙ্ক থেকে তুমি আমাকে বাঁচালে ভাই। নাহলে মরা ছাড়া আমার কোন পথই ছিল না।

রীমাবাঈ বলে অপরাজিতাকে—এসব কথা বলে আমাকে অপরাধী করো না ভাই। আমাদের অপরাধের সীমা নেই তা জানি—কিন্তু এত বড় শয়তান এখনও হইনি।

রীমা এগিয়ে গিয়ে নন্দনকে বলে,—তোমার মত শয়তান আমি দেখিনি নন্দনবাবু, আমরা দেহ বিক্রী করি, লোকের মনোরঞ্জন করে পয়সা নিই, কিন্তু ঘরে বৌদের ইজ্জত দিই—তুমি এতবড় অমানুষ যে সেটুকু দিতেও ভুলে গেছ।

নন্দন গর্জে ওঠে—বেইমান মেয়েছেলে সতীপনা দেখাতে এসেছো এখানে?

—না তোমার মত শয়তানের মুখোস খুলে দিতে এসেছি। আর বলতে এসেছি—তুমি কোনদিন আমার ওখানে যাবে না। আমার পায়ের ঘুঙুর

তোমার জন্য আর কোনদিনই বাজবে না—তোমার মত অসুরের জন্য আমার সুরও বেরুবে না।

চলে যায় রীমাবাঈ, নন্দনের মুখের উপর কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে।

নন্দন বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। সারা ঘরের মানুষগুলো স্তব্ধ হয়ে গেছে। নন্দনের সব তেজ দাপট নিঃশেষ, জগন্নাসীও মিইয়ে গেছে।

মহামায়া এবার ছেলেকে বলে, শেষে তুই চুরি করলি আমার আলমারী থেকে এইসব টাকা-গহনা, কেন? কেন? তোকে কি দিইনি? যত টাকা চেয়েছিলি দিয়েছি—সর্বস্ব পোতিস তুই হিসাব করে চলতে পারলে—

চন্দন শুনছে কথাগুলো। আজ এ বাড়ির মানুষগুলোকে নতুন করে চিনছে সে।

মহামায়া বলে নন্দনকে,—কিন্তু এত নীচ, এত লোভী তুই শেষে চুরি করলি—নিজে চোর হয়ে চোরের বদনাম দিলি আর একজনকে। দেখলি তো—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে!

চন্দন আজ নিজেই লজ্জা পায়। এ বাড়ির ছেলে হয়ে বাবার পাশে দাঁড়ায় নি। ব্যবসাপত্রও দেখেনি। ফলে ওই পরগাছা নন্দনই এ বাড়িতে লুটপাট চালিয়েছে। এ বাড়ির বৌ ওই অপরাজিতাকে সরাবার জন্য চোরের বদনাম দিয়ে অপমান করেছে, আর চন্দন স্বামী হয়ে তার স্ত্রীকে এতবড় মিথ্যা অপবাদের হাত থেকে বাঁচাতে পাবে নি বরং তার গায়েও হাত তুলেছে। সকলের সামনে নিরাপরাধ স্ত্রীর গালে চড় মেরেছে চন্দন। সেই চড়টা যেন এবার তার গালেই ফিরে এসে বাজছে।

ওদিকে অপরাজিতা এবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। সে ভাবছে, জবাবটা এবার দেবে ওই ষড়যন্ত্রকারীদের কিন্তু অমরবাবু বলেন মহামায়াকে,—তোমার সংসার কি ভাবে চলছে দেখ। কমাসেই কত উন্নতি হয়েছে। নন্দন, তোমাকে কঠিন শাস্তিই দিতাম। এই সংসারের, আমাদের সকলের তুমি নানাভাবে অনেক ক্ষতিই করেছো, ঘরের বৌকে চোর বানাতে গেছলে—তোমাকে শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি, নিজেকে সামলাবার শোধরাবার চেষ্টা করো, নাহলে এ বাড়িতে তোমার ঠাঁই হবে না।

নন্দন মাথা নীচু করে শুনছে কথাগুলো।

অমরবাবু এবার অপরাজিতাকে বলেন,—তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাইবার মুখও রাখেনি মা আমার যোগ্য গুণধর সন্তান। আজ সে তোমার গায়েও হাত তুলেছে, কোন বিচার বিবেচনা না করে অর্বাচীনের মত।

চন্দন চুপ করে থাকে।

অমরবাবু বলেন—ঘরের লক্ষ্মীর যেখানে অপমান হয় সেখানে লক্ষ্মীশ্রীও থাকে না। আমি তোমার কাছে ওর হয়ে মাপ চাইছি মা—

অপরাজিতা বলে—না—না বাবা। আমি কিছুই মনে রাখিনি। উত্তেজনার বশে একটা কাজ করে ফেলেছে—ও নিয়ে ক্ষমা চেয়ে আমাকে অপরাধী করবেন না বাবা। চলুন—ঘরে চলুন। সকাল থেকে আপনার ওপরও ঝড় বয়ে গেছে। কিছু খাওয়াও হয় নি, চলুন—।

ওঁকে নিয়ে চলে যায় অপরাজিতা।

চন্দন মাথা নীচু করে নিজের ঘরে চলে গেল নন্দনের দিকে তীক্ষ্ম চাহনি মেলে দেখে।

ওরা চলে যেতে এবার মহামায়ার রাগটা যেন ফেটে পড়ে। এগিয়ে এসে নন্দনের গালে সপাটে চড় কসে গর্জায় মহামায়া।

—এ কি করলি হতভাগা।

জগুমাসী অবাক হয় মহামায়ার রাগের প্রকাশ দেখে। কিছু বলতে পারে না। জানে এ সময় কথা বললে মহামায়া তাকেও ছাড়বে না।

তাই হিসাবী জগুমাসী চুপ করেই রইল। আপশোষ হয়, নন্দন কৌশলটা ভালোই করেছিল। পথের কাঁটাকে তুলে ফেলে দেবার পথে এইটাই ছিল বেশ মজবুত পথ।

কিন্তু তাও যে ওই অমরবাবু এইভাবে ভেস্তে দেবে তা ভাবেনি জগুমাসী।

নন্দনও ভাবতে পারে নি যে তার মোক্ষম চালটা এই ভাবে হাতে নাতে ধরে ফেলবে অমরবাবু। ঝড় যখন ওঠে তখন প্রকৃতির বুকে চলে তছনছ কাণ্ড। ওলটপালট শুরু হয়।

তারপর বৃষ্টির ধারাস্নানের পর নামে শুদ্ধতা।

সবকিছুর পালা যেন শেষ হয়ে গেছে।

ওই ঘটনার পর সারা বাড়িতে একটা স্তব্ধতা নেমেছে। নন্দন ওই কঠিন ধাক্কাটা সামলে নেবার চেষ্টা করে দুএকদিন চুপচাপ থেকে, খাওয়া দাওয়াতেও তেমন রুচি নেই।

জগুমাসী বলে,—ওসব ভাবনা ছেড়ে দে নন্দন। ওই মেয়েটা সাংঘাতিক, দেখলিতো কেমন করে সব ওলটপালট করে দিল।

নন্দন বলে,—কিন্তু অপরাজিতা কি করে জানলো রীমাবাঈএর সন্ধান?

জগ্‌ন বলে—তাতো জানি না বাবা। অমরদাই বা এসব জানলো কি করে?

নন্দন কি ভাবছে। বলে সে,—হারামজাদা রবিটা মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসে। রীমাকে সেইই একদিন এ বাড়িতে এনেছিল।

জাগ্‌নমাসী বলে,—সাক্ষীসাব্‌দ রেখে এসব করে! এখন কি সর্বনাশ হল বলতো।

নন্দন বলে—আমার জানা দরকার কে এ খবর দিয়েছে। তাকে আমি ছাড়বো না।

নন্দন রীমাবাঈএর ওখানে গেছে। দোতলায় উঠে, ওদিকে রীমার রেওয়াজের ঘর। রোজ ভোর থেকে রীমাবাঈ রেওয়াজ করতে বসে। সেদিক থেকে সে তার সাধনায় কোন ত্রুটি রাখে না।

রবি আগে নন্দনের ব্যবসাতেই কাজ করতো। অবশ্য সে কোম্পানীর ষ্টাফ নয়। সে ছিল নন্দনের খাস কর্মচারী। কোম্পানীর লেবেল লাগিয়ে হেরোইন পাচার করতো। টাকা কড়ি আদায় করতো।

বেশ চলছিল ব্যবসাটা।

কিন্তু নন্দন অন্ধকারের মহাজনের টাকা বেশ কিছ্‌ন বাকী ফেলতে সেই কারবারও বন্ধ হয়ে গেল নন্দনের। ফলে রবিও বেকার।

তাই রবি এখন রীমাবাঈ-এর এখানেই থাকে। আর ওর অন্ধকারের ব্যবসা পত্র দেখে, বড় পার্টি এলে সামলায়। টাকা-কড়ির কথা বলে রীমা-বাঈ-এর হয়ে।

ম্‌নজরো ধরতে পারলে কিছ্‌ন কমিশনও পায়। স্‌নতরাং রবি এখন রীমা-বাঈ-এরই বেশী অন্‌নগত।

রবিও সেই ঘটনার নীরব সাক্ষী। সে দেখেছিল নন্দনবাব্‌নর সব কীর্তি-কলাপই। আর শ্‌ননেছিল রীমার কথাগ্‌নলো।

নন্দনকে সে এখানে আসতে নিষেধ করেছে।

রীমা বাঈজী হলেও তার কথার নড়বড় হয় না তা জানে রবি।

তাই আজ নন্দনকে আবার এ বাড়িতে আসতে দেখে বলে,

—আপনি!

নন্দন দেখে ওকে। এগিয়ে ভিতরে যাবে আগেকার মতই। কিন্তু আজ সেই অধিকার সে হারিয়েছে। তাই রবিই বাধা দেয়।

—এখন ভিতরে যাবেন না নন্দনবাব্‌ন।

নন্দন শ্লেষভরা কণ্ঠে বলে ওঠে,

—কেন রে ? তোর রীমাবাঈ কি সাতসকালেই মুজরো বসিয়েছে ? পথ ছাড়, দেখি বাঈকে—

রবি বলে,—না আপনি ভিতরে যাবেন না। হুকুম নেই।

এবার রুখে ওঠে নন্দন এই অপমানে। বলে সে,—মানে ?

রবি বলে,—রীমাবাঈ-এর সঙ্গে দেখা হবে না।

নন্দন দপ করে জ্বলে উঠতে গিয়ে থামলো। শুধায় সে,—কেন ?

রবি বলে—তা জানি না। তবে দেখা হবে না বাঈ-এর সঙ্গে।

নন্দন চটে ওঠে,—বাঈকে দরকার নাই, তোকেই দরকার। ব্যাটা বেইমান—আমার খেয়ে আমার পিছনে লাগবি ? কেন—কেন খবর দিয়েছিলি আমাদের বাড়িতে—রীমা বাঈ-এর খবর ?

রবির মনে পড়ে সেই আগেকার কথা।

নন্দনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ফিরছে পথে ধরেছিল ওকে ও বাড়ির বৌ। আর তার ধমকে সেদিন রবি রীমাবাঈ-এর খবরটা জানিয়েছিল।

—জবাব দে! না হলে শেষই করবো তোকে। কেউ বাঁচাতে পারবে না।

রবি জানে নন্দন তাও করতে পারে এখন। কালকের ওই ঘটনার পর নন্দন হিংস্র হয়ে উঠেছে।

বাঘের মুখ থেকে শিকার কেড়ে নিলে বাঘও অমনি হিংস্র হয়ে ওঠে। রবির কলার চেপে ধরে গর্জায় নন্দন,

—জবাব দে, নাহলে ছাদ থেকে ফেলে দেব তোকে।

শীর্ণ দেহ রবির ; ভয় পায়—ছাদ থেকে ফেলে দিলে সে আর বাঁচবে না। তাই বলে ভয়ে ভয়ে,

—বিশ্বাস করো বস্—আমি বলতে চাইনি। তোমাদের বাড়ির ওই নতুন বৌ পুলিশের ভয় দেখাতে সব বলে দিয়েছি—রীমাবাঈ-এর ব্যাপার।

চমকে ওঠে নন্দন,—সেকি! ওই মেয়েটা এসব জেনেছে ?

এবার নন্দন বুঝেছে কালকের আক্রমণের জবাবে অপরাজিতাই অমরবাবুকে এই খবর দিয়েছিল। কাল অমরবাবু তাই শাসিয়েছে তাকে—ফের কোন গোলমাল দেখলে নন্দনকে বের করে দেবে। স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে ওই বাড়ির বিলাস-ব্যাসন ছেড়ে পথেই নামতে হবে তাকে ওই মেয়েটার জন্য।

নন্দন রবিকে ছেড়ে দেয়। বের হয়ে আসে সে।

রবিও ছাড়া পেয়ে যেন বাঁচলো এবারের মত।

বড় বাড়িটায় কিছুটা শান্তির পরিবেশ ফিরে আসছে। ঝড় ফিরে যাবার পর এমনি স্তব্ধতাই নামে।

অমরবাবু এখন ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছেন। এখনও অফিসে বের হচ্ছেন না। অপরাজিতা এর মধ্যে ডাঃ সেনকে ডেকে এনে চেকআপ করায়।

অমরবাবু বলে,—তোমার দেখি যত ভাবনা আমাকে নিয়ে। আমি তো ভালো হয়ে উঠছি। কি বল ডাক্তার?

ডাঃ সেন বলেন পরীক্ষা করে,

—হ্যাঁ। আপনি তো এখন ভালোই আছেন।

অমরবাবু বলে,—তাহলে অফিস বের হতে পারি? অনেক কাজ পড়ে আছে।

অপরাজিতা চাইল ডাঃ সেনের দিকে। মনে হয় ডাঃ সেন অমরবাবুকে বাইরে যাবার অনুমতি দেবেন।

কিন্তু ডাঃ সেন বলেন,

—আর সপ্তাহ খানেক বিশ্রাম নেন। তারপর অফিস বের হবেন, প্রথম সপ্তাহে দুঘণ্টা করে। তারপর এক ঘণ্টা করে বাড়াবেন প্রতি সপ্তাহে। আজ চলি।

অপরাজিতা বলে,—বাবা স্নান করে নেন, খাবার সময় হয়ে গেছে।

অমরবাবু বলে, ঘড়ি ধরে খাইয়ে দেখছি অভ্যাস খারাপ করছো আমার।

হাসে অপরাজিতা।

জগুমাসী জানে নন্দনের মনের অবস্থাটা। মহামায়াও সেদিনের ঘটনার পর বুঝেছে কর্তা এবার সুস্থ হয়ে উঠলেই আর এক নাটক সুরু হবে।

সেদিন নন্দনকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিল অমরবাবু, যে তাকে দরকার হলে বেরই করে দেবে।

নন্দনকে নিয়েই সমস্যা হয়েছে তার। বলে মহামায়া নন্দনকে,

—এখন চুপচাপ থাক। কোন গড়বড় করিস না। শুনলি তো কর্তার কথা। তোকে বেরই করে দেবে গোলমাল করলে।

নন্দন চুপ করেই থাকে।

মহামায়া বলে,—কথাটা মনে রাখিস বাবা।

মহামায়াও ভয় পেয়ে গেছে এখন।

নন্দন কিন্তু চুপ করে এতবড় অবিচারটাকে মেনে নেবে না। সে এর জবাব দেবেই।

তাই মৌকা খুঁজছে নন্দন। সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে।

জগুমাসী ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারেনি।

বলে সে—কর্তা আর ছোট বৌমা দুজনেই তোকে এবার টাইট করে দেবে নন্দন।

নন্দন বলে—ওই ছোট বৌকে আমি ছাড়বো না।

জগুমাসী বলে—কিন্তু কি করবি?

নন্দন ভাবছে কথাটা।

এখন অফিস—কারখানতেও তার সেই দায়িত্ব নেই। অমরবাবু এখন ম্যানেজারকেই সব ভার দিয়েছে। আরও জেনেছে নন্দন, অমরবাবু তার সরানো রেকর্ড-ফাইল—কাগজপত্র ঘাঁটছে চুরির পরিমাণ সঠিক জানতে। তারপর তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

ওই ছোট বৌ দুপুরে কর্তার ঘরে বসে সেই কাজ করছে। তার মৃত্যুবাণ তৈরী করছে। তার আগেই শেষ করতেই হবে ওই অপরাজিতাকে।

নন্দন চুপ করে এতবড় অপমান সহ্য করবে না।

কিন্তু কি করে এই চরম অপমানের প্রতিশোধ নেবে তাও ভেবে কুল-কিনারা করতে পারে না।

কাজে বের হবার তাগিদও নেই নন্দনের। কারণ কাজের নাম করে লুণ্ঠনপর্বও বন্ধ হয়ে গেছে।

মালা কিছুদিন ধরে দেখছে স্বামীকে।

দিনরাত বাইরে বাইরে থাকতো যে মানুষ, ফিরতো অনেক রাতে মদ্যপ অবস্থায়, কথা বলার সময়ও থাকত না। সেই মানুষটা একেবারে বদলে গেছে, দিনরাত চুপচাপ থাকে। বাড়িতেই মদ গিলে বেহুঁস হয়ে থাকতে চায়।

মালার এসব ভালো লাগে না।

মালা বলে,—এসব কি করছ ঘরে বসে। দিনভোর মদ খাবে—ছিঃ ছিঃ, কাজকর্ম নেই?

নন্দন স্ত্রীর দিকে চাইল, কোন জবাব দেয় না।

মালা তাড়া দেয়—কি হল জবাব দিচ্ছ না যে?

নন্দনের রাগটা চড়ছে ক্রমশঃ। ওই স্বার্থপর মেয়েটার জন্যও কত কি করেছে! আজ সেই-ই নন্দনের কাজের জবাব চায়। সেদিন ও একটা হার দিলে ওই সুজাতার হারটা নিতে হতো না। নন্দন অন্ততঃ একটা কেলেঙ্কারীর হাত থেকে বাঁচতো।

কিন্তু তাও দেয়নি মেয়েটা। অথচ নিয়েছে অনেক।

আজ সেই পাওয়ায় টান পড়তেই মালার স্বার্থপর মন কঠিন হয়ে উঠেছে। ও স্বামীর কথা একবারও ভাবেনি।

মালা শোনায়,—কি হ'ল! জবাব দেবে না? তাহলে এসবেরও নিকুচি করছি।

রাগের বশে মালা টেবিল থেকে বোতল গ্লাসটা মেজেতে ফেলে দেয়, সেগুলো সশব্দে চুরমার হয়ে যেতেই এবার নন্দন লাফ দিয়ে উঠে সামনে জগুমাসীর লাঠিটা দেখে ওটা নিয়েই মালার পিঠে সজোরে এক ঘা বসিয়ে দিতে মালা আর্তনাদ করে ওঠে।

আবার মারতে যাবে—ভয়ে চীৎকার করছে মালা।

জগুমাসী ছুটে এসে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে বলে নন্দনকে—

—আবার বৌটাকে মারছিস ওইসব ছাই ভস্ম গিলে? এখুনি কর্তার কানে গেলে তোকেই তাড়াবে! থাম থাম বলছি।

লাঠিটা কেড়ে নিয়ে মালাকে বলে জগুমাসী—থামো বাছা। স্বোয়ামী না হয় একঘা মেরেছে তাতে এমন কিছু ভাগবত অশুদ্ধ হয়নি। পাড়া মাৎ করো না।

মালা চুপচাপ চলে যায় মুখ ভার করে। নন্দন উঠে পড়েছে। তারও মন মেজাজ ভালো নেই।

প্যাণ্টের উপর জামাটা গলিয়ে বের হয় নন্দন।

জগুমাসী শুধোয়—কোথায় চল্লি এসময়?

নন্দন গজরায়—মরতে!

জগুমাসী বলে—বালাই ষাট! মরবি কোন দুঃখে, ব্যাটা ছেলে—বলে না পুরুষের দশ দশা, কখনও হাতি কখনও মশা। এখন একটু বেকায়দায় পড়েছিস—এদিন থাকবে না।

নন্দন যেন বুকে বল ভরসা পায়।

বলে সে—তাই বল মাসী। নন্দন এত সহজে ভেঙ্গে পড়ার ছেলেই নয়।

বের হতে যাবে, হঠাৎ টেবিলের নীচে পড়ে থাকা ছড়ির আঁকশির মত

বাঁকানো মুখটায় নন্দনের পা আটকে যায় আর নন্দন ছিটকে পড়ে খাড়া-সিঁড়ির মাথার চাতালে।

—ওমা।

যাক ধরে ফেলে জগন্মাসী।

নীচে তেতলা থেকে খাড়া সিঁড়িটা নীচে নেমে গেছে আর একটু অসাধারণ হলে, নন্দন সোজা একতলায় ছিটকে পড়তো খাড়া সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে।

জগন্মাসী বলে—রাধারানীই আজ তোকে সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছে নন্দন, জয় রাধে! না হলে কি যে হতো!

নন্দন দেখছে ওই সর্বনাশের পথটাকে।

উঠে দাঁড়ায়। দেখে নন্দন ওদিকে তিনতলায় কর্তার ঘর থেকে অপরাজিতা অমরবাবুকে খাবার দিয়ে নামছে।

নন্দনের উর্বর মস্তিষ্কে চকিতের মধ্যে শয়তানী মতলবটা খেলে যায়।

নিছক দুর্ঘটনাই হয়ে যেত তার ক্ষেত্রে কিন্তু ফল কি হতো তা ভাবতে ভয় লাগে নন্দনের। নিজের জীবনের উপর মানুষের অনেক মায়া। আর অপরের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তার কাছে আনন্দের।

আজ নন্দন যেন চকিতের মধ্যে পথ পেয়ে গেছে, উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

দেখে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলা থেকে নেমে গেল অপরাজিতা তাদের দিকে না চেয়ে।

নন্দন এবার চাপা স্বরে বলে জগন্মাসীকে—নন্দন-এর শেষ খেলা এবার দেখবে মাসী, বার বার দুবার শিকার ফসকে গেছে, এবার কিন্তু আর ফসকাবে না।

জগন্মাসীও যেন বাতাসে সর্বনাশের গন্ধ পায়।

তার মাথায়ও বুদ্ধিটা গজিয়েছে, বলে জগন্মাসী—পারবি তো?

—হ্যাঁ!

—যুৎসই করে করতে পারলে ব্যাপারটা নেহাৎ দুর্ঘটনা বলেই চালানো যাবে, বাড়িতে কেউ আসল ব্যাপারটা টের পাবে না।

নন্দন বলে—তাই হবে, নন্দন এবার শেষ জবাবই দেবে মেয়েটাকে।

অপরাজিতা এসবের বিন্দু বিসর্গও জানে না।

এবাড়িতে সে বেশ কিছু কাজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

অপরাজিতাও ভোলেনি এবাড়ির স্বার্থপর লোভী মানুষদের সে মুখের মত জবাবই দেবে। চন্দনের প্রকাশ্যে সেই অপমান ভোলেনি অপরাজিতা।

কিন্তু তার জবাব দেবার রীতিটা আলাদা। সময়ও তার বেশী নেই।

নিজের ঘরে ক্যালেণ্ডারের পাতাটা দেখে।

আর মাত্র ক'মাস সময়, তার মধ্যে নন্দনকে জবাব দিতে হবে। এ বাড়িতে ওর কেন, মহামায়ার কর্তৃত্বও কমিয়েছে, নন্দনকে তাড়াবেই ওই বিরাট টাকা চুরির দায়ে। আর কাগজপত্রও তৈরী হয়ে আসছে।

তারপর শেষ জবাব দেবে চন্দনকে।

এ বাড়ির সব ঔদ্ধত্যের জবাব তাকে দিতেই হবে। তাই নীরবে কাজ করে যায় সে।

সুজাতা বলে—তুই সত্যিই বিচিত্র মেয়ে অপু।

অপরাজিতা পড়াচ্ছে অণি, রীণাকে।

সংসারের কাজ, শ্বশুরের সেবা, আর অফিসের কাজের ফাঁকে অণি, রীণাদের পড়ায় সে।

কোন কাজে ক্লান্তি নেই, ফাঁকি নেই।

—যাদের সংসারে কিছুই পেলি না, তাদের জন্য আর কত করবি?

হাসে অপরাজিতা, বলে সে—কাজ করেই নিজের সব দুঃখকে ভুলে থাকতে চাই দিদি।

সুজাতা মেয়ে হয়ে মেয়েদের দুঃখটা বোঝে।

দেখেছে চন্দনকেও সুজাতা। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর কোন সম্পর্কই নেই ওদের মধ্যে, সুজাতা দেখা মাত্র নীরবে কষ্টই পায়।

চন্দন সেই চড় মারার পর থেকে বুঝেছে নন্দনের ব্যাপারটা। ও যে এমনি নীচ মনের তা জানতো না। ওর জন্যই চন্দন বারে ঘুরেছে, মদের নেশায় রাতভোর বাইরে থেকেছে।

আর পরে দেখেছে নন্দন ওইসবের প্রলোভন দেখিয়ে নিজে প্রচুর টাকা চুরি করেছে বাবার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে।

সেদিন অমরবাবু উদ্যোগী হয়ে আসল চোরকে না ধরলে অপরাজিতাকে চোর বলে ভাবতো ওরা, চন্দন সেদিন বাড়াবাড়িই করে ফেলেছিল।

পরদিন অমরবাবু চন্দনকে তার ঘরে আসতে দেখে চাইল, শুধোয়—কি ব্যাপার?

অমরবাবু খাতাপত্র দেখছিল।

তার থেকে মুখ তুলে বলে,

নিজে তো ব্যবসা পত্র দেখলে না, আমিও অসুস্থ হয়ে পড়লাম, ফলে যা হবার তাই হচ্ছে, তুমি যদি এসব দেখতে তাহলে এমন হতো না।

আজ চন্দনও সেটা বুঝেছে।

এভাবে সে অকর্মণ্যের মত বসে থাকতে রাজী নয়। সেও কিছু কাজ করতে চায়।

তাই বলে চন্দন—আমি অফিসে যেতে চাই বাবা। কাজকর্ম শিখতে চাই—

অমরবাবু যেন কথাটা বিশ্বাসই করতে পারে না।

চোখ থেকে চশমাটা খুলে শুধোয়—সত্যি বলছ?

—হ্যাঁ বাবা, পরীক্ষা তো হয়ে গেছে। কাজও কিছু নেই।

অমরবাবু বলেন—'ঠিক আছে। আমি ম্যানেজার অসীমকে বলে দিচ্ছি তুমি গিয়ে নন্দনের খালি চেম্বারেই বসবে। কিছুদিন নানা বিভাগের কাজ-দ্যাখো, অসীমই সব ব্যবস্থা করে দেবে, রাজী?

চন্দন নিজেকে এবার বদলাতে চায়। তাই বলে—হ্যাঁ বাবা।

—গুড! আজ থেকেই সুরু করো তাহলে, শুভস্য শীঘ্রম।

চন্দন চলে যায়।

অমরবাবু ভাবছে কথাটা! এতদিন চন্দন নিজের মতে নিজের পথেই চলছিল। তাকে বলে কয়েও কিছু হয়নি। আজ নিজে থেকে এসে কাজের দায়িত্ব নিতে চায় চন্দন।

কথাটা ভাবতে ভালো লাগে অমরবাবুর।

অপরাজিতা চা নিয়ে ঢুকেছে।

অমরবাবু বলে,—আজ তোমার জয়ের মুকুটে আর একটা পালক গোঁজা হ'ল মা। অপরাজিতা মায়ের এনাদার ভিক্ট্রি।

চাইল অপরাজিতা।

অমরবাবু বলেন—চন্দন নিজে এসেছিল মা, নিজে থেকেই অফিসের কাজ করতে চায় বলে জানালো। আজ থেকে অফিসে বসছে।

অপরাজিতা শুনছে কথাটা।

জবাব দেয় না।

অমরবাবু বলেন—এই সুমতিটা যদি আসতো ওর—আমাদের এত ক্ষতি

হতো না। তবে এখনও সময় আছে। আমিও অফিস যাবো সামনের সপ্তাহ থেকে।

বাপ বেটায় মিলে খাটলে ঠিক আবার সামলে নেব।

অপরাজিতা বলে—ষ্টেটমেণ্টও সব তৈরী হয়ে যাবে কালই।

অমরবাবু বলেন—মা। বাড়ির কাজ তো এরাই দেখছে। তুমিও অফিসে যাবে মা? একাউনটস্ এর কাজে নিজেদের কেউ থাকলে ভালো হয়। তুমি পারবে। অপরাজিতা হাসল মাত্র।

ব্রেকফাস্টের শূন্য প্লেট—কাপ ডিশ নিয়ে বের হয় সে।

বড় বাড়িটার এদিকে এসময় লোকজন কেউ তেমন থাকে না। কাজের লোকরা নীচের কিচেনে—বসার ঘরে ব্যস্ত।

মহামায়ার ওদিকে মহলে ওদের কাউকে দেখা যায় না। সারা বাড়ি শুনসান।

তেতলার সিড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে অপরাজিতা। আগেকার আমলের তৈরী বাড়ি।

তখন মানুষের স্বাস্থ্যও বোধহয় ভালো ছিল সিড়িটা সোজা নেমে গেছে, তিনতলার চাতালের ওদিকে বারান্দা চলে গেছে বাঁক নিয়ে—

ওই বাঁকের মাথায় আজ নন্দনও তৈরী হয়ে বসে আছে।

এগিয়ে আসছে অপরাজিতা, হাতে শূন্য কাপ, ডিস—প্লেট ইত্যাদি। ওদিকে জগুমাসী আড়ালে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে নজর রাখছে, যেন এই কুকাজের সাক্ষী কেউ না থাকে। কাক পক্ষীতেও যেন টের না পায়। এই তাদের শেষ চেষ্টা।

এ কাজে সফল হতেই হবে।

অপরাজিতা আপন খেয়ালে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে। আর সেই সময়ই নন্দন বারান্দার কোণ থেকে বাঁকানো লাঠির মাথাটা দিয়ে ওর পায়ে আচমকা টান দিতেই অপরাজিতা টাল সামলাতে না পেরে সিঁড়িতে সজোরে ছিটকে পড়ে আর ঢালু খাড়া সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

ছিটকে পড়ে কাপ প্লেট ডিসগুলো ঝনঝন করে।

ওই শব্দে মাহামায়া যাচ্ছিল নীচে দিয়ে ফিরে চাইতে দেখে সিঁড়ির মাথায় চট করে সরে গেল নন্দন হাতে তার ছড়িটা—ওইটা দিয়ে সে এই সর্বনাশ ঘটিয়েছে।

আর জগুকেও দেখছে মহামায়া।

ওই দুই মূর্তিই তাকে দেখে সরে যায়। কিন্তু ব্যাপারটায় বুক চমকে ওঠে মহামায়ার।

গড়িয়ে পড়ছে অপরাজিতা সিঁড়ি দিয়ে। ও চীৎকার করে ওঠে।

—সর্বনাশ হয়েছে। ওরে যদু—বিমলি—একি সর্বনাশ হ'লরে।

অমরবাবুও সিঁড়িতে কি গড়ানর শব্দ শুনেছে, শুনেছে ওই কাপ ডিসগুলো ভাঙার শব্দ, আর মহামায়ার চীৎকার শুনে অমরবাবু বের হয়ে আসে।

সিঁড়িতে তখন গড়িয়ে পড়ছে অপরাজিতার দেহটা। অমরবাবু হাঁক পাড়ে—

—চন্দন! চন্দন।

চন্দন পোষাক পরে অফিস বের হবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। বাবার ডাক শুনে সেও বের হয়ে আসে। দেখে তখন তিনতলার থেকে গড়িয়ে পড়েছে অপরাজিতার দেহটা একতলার বারান্দায়।

কপাল ফেটে গেছে, নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। জ্ঞান নেই। অচেতন দেহটা স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে নীচে।

ছুটে এসেছে সুজাতা।

ওই অবস্থায় অপরাজিতাকে দেখে সে চীৎকার করে ওঠে—আর কত, কত শাস্তি দেবে মেয়েটাকে?

এবার শেষই করেছো তোমরা ওকে।

এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারে না।

ততক্ষণে এসে হাজির হয়েছে নন্দন। জগুমাসী হাহাকার করে ওঠে।

—ওমা! মেয়েটার একি সর্বনাশ হল রে চন্দন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে এই হ'ল! ওরে নন্দন ডাক্তার ডাক। একি হল বৌমার। হেই রাধারানী—একি করলে তুমি! ডাক্তার ডাক।

মহামায়া দেখছে জগুমাসী, নন্দনকে।

অমরবাবুও যেন মানতে পারে না যে এটা নিছক দুর্ঘটনাই।

অমরবাবু বলে,—এতদিন ও ওঠা নামা করছে, পড়েনি। আজই বা পড়লো কেমন করে?

চন্দন দেখছে ব্যাপারটা।

অপরাজিতার রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে, এ যেন তারই পরাজয়। নিজের স্ত্রীর জন্য সে কিছুই করেনি। তাকে বাঁচাতেও পারেনি চরম অপমান-

এর আঘাত থেকে।

অপরাধী অন্য কেউ নয়—আজ নিজেকেই অপরাধী ভাবে চন্দন।

সে বলে,—যদুদা—গাড়ি বের করতে বলো, এখুনি নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হবে। দেরী করা চলবে না।

অমরবাবু বলে,—ওকে নার্সিং হোমেই নিয়ে যা চন্দন। মাকে বাঁচাতেই হবে, টাকার জন্য ভাবিস না। বেচারাকে কি কষ্ট দেবার জন্যই এখানে এনেছিলি? এখন যেভাবে হোক ওকে বাঁচাতেই হবে, তারপর দেখা যাবে এ দুর্ঘটনা না অন্য কিছু।

কথাগুলো অমরবাবু ওই নন্দনের দিকে চেয়েই বলে বেশ জোর দিয়ে।

নন্দন চুপ করে থাকে। অণি—রীণা কাঁদছে ফুঁপিয়ে। কথাটা শুনছে জগুমাসীও।

অপরাজিতার জ্ঞানহীন দেহটা তুলে নিয়ে চলে গেল নার্সিং হোমে।

এ বাড়িতে স্তব্ধতা নামে।

সুজাতার চোখে জল নামে।

অণি বলে—দাদু, কাকীমা ভালো হবে তো!

অমরবাবুও তাই চান সারা মন দিয়ে। আজ ওই মেয়েটির জন্য তার ছত্রভঙ্গ হাল ভাঙ্গা সংসারের নৌকাটা ঠিকমত চলতে সুরু করেছে, আর ঠিক এই সময়েই একটা অদৃশ্য কালো হাত সব তছনছ করে দিল।

অমরবাবু সেই কালোহাতটাকে ধরবেনই।

অণির কথায় বলে,

—হ্যাঁ। কাকীমা ভালো হয়ে উঠবে অণি।

মহামায়া ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেছে।

সে ভাবতেই পারেনি যে এত কাণ্ডের পর নন্দন আবার এমনি একটা কাণ্ড বাধাবে।

নিজের ঘরে নন্দন আর জগুমাসীকে ডেকেছে মহামায়া।

বলে সে.—একি করেছিস নন্দন?

নন্দন বলে,—আমি কি করলাম? কে কোথায় ছিটকে পড়লো আর দায়ী হবো আমি।

জগুমাসী বলে,—তাতো বটেই। বিপদ আপদ ঘটতে কতক্ষণ! এসব কি বলছিস মহামায়া?

মহামায়া বলে,—যা দেখেছি তাই বল্লাম, বুঝলি জগু, পাপ কখনও চাপা থাকে না।

জগু চমকে ওঠে।

মহামায়া বলে,—নন্দন, মেয়েটাও জানতে পেরেছে পায়ে কেউ টেনেছে তার, তোকে দেখেছেও নিশ্চয়। জ্ঞান ফিরলে যদি সব কথা বলে দেয় তোদের কোমরে দড়ি পড়বে। জেল হয়ে যাবে—আর কর্তাবাবুও বাঁচাতে যাবে না।

আমি না হয় নাই বললাম—কিন্তু আসল খবরটা যদি ওই বৌ পুলিশকে জানায়—

চমকে ওঠে জগু। পুলিশের নামেই সে ভয় পায় একটু বেশী। তাই বলে—আমি ওসবের কিছুই জানি না বাছা। ঠাকুরের নাম নিয়েই থাকি। জয় রাধে!

জগুমাসীর দিকে চাইল নন্দন। বেশ বুঝেছে সে জগুমাসী তাকে গাছে তুলে মই কেড়ে নিতে চায়।

এবার নন্দন ভাবনায় পড়েছে। তার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে।

নন্দন কি করবে বুঝতে পারে না, মনে হয় নিজের জালেই জড়িয়ে পড়ছে সে।

বলে সে—মা!

মহামায়া বলে,—আমি কি করব, এসব করার আগে বলেছিলি আমায়? এখন দ্যাখ কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

জগু বলে—মেয়েটা না সারলেই ভালো হয়। জয় রাধে—

ডাঃ সেন এই পরিবারের অনেক দিনের ডাক্তার। তিনি দেখেছেন কিছু-দিন ধরে অমরবাবুর সংসারের বেহাল অবস্থাটাকে।

অমরবাবুর অসুস্থতা সম্বন্ধেও তার মনে একটা প্রশ্ন আজও রয়ে গেছে। ওর অসুখটা যেন চেষ্টা করে বাধানো হয়েছিল। শেষই হয়ে যেতো অমরবাবু, ওই অপরাজিতা এসে ওকে বাঁচিয়েছে।

তাতে হয়তো অদৃশ্য সেই মানুষগুলো খুশী হয়নি—তার কিছুদিন পরই ওই বাড়িতে একটা পয়জনিং কেসও ঘটে গেল। অপরাজিতা বেঁচে গেছল।

এ নিয়ে পুলিশী তদন্তও হয়েছিল—কিন্তু ওই অপরাজিতাই সেদিন হয়তো এড়িয়ে গেছল, আসল কথাটা বলতে চায়নি।

ছেলেটা বেঁচে গেছল। তাই আর তেমন গোলমাল হয়নি।

কিন্তু এবার চন্দনকে অপরাজিতার রক্তাক্ত জ্ঞানহীন দেহটা নিয়ে ঢুকতে দেখে ডাঃ সেন বলে ওঠেন।

এবার দেখছি ওদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি চন্দন।

চন্দনও চমকে ওঠে।

মনে মনে যেটা সে ভেবেছিল সেটাকে স্পষ্টভাবে ডাঃ সেন বলে ফেলেছেন।

চন্দনও অবাক হয়।—এ সব কি বলছেন ডাক্তারবাবু ?

ডাঃ সেন বলেন,—এটাও দুর্ঘটনাই না ? কেস অব এ্যাক্সিডেণ্ট ?

চন্দন বলে,—সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে।

ডাঃ সেন রোগিনীকে পরীক্ষা করছেন।

প্রথম দেখেই বলেন—একে O. Tতে নিয়ে চলো। জরুরী অপারেশন করতে হবে। ব্লাড-এর দরকার হবে।

চন্দন বলে,—রক্তের দরকার হয় আমি দিতে পারি। ওকে বাঁচান।

ডাঃ সেন বলেন—তুমি রেডি থাকো। ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করতে হবে।

ডাঃ সেন—দেখা যাক কি করা যায়।

ওরা ভিতরে চলে গেল।

যদু সঙ্গে ছিল। বলে সে,

—দাদাবাবু, আমার রক্তে কাজ হবে না ? বৌদির জন্য এটুকু না করলে ধর্মের কাছে কি জবাব দেব ?

চন্দন বলে—রয়েছো তো—দেখা যাক ডাক্তাররা কি বলেন।

যদুই বলে—বাবু, বৌমার বাবাকে একবার খবর দেবেন না ?

চাইল চন্দন।

যদু বলে—তাদেরও তো মেয়ে।

ডাক্তারবাবু বললেন—অবস্থা বিশেষ ভালো নয়, তাই বলছিলাম।

চন্দনও ভাবছে কথাটা।

অপরাজিতার বাবা সেদিন ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অপুই যায়নি। শ্বশুর বাড়ি—স্বামীর ঘর ছেড়ে যেতে সে চায়নি।

আজ সেখানেই যদি কিছু হয়ে যায় চন্দন কি জবাব দেবে সুবিনয়-বাবুদের।

তাই আজ ফোনই করে সে সুবিনয়বাবুকে।

সুবিনয়বাবু সেই ঘটনার পর আর এ বাড়িতে আসেনি। বেশ বুঝেছিল অপু এখানে মোটেই ভালো নেই।

তবু হয়তো একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে, স্বামীর ঘরে সে পূর্ণ মর্যাদা নিয়েই ঠাঁই পাবে, সেই আশাতেই সে থাকতে চেয়েছিল এত কষ্ট, অপমান সহ্য করে।

সুবিনয়বাবু মেয়ের এই ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোন বাধা দেয় নি।

ফিরে এসেছিল শূন্য হাতে।

মৃন্ময়ী স্বামীকে ফিরে আসতে দেখে বলে,

—তুমি একা ফিরলে যে—অপু, জামাই ওরা এল না?

সুবিনয়বাবু বলে সহজভাবে,

—মেয়ে সেখানে বেশ খুঁটি গেড়ে বসেছে অপুর মা—বলে সে, ঘরসংসার, শ্বশুর মশাইকে ফেলে কি করে যাই! বুঝলে অপুর মা—অপু ও বাড়িতে গিয়ে সকলের মন কেড়ে নিয়েছে। কাড়বে না? মা আমার কত ভালো! তাই আসা হবে না।

মৃন্ময়ী বলে—ভালো আছে তো অপু?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। খুব ভালো আছে।

সুবিনয়বাবু সেদিন এ বাড়িতে ওই সব মিথ্যা কথাগুলো বেশ সহজ-ভাবেই বলেছিল স্ত্রীকে।

আর মৃন্ময়ীও বিশ্বাস করেছিল, বলে সে নিশ্চিন্ত হয় স্বামীর কথায়।

—সুখে থাক অপু, তাহলে আমরাও সুখী হবো।

সেই মিথ্যা সুখের স্বর্গে বাস করছিল মৃন্ময়ী, ভেবেছিল তার মেয়ে ভালো আছে, সুখে আছে স্বামীর ঘরে, স্বামীর সোহাগে।

মেয়েদের এর চেয়ে বড় পাওয়া আর নেই অন্ততঃ মৃন্ময়ী এটা বিশ্বাস করে।

সুবিনয়বাবু স্ত্রীর এই স্বপ্ন ভঙ্গ করতে পারেনি। এবং নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হয়েছিল, মিথ্যার গ্লানি তার মনকে কালিমা লিপ্ত করে তুলেছিল বারবার।

আজ সুবিনয়বাবু ওই ফোন পেয়ে চমকে ওঠে।

অপু সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে সাংঘাতিক চোট পেয়েছে মাথায়। নার্সিং

হোমে আনা হয়েছে তাকে।

সুবিনয়বাবু চমকে ওঠে।

এর আগে শুনেছিল চন্দনের মুখে অপরাজিতা ওবাড়িতে ভালো নেই। ওখান থেকে নিয়ে যাওয়াই ওর পক্ষে ভালো।

সেদিন কথাটার ততখানি গুরুত্ব দেয়নি সুবিনয়বাবু।

অপুও বুঝতে পারেনি যে এমনি বিপদ হতে পারে। আজ তাই হয়েছে শুনে সুবিনয়বাবু এবার নিজেকেই যেন দায়ী করে।

তখন জোর করে অপুকে এ বাড়িতে আনলে হয়তো এই বিপদকে এড়ানো যেতো।

ফোনের খবর শুনে মৃণ্ময়ীও এসে পড়ে।

—কার ফোন?

বলে সুবিনয়বাবু অপুর দুর্ঘটনার খবরটা।

—সেকি! মৃণ্ময়ী আর্তনাদ করে ওঠে। শুধোয়—কেমন আছে সে?

সুবিনয়বাবু বলে—নার্সিং হোমে রয়েছে। যাই দেখে আসি—তারপর ওবেলায় নিয়ে যাবো তোমাকে।

মৃণ্ময়ীর চোখে জল নামে। বলে সে—তাই যাও, কেমন দেখলে ফোন করো, আমি চলে যাবো নার্সিং হোমে, কি যে হ'ল মেয়েটার?

নার্সিংহোমে এসে হাজির হয়েছে মহামায়া।

জগুমাসীও চায় নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করতে, তাই সেও এসেছে।

জগুমাসী আড়ালে নন্দনকে বলে—তুইও চল। বিপদের সময় পাশে দাঁড়াবার ভান করবি। দরদ দেখাবি এড়িয়ে থাকলে ওই অমরদা—চন্দনরা কিছু ভাববে। চল।

তাই ওরা সকলেই এসেছে নার্সিং হোমে যেন তাদের ব্যাকুলতার শেষ নেই। বারান্দায় অপেক্ষা করছে তারা। অমরবাবুও রয়েছে। ওদের হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে চাইল।

জগুমাসী শুধোয়—কেমন আছে বউ মা? ডাক্তার কি বললেন অমরদা!

অমরবাবু বিষণ্ণ সুরে বলে—ডাক্তার সেন বললেন মাথায় চোট পেয়েছে, পায়ের হাড় ভেঙেছে কিন্তু ভয়ের কারণ ওই মাথার চোটটা। তিনদিন অবধি না দেখে কিছু বলা যাবে না। ওষুধপত্র চলছে—

চন্দন ওদিকে ওষুধপত্র ইনজেকশনগুলো কিনে আনছে। সেও বারান্দায় ওদের দেখে চাইল।

নন্দন এগিয়ে আসে—কি রে চন্দন, বৌমা কেমন আছে? কি এ্যাকসিডেণ্ট হয়ে গেল বলতো? ব্যাডলাক্—

চন্দন চুপ করে শোনে কথাগুলো।

অমরবাবু কি ভাবছে।

জগুমাসী বলে মধুঢালা স্বরে—বৌমাকে দেখতে পাবো না এখন?

—জ্ঞান ফিরেছে, তবে খুবই দুর্বল, ডাক্তার না বল্লে দেখা হবে না।

নন্দন শুধোয়—তাহলে কেমন আছে?

—ঠিক কিছু বলা যাবে না বাহাত্তর ঘণ্টা না কাটলে, চন্দন জানায়।

ডাঃ সেন জানেন কেসটার পিছনে হয়তো কোন কারণ আছে। আর দুঁদে পুলিশ অফিসার তরুণ ঘোষালও খবর রেখেছিল।

তরুণ ঘোষাল এই বিয়ের অন্যতম হোতা। পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব ছাড়াও তার কিছু মানবিক কর্তব্য রয়ে গেছে এই মেয়েটির জন্য।

প্রথম দিন থেকেই ওর তেজস্বিতা দেখে তরুণ ঘোষালের ভালো লেগেছিল অপরাজিতাকে। তাই সেদিন এ বাড়িতে 'বিষ প্রয়োগের ঘটনা ঘটতে সে ছুটে এসেছিল তদন্ত করতে।

কারণ তার পুলিশী নজরে মনে হয়েছিল বিষ দেবার চেষ্টা হয়েছিল অপরাজিতাকেই, ওই বাড়ির কিছু মানুষ তাকে মেনে নিতে পারেনি—তাই কৌশলে সরাবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু সেদিন তরুণ ঘোষালকে অপরাজিতাই অন্য কথা বলে এড়িয়ে যায় তাই তরুণবাবু থানায় বসে ডাঃ সেনের ফোন পেয়ে চমকে ওঠে। তিনতলার সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে অপরাজিতা নার্সিং হোমে আছে।

খবরটা শুনে তরুণবাবুর পুলিসী মন আবার হিসাব কষতে বসে। আর যুক্তি তর্ক দিয়ে ওই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয় সে—এ যেন নিছক দুর্ঘটনাই নয়, এর পিছনে রয়েছে অদৃশ্য সেই কালো হাত—যে এর আগে বিষ দিয়ে অপরাজিতাকে সরাতে চেয়েছিল এই দুনিয়া থেকে।

তাই খবরটা শুনে তরুণ ঘোষাল আজ একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যই ডাঃ সেনকে বলে তার আসার কারণ।

—রোগিনীর ষ্টেটমেণ্ট নিতে হবে। আমার মনে হয় এ নিছক দুর্ঘটনা

নয়, এর পিছনে কোন গভীর ষড়যন্ত্র আছে। কোন বধূহত্যার প্ল্যানই, না হলে প্রায়ই ও বাড়িতে এসব ঘটছে কেন?

ডাঃ সেনও সেই রকমই কিছু ভাবছেন।

কিন্তু সে সব ভাবনার কথা পুলিশকে জানাতে চান না। বলেন—ঠিক আছে।

নার্সকে ডেকে বলেন—একে সাতনম্বর ঘরে অপরাজিতার কাছে নিয়ে যাও, আর শোনো—ইনি যখন ওর সঙ্গে কথা বলবেন, রোগীর বাড়ির কোন লোক যেন সেখানে না থাকে, যান এর সঙ্গে মিঃ ঘোষাল।

নার্স পুলিশ অফিসার তরুণ ঘোষালকে নিয়ে চলেছে করিডর দিয়ে।

করিডরে তখন নন্দন, জগুমাসী, মহামায়া রয়েছে ওদিকের বেঞ্চে।

অমরবাবু, চন্দনও ওপাশের বারান্দায় অপেক্ষা করছে।

ওরা হঠাৎ পুলিশ অফিসারকে আসতে দেখে চাইল।

এগিয়ে আসছে মিঃ ঘোষাল, পরণে পুলিশের পোষাক।

ওদিকে নন্দন, জগুমাসী মহামায়াদের দেখে চাইল। অমরবাবু, চন্দনও এসে পড়ে।

চন্দন শুধোয় আপনি!

তরুণ ঘোষাল ও বাড়ির ওই বড়লোকের বখাটে ছেলেটিকে চেনে, চেনে ওই বাড়ির নন্দনকেও। দেখছেন তরুণ ঘোষাল ওদের মুখগুলো, তার পুলিশী চোখ দিয়ে সে যেন ওদের মুখে কিসের ছায়া দেখার চেষ্টা করে।

নার্স বলে—চলুন স্যার পেসেণ্টকে খবর দিয়েছি।

চন্দন বলে—আমরা যাবো?

নার্স কিছু বলার আগে তবরণবাবু বলে,

—না। আমি কথা বলে আসার পর যেতে পারেন, এখন নয়।

পুলিশ অফিসার অপরাজিতার ঘরে ঢুকতে নার্স এদের মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

অমরবাবু, চন্দন একটু অবাক হয় পুলিশকে আসতে দেখে। চন্দন বলে অমরবাবুকে—কি ব্যাপার বাবা।

অমরবাবু বলে,

পুলিশ হয়তো কিছু সন্দেহ করছে, তাই বৌমাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়।

চন্দন অবাক হয়—সন্দেহ !

অমরবাবুও সঠিক কিছু জানে না, তাই বলে—ঠিক বুঝতে পারছি না।

কিন্তু ঠিক বুঝেছে এবার নন্দন, জগুমাসীও কিছুটা বুঝেছে। ওই মেয়েটা যদি তাদের দেখে থাকে, আর তার পড়ার জন্য যে ওরাই দায়ী—এই সব জানায়, তাহলে আর রক্ষা নেই, পুলিশ তাদের কোমরে দড়ি পরিয়ে নিয়ে গিয়ে খুনের দায়ে জেলে পুরবে।

নন্দন বলে চাপাস্বরে

—মাসী, পুলিশে কে খবর দিল ?

মহামায়া শুনেছে ওদের কথা। বলে সে চাপাস্বরে—বলিনি পুলিশ নজর রেখেছে মেয়েটার উপর, আর তোরা এতসব কাণ্ডের পরও আবার এইসব করতে গেলি, মেয়েটা যদি তোদের নাম করে দেয় ?

নন্দন জানে তাহলে কি হবে।

সেই কথাটা ভেবেই চতুর নন্দন পুলিশ অফিসার ও ঘর থেকে বের হবার আগেই পালাবে, পরে খবর নিয়ে হাওয়া তেমন ঠাণ্ডা বুঝলে আবার দেখা দেবে। এখন এখানে থাকা নিরাপদ হবে না। কে জানে মেয়েটা তাদের নামই হয়তো করেছে পুলিশের সামনে, তাই এখানে থাকা ঠিক হবে না।

পালাতেই হবে।

তাই নন্দন বলে—চন্দন, এখনতো দেখছি বৌমার সঙ্গে কথা হবে না। ও বেলায় আসবো। এখন একটা জরুরী কাজ আছে, বেরুতে হবে রে।

চন্দন এসব বোঝে না, বলে সে—এখুনিই চলে যাবে ?

নন্দন এখন পালাতে পারলে বাঁচে। বলে সে—হ্যাঁ রে। পরে আসছি।

নন্দন অবশ্য সান্ত্বনা দিতেও ভোলে না। শোনায় সে চন্দনকে—ঘাবড়াস না। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। চলি। নন্দন তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায় নার্সিং হোমের সীমানা থেকে।

জগুমাসীর ভয়টা বাড়তে থাকে।

পুলিশ সম্বন্ধে তার কিছু ভয় এমনিই রয়েছে, এখন তার কারণও রয়েছে।

সে হরিনামের মালাটা বেশ তাড়াতাড়ি জপ করে চলেছে, যেন বেশী পুণ্যি অর্জন করতে পারলে এ যাত্রাও বেঁচে যাবে।

তবু বিশ্বাস নেই, কে জানে মেয়েটা কিছু বলেছে কিনা দারোগাকে।

জগৎমাসী দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ফাঁক দিয়ে চোখের নজর চালিয়ে দেখার চেষ্টা করে, চেষ্টা করে কান পেতে ওরা কি বলছে শোনারও।

তরুণ ঘোষালকে আসতে দেখে অপরাজিতা চাইল। মাথায় পায়ে ব্যাণ্ডেজ, তবু উঠে বসার চেষ্টা করে, মিঃ ঘোষাল বাধা দেন।

—থাক থাক, উঠতে হবে না, কেমন আছো মা ?

অপরাজিতা বলে—ভালোই, আপনি এখানে ?

হাসল মিঃ ঘোষাল। জানায় সে,

—খবর পেয়েই দেখতে এলাম। তোমার শ্বশুরবাড়িতে তো দেখছি প্রায়ই একটা না একটা দুর্ঘটনা ঘটছে। তা এটা কি দুর্ঘটনাই, না নিছক এ্যাকসিডেণ্ট ?

চাইল অপরাজিতা। বেশ বুঝেছে ওই পুলিশ অফিসার তার কাজটা ভালোই বোঝেন। আর এই ঘটনার পিছনে একটা কালো হাতের খেলা আছে অপরাজিতা তাও বুঝেছে, কারণ তার পায়ে ছড়ির মাথা দিয়ে কেউ টেনেছিল তা বুঝেছিল সে—তার জন্যই ছিটকে পড়েছিল সিঁড়ির থেকে—

কিন্তু কে সেই মহাজন, তা দেখার সময় সুযোগ কোনটাই পায়নি অপরাজিতা।

তবে কিছুটা অনুমান করতে পারে সে, কিন্তু ওই পুলিশ অফিসার সেই ঘটনাটা তার হিসাব দিয়ে ঠিকই ধরেছেন।

মিঃ ঘোষাল বলেন—কি! জবাব দিচ্ছ না যে, বলো এটাকেও কি এ্যাকসিডেণ্ট বলে মেনে নিতে হবে ?

অপরাজিতা বলে—তাইই। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে শাড়িতে প আটকে গিয়ে ছিটকে পড়লাম—তারপর আর কিছু মনে নেই।

মিঃ ঘোষাল বলেন—তুমি ঠিক কথা বলছ না মা, এটা দুর্ঘটনা আদৌ নয়—এটা হচ্ছে হত্যার চেষ্টা! হ্যাঁ—তাই। বধূ হত্যার একটা চেষ্টা। আই এম সিওর। এক্ষেত্রে এটারই সম্ভাবনা অনেক বেশী। বল ঠিক কি কি হয়েছিল। আমি ওদের কাউকেই ছাড়বো না।

কঠিন স্বরে কথাটা বলেন মিঃ ঘোষাল।

অপরাজিতা ওই পরিবারকে সেই অপমান সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে চায়। মিঃ ঘোষাল দেখছেন ঘরের কাঁচের জানলার ওপাশের বারান্দায় অপেক্ষমান চন্দন, মহামায়া অন্যদের। আজ তরুণ ঘোষাল এর বিহিত করতে চান।

কিন্তু অপরাজিতা বলে—এসব ধারণা আপনার ঠিক নয়। শ্বশুরবাড়িতে আমি ভালোই আছি সকলেই স্নেহ করেন—

মিঃ ঘোষাল বলেন,—কাদের বাঁচাবার চেষ্টা করছ মা! ওরা জেদী—খুনী তোমাদের মত মেয়েকে খুন করতেও ওদের বাধবে না।

হাসে অপরাজিতা—তা নয়। বিশ্বাস করুন এটা নিছক দুর্ঘটনাই, আমার দোষেই ঘটেছে। ওদের কারোও কোন হাত নেই।

মিঃ ঘোষাল হতাশা ভরা গলায় বলেন,—তুমিও আমার মেয়ের মতই মা। তোমরা এক জায়গায় সবাই এক।

চাইল অপরাজিতা। বলেন মিঃ ঘোষাল,—আমারও একটি মেয়ে ছিল তোমার মতই। বেশ বড় ঘরে তার বিয়ে দিয়েছিলাম। তখন বুঝিনি, নামেই বড় ঘর। আসলে তারা কসাই। আমার মেয়েটা তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল—একদিন খবর পেলাম আমার মেয়ে খুব অসুস্থ। ছুটে গেলাম। তখন তার প্রায় শেষ অবস্থা। বেশ বুঝেছিলাম তাকে মেরে ফেলারই আয়োজন করেছিল ওরা।

কিন্তু সেই চক্রান্তের কথা মেয়েটা মৃত্যুর সময়ও আমার কাছে প্রকাশ করে নি। নীরবে সব অত্যাচার মুখ বুজে সয়ে, সে এই পৃথিবী থেকে চলে গেল।

আমি বাবা হয়ে—একজন পুলিশ অফিসার হয়েও আমার মেয়ের উপর সেই অত্যাচারের কোন প্রতিকারই করতে পারি নি।

তারপর তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল যদি অন্য কোন মেয়ের উপর তেমনি অত্যাচারের প্রতিকার করতে পারি—আমার মেয়ের আত্মা হয়ত শান্তি পাবে।

কিন্তু মা—তোমরা এক জায়গাতে একই রকম। তুমিও আজ সত্যটা গোপন করে গেলে।

অপরাজিতা দেখছে ওকে। পুলিশ অফিসার নয়, ও যেন কোন হত-ভাগিনী মেয়ের অসহায় বাবা।

মিঃ ঘোষাল বলেন,—চলি মা। ভালো থাকো।

টুপিটা মাথায় দিয়ে দরজা খুলে বের হবে মিঃ ঘোষাল। জগুমাসী উৎকর্ণ হয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। অতর্কিত দরজা খোলার জন্য পড়তে পড়তে কোন মতে সামলে নিয়ে চাইতে দেখে একজোড়া চোখের জ্বালা ভরা চাহনি তার দিকে চেয়ে আছে।

চমকে ওঠে জগুমাসী।

তরুণ ঘোষাল অসহায় রাগে জ্বলছে। বেশ বুঝেছে সে অপরাজিতাকে

এদের কেউ শেষ করতে চায়। কিন্তু সেই দোষীদের শাস্তি দেবার উপায়ও তার নেই। তাই ওদের দিকে তীক্ষ্ণ জ্বালাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই চলে গেল সে বারান্দা দিয়ে জুতোর শব্দ তুলে।

এতক্ষণ এরা একটা গভীর 'আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তাতে ছিল। মহামায়া ভেবেছিল অপরাজিতা সব কথাই বলবে পুলিশকে। আর এখানেই অ্যারেষ্ট করবে ওদের।

কিন্তু তা হয় নি।

মনে হয় পুলিশ অফিসারের সেই সাধ পূর্ণ না হতেই ওইভাবে নীরব চাহনিতে এদের শাসিয়ে বের হয়ে গেল।

অমরবাবু দেখছিলেন এদের। সে এবার বলে।

—বড় বৌ, ছোট বৌমা এবারও বাঁচিয়ে দিল ওই বাড়ির সম্মান। কিছু বল্লে আজ ওই পুলিশ অফিসার রেহাই দিত না। মা আমার বাড়ির সম্মান বাঁচিয়েছে এবারও।

চন্দনও শুনছে কথাটা। মনেহয় অপরাজিতাই পুলিশকে আসল কথাটা এবারও বলে নি। তাই এ যাত্রাও বেঁচে গেল এরা সবাই।

নার্স এসে খবর দেয়—আপনারা ভিতরে যেতে পারেন। তবে পেসেন্টকে বেশী কথা বলবেন না।

এমন সময় এসে হাজির হয় সুবিনয় বাবু। বেশ ব্যাকুল হয়েই এসেছে সে।

মহামায়া—জগুমাসী ওকে দেখেই চিনেছে। মহামায়া বলে,—আসুন বেইমশায়।

চন্দনই বলে—ভালোই আছে। চলুন—দেখবেন ওকে।

সুবিনয়বাবু দেখছে অপরাজিতাকে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। অপুর চেহারাও ক'দিনে অনেক ভেঙ্গে গেছে। তার আদরের সন্তান বিছানায় যেন মিশে রয়েছে।

—বাবা!

সুবিনয়বাবু শুধোন,—কেমন আছিস মা।

—ভালোই। ভালোই আছি বাবা।

সুবিনয়বাবু সেই ভালো থাকার কথাটা মনে করতে পারে। সেদিনও বলেছিল অপু, ভালো আছি। আর তারপর এই সর্বনাশ ঘটে গেল।

ডাঃ সেন বলেছেন—ওকে কমপ্লিট বিশ্রাম নিতে হবে। আর চাই সেবা,

যত্ন। মাথার চোট—কোন গড়বড় হলেই বিপদ হতে পারে।

সুবিনয়বাবু বলে আজ অমরবাবু, মহামায়াকে—বেইমশায়, অপু নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেলে আমার ওখানেই নিয়ে যাবো।

চন্দনও শুনছে কথাটা।

অমরবাবু কিছু বলার আগে মহামায়া বলে,—কেন ও বাড়িতেই যাবে। সেবাযত্নের কোন ত্রুটি হবে না।

চন্দন বলে— তাই ভালো। ভালোই থাকবে ওখানে।

সুবিনয়বাবু এতদিন অনেক সহ্য করেছে। দেখেছে তার কি ফল হয়েছে আজ।

তাই সুবিনয়বাবু বলে,—কেমন ভালো ছিল ওখানে তাতো দেখছি।

এরজন্য দায়ী করতে হয় তো তোমাকেই করবো চন্দন। আর কেউ কি করল না করল কিছু বলবো না। কিন্তু স্বামী হয়ে স্ত্রীর প্রতি এতটুকু কর্তব্যও তুমি কর নি। করার প্রয়োজনও বোধ করনি।

অমরবাবু শুনছে কথাগুলো। মহামায়াও নীরব, নির্বাক। ওই অভিযোগ অস্বীকার করার পথও নাই।

সুবিনয়বাবু বলে,—স্বামী যেখানে কর্তব্যজ্ঞান হীন, সেখানে স্ত্রীর এই পরিণামই হয়। জেনে শুনে আমার একমাত্র মেয়েকে সেখানে রাখতে আর রাজী নই।

অপুও শুনছে কথাগুলো। সে বলে ওঠে—বাবা—

—তুই বাধা দিসনে মা। আমাকে বাবার কর্তব্যটুকু করতে দে। আমি তোকে আমার ওখানেই নিয়ে যেতে চাই।

আজ চন্দনের মনে ঝড় ওঠে। ওই অভিযোগ বর্ণে বর্ণে সত্য। চন্দনের মনে আজ তাই একটা অনুশোচনাই জাগে। একটা মেয়ের চরম সর্বনাশ করেও খুশী হয় নি—তার বাড়িতে এসেছিল অপু সমাজে শুধুমাত্র সম্মান-টুকু পেতে। তারজন্য আজ তাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। প্রাণই শেষ হয়ে যেত—বেঁচে রয়েছে মাত্র।

আজ চন্দন তাকে সুস্থ করে তুলতে চায়—স্ত্রীর অধিকার, মর্যাদা—স্বীকৃতি দিতে চায়। অপুর কাছে তার তাদের পরিবারের অনেক ঋণ।

চন্দন আজ চিনেছে ওই মেয়েটিকে। তাই বলে চন্দন সুবিনয়বাবুকে।

—আপনার অভিযোগ আমি অস্বীকার করছি না। ওই ভুল আমি করেছি। এবার বুঝেছি কত বড় অন্যায় করেছিলাম। আমাকে সেই ভুল

শোধরাবার সুযোগ দেন—শেষবারের মত। আমি কথা দিচ্ছি অপরাজিতার কোন অসুবিধা আর হবে না। স্বামীর দায়িত্ব নিয়েই বলছি ওর সব ভার এবার আমিই নিজের কাঁধে তুলে নিলাম।

অমরবাবু দেখছেন চন্দনকে, ও যেন আজ এক নতুন মানুষে পরিণত হতে চায়। সেই দায়িত্বজ্ঞান হীন অমানুষ ছেলেটা আজ বদলে গেছে। যেন নতুন মানুষ হয়েছে সে।

সুবিনয়বাবু দেখছে ওকে।

অপরাজিতাও অবাক। সে ভাবতে পারেনি যে চন্দনের মত ছেলের মনে সে কোনদিন অনুশোচনার গ্লানি জাগাতে পারবে, সচেতন করে তুলতে পারবে তাকে।

অপুর সহনশীলতা, নীরব সাধনায় আজ যেন সে পাষাণের ঘুম ভেঙ্গেছে। আজ অপরাজিতাও সার্থক।

চন্দন বলে,—আমাকে সেই সুযোগ দিন একবার, কথা দিচ্ছি আমি অপুকে সুস্থ করে তুলবো—স্ত্রীর প্রতি কোন কর্তব্যে আমার অবহেলা হবে না।

সুবিনয়বাবুও রাজী হন।

—ঠিক আছে, তুমি যদি তা পারো—তাহলে বলার কিছুই নেই। অপু কি বলিস?

অপরাজিতার মুখে আজ হাসির রেখা জাগে।

সুজাতা বলে,—তাই ভালো। ঠাকুরপো রইল—আমিও আছি। ওবাড়িতেই যাবে অপু আমাদের কাছে।

চন্দন এখন যেন অন্যজন। সে এখন নার্সিং হোমেই থাকে বেশীর ভাগ সময়।

অপরাজিতা দেখছে নতুন এক চন্দনকে।

সুবিনয়বাবু মৃন্ময়ীও আসে নার্সিং হোমে। অপু এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। ব্রেন স্ক্যানিং করেও কিছু গোলমাল পাওয়া যায় নি, তাই তিনিও নিশ্চিন্ত।

বিকালে সেদিন মহামায়া—অমরবাবু এসেছে, সুজাতাও এসেছে অণি, রীণাদের নিয়ে।

ওরা বলে,—কাকীমা, এবার তো ভালো হয়ে গেছ। বাড়ি চলো।

চন্দন বলে,—বাবা। কিছুদিন আমি অপুকে নিয়ে পুরীর বাড়িতে যাবো। ওখানে বিশ্রাম নেবে—

ডাঃ সেন বলেন,—তাহলে তো ভালোই হয়। চেঞ্জও হবে। আর ঠাই নাড়া হলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। সি উইল বি ও কে।

অমরবাবু বলেন,—তাই ভালো। ডাঃ সেন, ওদের ট্রেনে রিজার্ভেশন করতে বলি। পুরীতেও খবর দিই?

সুবিনয়বাবুও তাই চায়। ক'দিনই দেখেছে সে চন্দনের অক্লান্ত সেবা যত্ন। সে তার কথা রেখেছে। সুবিনয়বাবুও খুশী।

মৃন্ময়ীও বলে,—চন্দন সত্যি ভালো ছেলে।

আজ সুবিনয়বাবুর মনে পড়ে সেই জজসাহেবের কথা। সেই দুর্যোগের রাতে বিয়ে হয়ে গেল নাটকীয় ভাবে। জজসাহেব সেদিন বলেছিলেন অপুকে,—তুমি তো অপরাজিতা, পারো যদি তবে হতভাগা ছেলেটাকেও তার জীবনের সঠিক পথের হদিশ দিয়ো মা। আজ অপরাজিতা যেন সেই কাজটাই করতে পেরেছে।

ওরা কয়েকদিন পরই পুরী রওনা হয়ে গেল। সঙ্গে গেল যদু। বুড়ো মানুষটাও যেন অপরাজিতাকে নিজের মেয়ের মত দেখে।

অপু সেরে উঠতে সেও সব থেকে খুশী হয়েছে, বলে সে মহামায়াকে।

—এ বাড়ির কাজের জন্য ঢের লোক আছে মা, বৌদি অসুস্থ শরীর নিয়ে পুরী যাচ্ছে—আমি ওর সঙ্গে যাবো।

মহামায়াও রাজী হয়।

—বেশতো, যাও!

বড় বাড়িটায় অপু ক'দিন নেই। চন্দনের সঙ্গে পুরীতে গেছে। এখন এ বাড়ির পরিবেশও বদলেছে।

মহামায়া বেশ বুঝেছে এতদিন ধরে সে যা করে এসেছে তার নীটফল শূন্যই।

আজ তার কাছে এই ঘর—তার পরিচয়ই বড় তার কাছে নন্দনের বোঝাটা এবার ভারি বলেই মনে হয়।

নন্দনও বুঝেছে সেটা। এ বাড়িতে এখন তার করার কিছুই নেই। অমরবাবু সুস্থ হয়ে উঠে নিজেই আবার অফিস-কারখানায় যাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে ক্রমশঃ নন্দনের আসল পরিচয় যত পাচ্ছেন ততই শিউরে উঠছেন।

নানাভাবে সে টাকা চুরি করেছে। কারখানার কাঁচামাল, ফিনিশড প্রোডাক্ট ও নানাভাবে চুরি করেছে।

অমরবাবু এবার সেই কাগজপত্র সব দেখে নন্দনের বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকা চুরির দায়ই আনতে চায়।

তার আগেই তাই সেদিন অফিসে ওকে ডাকিয়েছে।

নন্দন অফিসে আসে। কিন্তু আগেকার সেই দফরফ আর নেই তার। তখন গাড়ি থেকে নামতে দুদিকে বেশকিছু কর্মচারী তাকে সেলাম জানাতো। ঘাড় নেড়ে অফিসে এসে ঢুকতো নন্দন।

এখন সেই চেম্বারও তার নেই। ওখানে চন্দন বসে। আর অফিসে আসছে স্বয়ং অমরবাবু।

নন্দন ওদিককার একটা বন্ধ ঘরে বসে। কোন কর্মচারীই আর তাকে সেলাম করে না।

সেদিন আসছে নন্দন। অফিসের গাড়িও আর পায় না সে। মিনিবাসে আসতে হয়। উপরি আয়ও নেই যে টাক্সি হাঁকাবে।

সেদিন আসছে অফিসে, কানে আসে কোন বিভাগের দুজন স্টাফ ওকে শুনিয়ে বলে,—ব্যাটা চোর। এবার ফাঁদে পড়েছে।

অন্যজন বলে—তখন কি ডাঁট ছিল ওর। এবার বুঝবে মজা। অমর ঘোষকে চেনেনি। কোমরে দড়ি পরাবে ওর।

নন্দনকে শুনিয়েই যেন কথাগুলো বলে ওরা। নন্দন আজ ঢোঁড়া সাপ তা ওরা জেনেছে, ওর ফনাই নেই। ছোবল মারার সাধ্যও আজ নেই।

নন্দন মাথা নীচু করে চলে গেল তার ঘরে।

আগে হলে ওইখানেই তাকে বরখাস্ত করতো। আজ করার কিছুই নেই।

নন্দনের মনে হয় এখান থেকে চলেই যাবে সে। অন্য কোথাও একটা কাজকর্ম পেলে চলে যাবে। কিন্তু টাকা যদি হাতে থাকতো ভালোই হতো, তাও নেই। এ যেন তিল তিল করে তাকে কঠিন শাস্তিই দিতে চায় এরা।

বাড়িতেও দেখছে নন্দন তার মাও এখন যেন তাকে এড়াতে চায়। আর টাকাও দেয় না—দেখলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

জগুমাসীর অবস্থাও এখন ভালো নয়।

মহামায়া বলে সেদিন,—তোমার কোন বড়জায়ের ছেলেরা আছে না চন্দন-নগরে। সেখানে যাবে বলছিলে—তা সেখানেই ঘুরে এসো কিছুদিন।

জগুমাসী বুঝেছে ব্যাপারটা। আজ সে বলে,—আমাকেও চলে যেতে

বলছিস মহামায়া ?

মহামায়া বলে,—সংসার তো একা আমার নয়। আমার সৎ ছেলে রয়েছে, বৌমা আছে।

জগু বলে—'সোনা বাইরে আঁচলে গিরে'। নিজের ছেলে নন্দন হল পর, আর সৎ ছেলে বৌ হল আপন। তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে! আমি তোর বোন।

মহামায়া আজ কঠিন স্বরে বলে,—এমন বোন না এলে বোধহয় আমরা সবাই শান্তিতে থাকতাম। নন্দনও এ বাড়ির একজন হয়ে সুখে থাকতো। সেটা হল না তোর জন্যই।

জগু বলে—ওমা! আমি কি করলাম ?

—কুমন্ত্রনা দিয়ে লোভ দেখিয়ে নন্দনকে জানোয়ার বানিয়ে দিলি। খুন করতে গেছল সে—তোর কথায়।

—ওমা! কি বলছিস তুই ?

—ঠিকই বলছি। মহামায়া শোনায়—তাই বলছি, অনেক সর্বনাশ করেছো, এবার মানে মানে পথ দ্যাখো। চন্দনরা ফিরলে ছোট বৌমাকেই বলবো তোমার গুণের কথা।

চমকে ওঠে জগু। বেশ জানে সে, ওই মেয়ে তাকে সহজেই জব্দ করে দেবে।

এবার বিপদে পড়ে জগুমাসী। এই দুনিয়ায় আর কোন আশ্রয়ই তার নেই। এটুকু চলে গেলে পথেই দাঁড়াতে হবে তাকে। আজ ভাবনায় পড়েছে জগুমাসী।

নন্দন অফিসে বসেই বড় সাহেবের ডাক পেয়ে ওঁর ঘরে ঢুকলো। এখন অমরবাবু অন্য মানুষ। গম্ভীর মুখে ওঁর দিয়ে চেয়ে বলেন,—বসো।

—ম্যানেজারবাবু—ওকে চিঠিখানা দিন।

নন্দন অবাক হয়,—চিঠি! ভেবেছে সে চাকরী থেকেই তাকে বরখাস্ত করবে ওরা।

বিপদে পড়ে সে। চিঠিখানা নিয়ে আরও ঘাবড়ে যায়। তাকে প্রায় দুলাখ টাকা চুরির দায়ে কোম্পানী চার্জসিট করছে। সেই টাকা কয়েক দিনের মধ্যে জমা না দিলে কোম্পানী তার বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থাও নেবে—সে কথাও জানানো হয়েছে তাকে ওই চিঠিতে।

চিঠিখানা নিয়ে বের হয়ে এল নন্দন। তার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি

সরে যাচ্ছে। বাড়িতে ফিরেছে নন্দন।

মালা বলে,—মার্কেটিং করতে যেতে হবে। গাড়িটা চাই। কিছু টাকাও—হাজার দুয়েক।

নন্দন ফুঁসে ওঠে,—ওসব বড়লোকি চাল এবার বন্ধ করো। টাকা—গাড়ি এসব আর পাবে না। নেই।

মালা কি বলতে যায়।

গর্জে ওঠে নন্দন—কোন কথা বলবে না। যাও—যাও এখান থেকে।

মালা চলে যায়। নন্দন একাই বসে আছে। এমন সময় জগুমাসীকে ঢুকতে দেখে চাইল। নন্দন দেখছে ওকে।

জগুমাসী বলে,—এখন কি হবে নন্দন? তোর মা বলে, আমাকে অন্য কোথায় চলে যেতে। তোদের জন্য এত করে শেষে বলে কিনা চলে যাও।

নন্দন খিঁচিয়ে ওঠে,—মা বলেছে, সেখানেই যাও। আমি কি করবো? ওরা আমাকেই এবার চুরির দায়ে ফেলেছে—

—এ্যাঁ! সেকি! এসব তো জানি না।

নন্দন বলে ওঠে,—ন্যাকা! কিছুই জানো না? তুমিই তো বলেছিলে যা পারিস লুটে নে। গুছিয়ে নে। তাই একাজ করলাম—এখন তোমার জন্যই জেলে যেতে না হয়।

জগুমাসী বলে,—সেকি রে!

নন্দন বলে—আমার কিছু হলে তোমাকেও ছাড়ব না। সব কথাই আমি ফাঁস করে দেব। তোমাকেও ফাঁসাবো।

জগুমাসী অবাক হয়ে দেখছে নন্দনকে। আজ তার সামনে পৃথিবীই যেন বদলে গেছে।

বলে জগুমাসী,—একেই বলে কলিকাল। একি ফেরে ফেলাল রাধারানী!

আজ নন্দন, জগু দুজনেরই দমবন্ধ করা কোনঠাসা অবস্থা। ওদের সামনে আলোর—নতুন করে বাঁচার যেন কোন নিশানাই নেই।

আজ চন্দন যেন নতুন করে বাঁচার পথ পেয়েছে। অপরাজিতা আর সে পুরীতে এসেছে। স্বর্গ দ্বারের ওদিকে তাদের বড় বাড়িটা। দোতলার ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যায়।

বাতাসে ভেসে আসে সমুদ্রের অবিশ্রান্ত কলগর্জন।

চন্দন অপরাজিতাকে সেবা যত্ন করে সুস্থ করে তুলেছে। চন্দনের নজর

সর্বাদকে।

—ওষ্ধটা খেয়ে নাও। সময় মত ওষ্ধ দেয়।

হাসে অপরাজিতা।—আমি তো ভালো হয়ে গেছি।

চন্দন বলে—না অপু। এখন সাবধানে থাকতে হবে।

চন্দনই বাজারে যায় যদুকে নিয়ে।

এ যেন নতুন এক জীবন। সংসার করা—একজনকে নিয়ে ঘর বাঁধা, তার জন্য ভাবনা এর নামই বোধ হয় সংসার।

অপু বলে—এত মাছ, মাংস কেন এনেছো ?

চন্দন বলে—কেন ?

—তিনজনের এত লাগে ? না !—বড্ড বাজে খরচা করছ, কাল থেকে আমিও বাজারে যাবো।

শুধু বাজারই নয়, সন্ধ্যার সময় জগন্নাথদেবের মন্দিরে আরতি দেখে ওরা আসে সমুদ্রের ধারে।

বেলাভূমিতে তখন ভ্রমণার্থীদের ভিড়। বালির উপরই দোকান বসেছে। ঝিনুকের তৈরী জিনিস—নানা ধরণের মালা—সিঁদুর কৌটো—নানা জিনিস।

অপুও ছোট্ট মেয়ের মত যেন এক নতুন খুশির জোয়ারে ভেসে যায়। কখন আবদার ধরে।

—এ্যাই, চুড়ি কিনে দাও না। ওই শঙ্খটা কেনো না বাপু।

চন্দন পয়সা খরচা করেই আজ আনন্দ পায়। দুজনে ফেরে বাসায়। যদু বলে—এত রাত অবধি সমুদ্রের নোনা হাওয়া লাগিয়ো না।

অপু বলে—যদুদা—তুমিও চল না সমুদ্রে।

যদু বলে—ধ্যাৎ, জল আর জল, কি দ্যাখার আছে ? কলকাতা ফেরো এইবার।

চন্দনেরও খেয়াল হয়। মাস খানেক কোনদিকে কেটে গেছে খেয়াল করে নি।

অপুও বলে,—এখন তো সেরে উঠেছি। চল—ফেরা যাক।

চন্দনের যেন তেমন সাড়া নেই। তার কাছে এই দিনগুলো যেন কি মাধুর্যে আর আশায় ভরা।

অপরাজিতাকে কাছে পাবার নেশা তার সারা মনে। এতদিন সে ব্যস্ত ছিল অপুকে সারিয়ে তোলার সাধনায়। অপু আজ ভালো হয়েছে।

চন্দন ভাবছে ফেরার কথা।

অপুও, তার সামনে, ক্যালেণ্ডারের পাতাটা নড়ছে হাওয়ায়। বাতাসে সমুদ্রের গর্জন ভেসে আসে। রাত নেমেছে।

জানলা থেকে দেখা যায় বালিয়াড়ি শূন্য—আলোগুলো জ্বলছে নির্জন বালুচরে, জেগে আছে অশান্ত সমুদ্রের গর্জন।

ক্যালেণ্ডারের দিনটা নজরে পড়ে—৭ই ফেব্রুয়ারী। ওই তারিখে তাদের বিয়ে হয়েছিল। অপরাজিতা এসেছিল এ বাড়িতে একটা জেদ নিয়েই। প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল সে।

কিন্তু এ বাড়িতে এসে দেখেছিল অমরবাবুকে, ষড়যন্ত্রের শিকাররূপে। অসহায় বৃদ্ধকে বাঁচিয়েছে—বাঁচিয়েছে অণিকে। ওই বাড়ির বিষাক্ত পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করেছে।

আজ অমানুষ চন্দনকেও মানুষ করে তুলেছে, কিন্তু কি পেয়েছে সে? তার এ বাড়িতে আসার সর্তের কথা মনে পড়ে।

দিন ফুরিয়ে আসছে তার। আর মাত্র সাত দিন বাকী।

বন্ধ দরজায় চন্দনের গলার শব্দ শুনে চমকে ওঠে অপরাজিতা। আজ চন্দন যেন আরোও অনেক কিছু পেতে চায়।

আজ চন্দন এসেছে স্বামীত্বের দাবী জানাতে। অপরাজিতার ঘরে আলোটা নেভানো—চন্দন ডাকছে ভীরু আবেগময় স্বরে।

—অপু! অপু!

অপরাজিতা ওই ডাকে সাড়া দিতে পারে না। চায় না। তাই ঘুমের ভান করে বিছানাতে পড়ে থাকে। যেন গভীর ঘুমে ডুবে আছে সে।

চন্দন ফিরে গেল হতাশ হয়ে।

সেই রাতেই ঠিক করে এবার কলকাতায় ফিরতে হবে।

তাই ফেরার ব্যবস্থা করে চন্দন। অবশ্য আপত্তি করেছিল চন্দন।

—এখুনিই ফিরবে? আর ক'টা দিন থাকলে হতো না?

অপু বলে—না। বাবাকে খবর দাও, আমরা কালই ফিরছি। টিকিটের ব্যবস্থা করো।

চন্দন হতাশ হয়।

যদু বলে,—বাবা জগন্নাথ দর্শন হল। তুমিও সেরে উঠলে মা—আর কেন! এবার ফেরা যাক।

অমরবাবু পুরী থেকে ওদের ফেরার খবর পেয়ে খুশী হয়।

সুজাতাও তার পথ চেয়ে আছে।

অমরবাবু বলেন,—বৌমা, চন্দনের বিবাহবার্ষিকী কবে?

সুজাতা বলে,—সামনের শনিবার।

অমরবাবু বলেন,—ওরা আসছে শুক্রবার সকালে।

বড় বৌমা—এই শনিবারই ঘটা করে ওদের বিবাহবার্ষিকী পালন করো। বিয়ের সময় কোন অনুষ্ঠান করা হয় নি। বৌমাকে কিছু দিতেও পারিনি। এবার সেটা পুষিয়ে দিতে হবে।

মহামায়াও শোনে ব্যাপারটা। আজ সেও বুঝেছে তাকে মান-সম্মান নিয়ে এ বাড়িতে থাকতে গেলে স্বামীর কথামত চলতে হবে।

তাই বলে মহামায়া,—বেশ তো, সেদিন মতিভ্রম হয়েছিল, মাকে বরণ করতেও পারি নি। এবার বরণ করে নেব তাকে।

বাড়িতে উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে। অনেকদিন পর আবার ঝিমিয়ে পড়া বাড়িটায় রোশনী জ্বলে। বাগানে প্যাণ্ডেল তৈরী হচ্ছে, অতিথিদের নেমতন্নও হয়ে গেছে।

নন্দন আজ যেন এ বাড়ির কেউই নয়। অমরবাবু তাকে সেই চিঠি ধরাবার পর আর কথা বলেন না।

নন্দনও দিন গুণছে—তার জবাব দেবার দিন এগিয়ে আসছে। এর মধ্যে তার জবাব না পেলে কোম্পানী তার বিরুদ্ধে মামলাই করবে।

আর জগুমাসী এখন যেন বোবা হয়ে গেছে।

সুজাতার উপরই এসে পড়েছে সব দায়িত্ব। এতবড় অনুষ্ঠানের সব কিছু ব্যবস্থা তাকেই করতে হচ্ছে। হিমসিম খেয়ে যায় সুজাতা।

অবশ্য এখন হেঁসেল ঠেলতে হয় না তাকে। ঠাকুরের সহকারীও রাখা হয়েছে। তবু সুজাতার কাজ যেন কমেনি, বেড়েই চলেছে।

অমরবাবু সবটাতে তাকেই ডাকেন, পরামর্শ করেন।

সেদিন সকালে বাড়ী এসে পেঁীছেছে চন্দন অপুকে নিয়ে। গাড়িটা থামতেই ছুটে যায় অণি, রীনা, চীৎকার করে ওঠে তারা।

—দাদু, ছোটকা, কাকীমা এসেছে। মা—অ মা। সুজাতাও বের হয়ে আসে।

অমরবাবু বাগানেই ছিলেন। তিনিও এসে পড়েন।

—বাবা! চন্দন, অপরাজিতা প্রণাম করে ওকে।

অমরবাবু বলেন—ভালো ছিলে তো মা ?

অপরাজিতা বলে—কেমন দেখছেন ?

সুজাতা এগিয়ে আসে। বলে সে,—সেরে উঠেছিস তাহলে। উঃ কি ভাবনাতেই না ছিলাম।

চন্দন হঠাৎ ওইসব প্যান্ডেল—আলোক সজ্জা দেখে শুধোয়—কি ব্যাপার বৌদি ? বাড়িতে এসব—

সুজাতা বলে,—বাবাকেই জিজ্ঞেস করো, এসব ওঁর হুকুমেই হচ্ছে।

—মানে ?

সুজাতা বলে,—তোমাদের বিয়ের সময় কিছু করতে পারেন নি বাবা, তাই তোমাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী বেশ ঘটাপটা করে করতে চান।

চমকে ওঠে অপরাজিতা,—সে কি ! বাবার হঠাৎ এসব খেয়াল হ'ল কেন ?

সুজাতা বলে—সেটা বাবাকেই জিজ্ঞেস করো। এখন চলতো রাতভোর ট্রেনে এসেছিস। এখন গিয়ে স্নানটান করে কিছু খেয়ে বিশ্রাম নিবি।

মাত্র আব একটা দিন বাকী উৎসবের। বাড়িতে হৈ চৈ চলেছে। ওদিকে প্যান্ডেল সাজানো চলছে।

কোন নামী সানাইওয়ালাকেও বায়না করা হয়েছে। সানাই সুরও উঠবে।

দুপুরে সুজাতা কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রামের সময় পায়। এ ঘরে এসেছে। ওকে দেখে অপুও এগিয়ে আসে। অণি, রীণা দাদুর সঙ্গে প্যান্ডেলে রয়েছে। তারা দুজনে রয়েছে এই ঘরে।

সুজাতা বলে—কি রে অপু। প্রতিজ্ঞা এখনও ভাঙে নি ?

অপু চাইল সুজাতার দিকে। সুজাতার চোখে দুষ্টুমির হাসি। অপরাজিতা শুধোয়।

—প্রতিজ্ঞা ! কিসের প্রতিজ্ঞা বড়দি।

—ন্যাকা ! কচিখুকী, কিছুই জানো না ? ঠাকুরপোর ঘরে না গিয়ে এখানে কেন ? এবার তোকে ঘাড় ধরে ওঘরে পুরে দিয়ে আসবো।

অপরাজিতা কি ভাবছে। বলে সে,—একটা বছর যেতে দাও। তারপর না হয়—

সুজাতা বলে,- কালই দেখছি তোকে। বছর তো পূর্ণ হয়ে গেল হিসাব আছে ?

অপরাজিতাও তা জানে। তাই বলে সে,—কাল যাহয় দেখা যাবে।

সুজাতা বলে,—কাল এ বাড়িতে অনেক কিছুই ঘটাবেন বাবা।

—কেন ?

সুজাতা বলে,—দেখবি আজ মনে হয় তুই না এলে এসব ঘটত না। বাড়ির আলো হয়তো চিরদিনের জন্য নিভে যেতো।

অপরাজিতা বলে,—কি বলছ। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

সুজাতা জানায়,—কাল দেখবি, বুঝবি।

অমরবাবু নিজেই ভেবে চিন্তে এই ব্যবস্থা করেছেন। আজ তার সেই হারানো ব্যক্তিত্ব ফিরে এসেছে, কথায় কাজে অমরবাবুর সেই ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে।

চন্দন এখন যেন অন্য মানুষ। অফিসের কাজও বুঝে নিচ্ছে, কারখানার প্রডাকসনও বেড়েছে তার জন্যই। কর্মচারীরাও এখন খুশী।

নন্দনকে তারা সহ্য করতে পারত না।

অমরবাবু এতদিন নন্দনকে সহ্য করেছিলেন। ব্যবসারও অনেক ক্ষতি করেছে সে। অনেক টাকা তছনছ করেছে, বাড়িতে অনেক বিপর্যয়ই এসেছে।

তবু ভেবেছিলেন নন্দন বদলাচ্ছে।

কিন্তু কারখানার তাদের লেবেল লাগানো মালের মধ্যে হঠাৎ বেআইনী হেরোইন কিছু ধরা পড়ে যায়।

নন্দনের কিছু পেটোয়া লোক এই কাজটা করতো গোপনে। তার সমজদার ছিল নন্দনই।

ধরা পড়ে যেতে সেই লোকটাকে আনা হয় অমরবাবুর চেম্বারে। অমরবাবু বলেন,—কে এসব করাতো বলো—তোমাকে কোন শাস্তি দেব না কথা দিচ্ছি।

লোকটা ও বলে,—ওই নন্দনবাবু স্যার।

অবাক হল অমরবাবু। শুধোন—কোন প্রমাণ দিতে পারবে যে তুমি মিথ্যা কথা বলছ না? নাহলে তোমাকে চাকরী থেকে তাড়াবো পুলিশেই দেব।

লোকটা বলে—নন্দনবাবুর ঘরে একটা কাঠের বাক্সে মাল, লোবেল সবই পাবেন স্যার।

নন্দন সবে মাত্র অফিসে এসেছে। এমন সময় অমরবাবুকে তার ঘরে আসতে দেখে চাইল নন্দন। অবাক হয় সে।

—আপনি ?

অমরবাবু জবাব না দিয়ে সঙ্গের লোকজনদের বলেন—খোঁজো সারা ঘর।

নন্দন চমকে ওঠে, সে কাঠের বাক্সটা সরাতে চায়, কিন্তু তার আগেই অমরবাবু বলে—খোলো, খোলো ওই বাক্স।

চাবি ছিল নন্দনের কাছেই, খোলা হয় বাক্স। আর তার ভিতর লেবেল, আসল মালও পাওয়া যায়।

অমরবাবুর চাপা রাগে ফুলছেন।

নন্দনকে বলেন—এই তোমার কাজ, ধরা পড়লে কোম্পানীর সর্বনাশ হতো।

এরপর অমরবাবুই সিদ্ধান্ত নেন।

তাই সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সবাইকে ডাকিয়েছেন। আজ এতদিনের সব অপরাধের বিচারই করবেন তিনি।

চন্দনও কারখানায় শুনেছে খবরটা।

সেও ভাবতে পারেনি নন্দন এইসব জঘন্য কাজ করে।

বাড়িতে মহামায়াও শুনেছে নন্দনের কীর্তির কথা। জগমাসী শুনেও আজ মুখ খোলে না। সে বুঝেছে নন্দনের চরম শাস্তি তো হবেই আর সেও রেহাই পাবে না।

বাড়িতে ওদিকে উৎসবের সমারোহ চলেছে।

প্যাণ্ডেল সাজানো হয়েছে, রোশনী জ্বলছে। চন্দনও ব্যস্ত উৎসবের আয়োজন নিয়ে।

সুজাতা—অপরাজিতার সময় নেই।

নদীর এককূল ভাঙে—অন্যকুলে গড়ে ওঠে সবুজ চরভূমি শস্যক্ষেত্র, এক দিকে শূন্যতা—অন্য দিকে পূর্ণতার আশ্বাস।

এতদিন অমরবাবুর মহলে ছিল নিরবতা—স্তব্ধতা। আর নন্দন, মহামায়ার মহলে ছিল আনন্দের হাট। আজ সেখানেই নেমেছে স্তব্ধতা।

নন্দন অফিস থেকে প্রায় বিতাড়িত হয়েছে।

ওইসব ঘটনা প্রকাশ হবার পর অমরবাবু তাকে বলেন—আর কারখানায় আসবে না। আজ সন্ধ্যায় বাড়িতে দেখা করবে, যাও—

অর্থাৎ কারখানার চাকরী গেল। বাড়িতে আবার কি হবে কে জানে।

ঘরের আলোটা নেভানো, বসে আছে নন্দন, মালা ভিতরে ঢুকে আলোটা

জেনলে বলে—তুমি এখানে, কত খুঁজছি তোমায়। কাল উৎসবে কোন শাড়িটা পরবো বলতো—আর লকার থেকে গহনাও আনতে হবে।

নন্দন জবাব দিল না।

মালা বলে—কি হয়েছে তোমার।

—কিছুই হয়নি, তুমি যাওতো। উৎসবের নামে নাচছো—ওদিকে পৌষ মাস—আমার সর্বনাশ হতে বসেছে তা জানো?

মালা বলে—বুঝে সমঝে না চললে সর্বনাশতো হবেই। ভেবেছিলে রাতারাতি সব কিছু দখল করবে—

—মানে? গর্জে ওঠে নন্দন।

তার স্ত্রীর মুখে এইসব নীতিবাক্য শুনতে হবে ভাবেনি। আজ তাই ওসব শুনে রক্ত মাথায় উঠেছে।

ওর মারমূর্তি দেখে মালা বলে—মারবে নাকি?

—হ্যাঁ। দরকার হলে তাই করবো?

মালা শোনায়—

—এসব করতে গিয়ে আজ নিজের আমাদের সর্বনাশ ডেকে এনেছো, এখনও শিক্ষা হয়নি? এবার বুঝবে!

কথাগুলো বলে চলে যায় মালা। নন্দনের যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়েছে, জ্বলছে সর্বাঙ্গ।

মহামায়া ঘরে ঢুকে বলে—যা, কর্তা ডাকছে। আবার কি করেছিস?

নন্দনকে ওরা সবাই যেন আজ শেষ করতে চায়।

অমরবাবুর ঘরে সকলেই এসেছে।

চন্দন অপরাজিতাও রয়েছে, সুজাতাকে ডাকা হয়েছে, মহামায়া একটা চেয়ারে মুখবুজে বসে আছে।

পাশে জগুমাসী।

আজ হরিনামের ঝুলিতে তার মালা জপও বন্ধ হয়ে গেছে। মুখে চিন্তার কালো ছায়া।

ওদিকে বসে আছে নন্দন, এপাশে বসে আছে মালা। তার উগ্র প্রসাধনও আজ নেই। চোখে জলের রেখা।

অমরবাবু বলেন—এ বাড়িতে তোমাদের আশ্রয় দিয়েছিলাম, রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করেছিলাম, বিশ্বাস করেছিলাম নন্দন! কিন্তু সেই বিশ্বাসের তুমি তোমরা এতটুকু মর্যাদা রাখোনি। কারখানা অফিসের বহু

টাকা চুরি করেছো, সেটা জেনেও তোমাকে শোধরাবার সুযোগ দিয়েছিলাম।

নন্দন চুপ করে শুনছে। আজ তার জবাব দেবার কিছু নেই।

অমরবাবু বলেন—কিন্তু গোপনে যে বেআইনী জঘন্য নেশার জিনিষ বানানোর কাজ করছিলে—সেটা জানার পর আর তোমাকে ক্ষমা করতে পারি না। তুমি একটা জঘন্য চরিত্রের মানুষ। তোমাকে কারখানা থেকে তাড়িয়েছি, এ বাড়ি থেকে আজই চলে যেতে হবে তোমায়, এখুনিই।

নন্দন এবার বুঝেছে। তার শাস্তির বহরটা সাংঘাতিকই হয়েছে।

স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে পথেই দাঁড়াতে হবে।

বলে নন্দন —যাবো কোথায় ? স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে ?

অমরবাবু শোনান—সেটা তুমিই বুঝবে, জেলে যাচ্ছো না এই ঢের। স্ত্রী, মেয়ের কথা যদি ভাবতে তাহলে একটার পর একটা এইসব জঘন্য কাজ করতে না।

জগুমাসী মিটমিট করে চাইছে।

এবার অমরবাবু তাকে বলেন—এ বাড়িতে তুমিই বদবুদ্ধি দিয়ে একটার পর একটা সর্বনাশ কাণ্ড ঘটিয়েছিলে. এ বাড়িতে তুমি আসার পর থেকেই সেই নাটকের শুরু।

এবার সংসারের সব কালো মেঘ কেটে নতুন আলো দেখা দিয়েছে—তাই তোমার মত শয়তানকেও বিদায় করতে চাই। তুমিও কাল সকালেই চলে যাবে এখান থেকে।

জগুমাসী আর্তনাদ করে ওঠে

—ওরে মহামায়া—

অমরবাবু বলেন—ওর করার কিছু নেই। এতদিন বাড়ির কর্তৃত্ব ওর হাতে তুলে দিয়ে ভুলই করেছি, তাই নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কালই চলে যাবে তুমি।

নন্দন আর তোমাকে যেন এ বাড়িতে না দেখি কাল সকালে।

সারা ঘরে স্তব্ধতা নামে।

—বাবা। অপরাজিতার কণ্ঠস্বরই নীরবতাকে ভঙ্গ করে। চাইলেন অমরবাবু।

অপরাজিতা বলে—বাবা, বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে আমাকে কিছু দিতে চেয়েছিলেন—

—হ্যাঁ মা। বলো কি চাও তুমি, নিশ্চয়ই দেব।

অপরাজিতা বলে,—তাহলে মাসীমা—আর নন্দনবাবুদের এখানে থাকার অনুমতি দেন। আমার বিয়ের বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাদের এ বাড়ি থেকে নিরাশ্রয় করলে আমি কিছুতেই সুখী হবো না বাবা।

অবাক হন অমরবাবু,—কি বলছ মা! তুমি তো জানো, এ বাড়িতে ওরা আমাকেই পাগল বানিয়ে শেষ করতে চেয়েছিল। তুমি এ বাড়ির, আমার, ভালো চেয়েছিলে তাই তোমাকে শেষ করার জন্য একটার পর একটা চক্রান্ত করেছিল—শেষে খুন করতে চেয়েছিল—

আজ ওই অভিযোগের কোন জবাবই দিতে পারে না নন্দন, জগুমাসী, নীরবে শোনে মাত্র।

অমরবাবু বলেন,—তাদের তুমি এখনও এ বাড়িতে রাখতে চাইছ?

অপরাজিতা বলে,—ভুল করেছিলেন তারা। ভুল শোধরাবার সুযোগ দিলে নিশ্চয়ই এ বাড়িরই আর পাঁচজনের একজনই হবে তারা। এই সুখের দিনে তাদের শুভেচ্ছাও সংসারকে আরও সার্থক করবে বাবা!

জগুমাসীর চোখে আজ জল নামে। আজ অবাক হয়ে দেখছে জগুমাসী অপরাজিতাকে। ওই মেয়েটিকে সে চিনতে পারে নি। এ সংসারের সব আবর্জনাকে মুক্ত করে আজ এখানে বাঁচার আশ্বাস এনেছে, এনেছে সকলকে নিয়ে বাঁচার আশা।

অপরাজিতা বলে,—মাসীমা যাবেন কোথায়? তার আর কেউ নেই। নন্দনবাবুর দোষে মালা ওই দুধের মেয়েটা পথে দাঁড়াবে—এতে আপনারই মুখ পুড়বে বাবা। নন্দনবাবুকে আর একটা সুযোগ দিন—

নন্দন আজ অসহায়, বিধ্বস্ত, সে আজ ভেঙ্গে পড়েছে। আজ বলে নন্দন, —তখন ভেবেছিলাম—কৌশলেই সব কিছু পাওয়া যায়। তাই একটার পর একটা ভুল করেছি। আজ বুঝেছি, কিছু পেতে গেলে তার চেয়ে অনেক বেশী দিতে হয়। তুমি আমাকে ক্ষমা কর অপু।

মহামায়া এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। নন্দনকে তাড়াবার কথায় সে কোন কথা বলতে পারে নি। অথচ নিজের ছেলে—তাদের পথে বের হতে হবে ভেবে মায়ের মন দুঃখও পেয়েছিল।

অপরাজিতা আজ তার সেই চরম বেদনার জায়গাতেই প্রলেপ দিতে চায়।

নন্দন যদি এখানে ঠাঁই পায় মহামায়া তাকে এবার শাসনই করবে। এই ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেবে না কিছুতেই।

অমরবাবু কি ভাবছেন! দেখছেন ওই বিচিত্র মেয়েটিকে। ওর কথায়

নিজেরই বিস্ময় লাগে অমরবাবুর।

—এ-কি, তুমি কি বলছ মা!

অপু বলে—আজ এ বাড়ির সুখের দিনে ওদেরও জানতে দিন, ওরাও এই সুখের শরিক। এই বিশ্বাসই ওদের বদলে দেবে বাবা।

নন্দন বলে অমরবাবুকে,—আমি অনেক ভুলই করেছি, সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন। যা লোকসান করেছি ভুলের বশে—তা এবার নিজের পরিশ্রমে পুষিয়ে দেব।

জগুমাসী বলে,—আমারই দোষ দাদা, আমিই নন্দনকে নানা কথা বলে কেমন লোভী একটা অমানুষ করেছিলাম। আমার পাপের শেষ নেই। তাই রাধারানী এই শাস্তিই দিয়েছেন। আমার জন্য ওদের তাড়িয়ো না—আমিই পাপী, আমিই দূর হয়ে যাচ্ছি দাদা।

অপরাজিতা বলে,—না মাসীমা, আমরা পিছনের সব ভুলে আবার নতুন করে বাঁচবো সবাই মিলে। আপনি কোথায় যাবেন।

জগুমাসীর চোখে জল নামে। নন্দনও আজ অনুতপ্ত। চন্দন দেখছে সব। আজ আনন্দের দিনে অপুই এই সংসারের সব শূন্যতাকে পূর্ণ করেছে।

অমরবাবু বলেন অপরাজিতাকে,—ঠিক আছে মা। তোমার কথাতেই রাখলাম ওদের।

নন্দন—আশা করি এই মানবিকতার মর্যাদা তুমি রাখবে। ওই মেয়েটাকে তোমরা চিনতে পারো নি বড় বউ। মা আমার অপরাজিতাই—সব লড়াই জয় করেছে ও। তোমরা হারাতে ওকে পারো নি—পারবে না।

সুজাতা বলে অপুকে,—ধন্য মেয়ে তুই। সংসারের সকলের কথাই ভাবলি—তোর নিজের কথা ছাড়া।

অপরাজিতা কি ভাবছে! বলে সে,—তাও ভাবছি বড় দি।

সুজাতা বলে,—কাল বেনারসী পরবি, আর গহনাও। বিয়ের দিন তো যা হবার হলো। ঘরে ঢুকলি অনাহূতের মত, বাবাও কিছু করতে পারেন নি। কাল তাই সব উশুল করতে চান।

অপরাজিতা চুপ করেই থাকে।

সুজাতা কাছে এসে বলে গলা নামিয়ে, —আর ফুলশয্যা তো হয় নি —ওটা কালই হবে। আমি ব্যবস্থা করে রাখবো। ঘাড় ধরে কাল ওঘরে

পাঠাবো। বুঝলি। কোন কথাই শুনবো না। কি মেয়েরে তুই ; ঠাকুরপোকেও বলেছি—বেচারা।

রাত নামে, অপরাজিতার ঘুম আসে না। বারবার মনে পড়ে এক বছর আগেকার সেই দুর্যোগের রাত্রির কথা। ঝড় উঠেছিল সে রাত্রে—তার জীবনেও এসেছিল এক সর্বনাশা ঝড়।

আজ ঠাণ্ডা মাথায় ভাবছে সে, সেই রাতে বিয়ে, সেই অনুষ্ঠানের কথা। কি তার দাম। আজও অপরাজিতা নিঃসঙ্গই হয়ে গেছে।

স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ের এই খেলারই এবার শেষ করতে চায়। তার জেদ সে বজায় রেখেছে। একটা পরিবারকে বিপদের অন্ধকার থেকে আলোয় এনে—অমানুষদের মনে বিবেকবোধ জাগ্রত করেছে। চন্দনকেও বদলে দিয়েছে। সেই তার জয়।

এবার তার পালা এখানে ফুরিয়েছে। তাই তার পথই এবার সে দেখে নেবে।

রাত কত জানে না। ক্রমশঃ এই জাগর রাত্রিরও শেষ হয়। আকাশে আলোর আভাষ জাগে। পাখীদের কলরব ওঠে।

শীতের ভোর।

বাগানে কুয়াশা তখন গাছগাছালির বুকে জমাট বেঁধে আছে। ঘাসে শিশিরের হিম জালা আভাষ। ওই হিমশীতল ঘাস মাড়িয়ে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল এ বাড়ি থেকে একজন।

কেউ তাকে দেখে নি। ভীরু পায়ে গেট খুলে বের হয়ে গেল সে এই বড় বাড়ির সব সমারোহ পিছনে ফেলে।

সুজাতার ঘুম ভাঙ্গে ভোরেই। দেখে তার ঘরে অপরাজিতার বিছানাটা খালি, বোধহয় বাথরুমে গেছে।

কিন্তু না—বাথরুমও খালি।

সুজাতা এদিক ওদিকে খুঁজছে। অপুর দেখা নেই।

সকালে উৎসবের মেজাজ নিয়ে জেগে উঠেছে এ বাড়ির লোকজন। অমরবাবুও সকালেই বাগানে আসেন।

চন্দন—নন্দনরাও জেগে উঠেছে।

মহামায়া ও জগুমাসী স্নান সেরে পুজোর ঘরে ঢুকেছে। সবাই রয়েছে, এ বাড়িতে নেই শুধু একজন।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ে বাড়িতে। অপরাজিতা নেই। তার সব জিনিষপত্র ঠিকঠাকই রয়েছে। শুধু তার ছোট ব্যাগটা নেই। তার জিনিষপত্র আর এ বাড়ির দেওয়া গহণাপত্রও রেখে গেছে, আর রেখে গেছে চন্দনের উদ্দেশ্যে কয়েক লাইন চিঠি।

—এক বছর পার হয়ে গেছে। সর্তমত তুমি আমাকে ডিভোর্স করো—আজ থেকে এ বাড়ির উপর—কারোও উপর আমার কোন দাবীই রইল না। তোমাদের দায়মুক্ত করে চলে গেলাম। অপরাজিতা

চন্দন চিঠিখানা পড়ে চমকে ওঠে।

মনে পড়ে এক বছর আগে তাদের এই সর্তেই বিয়ে হয়েছিল। চন্দন ভুলে গেছল কথাটা। কিন্তু অপরাজিতা ভোলে নি।

আজ চন্দনের যে দিন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন অপরাজিতাকে এই সংসারের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাকে, সেই মুহূর্তেই সব কিছু পিছনে ফেলে চলে গেল অপরাজিতা শূন্য হাতে—নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে।

অমরবাবু, মহামায়া এসে পড়ে। তারাও সব শুনে অবাক হয়। অমরবাবু বলেন,—সেকি! তোমরা তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবে? অথচ আমার সংসারে সে আজ সব সুখ-শান্তি শ্রী ফিরিয়ে দিয়েছে। না—না—চন্দন। তুই যা—দরকার হয় আমি নিজে যাবো, মাকে ফিরিয়ে আনবোই, তুই যা। নিশ্চয়ই মা ওর বাবার কাছেই গেছে। ওরে ঘরের লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আন—নাহলে এই সুখ শান্তিও এসংসার থেকে আবার হারিয়ে যাবে।

মহামায়া বলে,—তুই যা চন্দন।

সুবিনয়বাবু সকালেই অপরাজিতাকে ফিরতে দেখে অবাক হয়।

—অপু, হঠাৎ!

অপরাজিতা বলে,—এলাম বাবা। মৃন্ময়ীও এসে পড়ে।

শুধোয় সে—একাই এলি যে? চন্দন এল না?

—ওরা আর আসবে না মা।

মা ঠিক বুঝতে পারে না। অপরাজিতা কথাটা বলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সুবিনয়বাবুও অবাক, মৃন্ময়ী বলে,—কি ব্যাপার বলোতো! হঠাৎ চলে এলো এভাবে। ভালো করে কথাও বললো না—

সুবিনয়বাবুর ভয় হয়। কারণ সে জানে ওবাড়িতে অপরাজিতা নানা

অসুবিধার মধ্যেই রয়েছে। চন্দন কথা দিয়েছিল। কিন্তু বোধহয় আবার নতুন কিছু ঝামেলা বেধেছে। তাই চলে এসেছে অপু।

সুবিনয়বাবু বলে স্ত্রীকে—এখন ওকে কিছু বলো না—একটু একা থাকতে দাও ওকে। পরে জিজ্ঞেস করো।

মৃন্ময়ীরও কেমন ভয় হয়। বলে সে,—ব্যাপার ভালো বুঝছি না বাপু।

অপরাজিতা নিজের ঘরে ফিরেছে এক বছর পর। সব হারিয়ে সে দিন সে এই ঘরে চোখের জলে তার সম্মান ফিরে পাবার পথের সন্ধান করেছিল, আজ একবছর পর সেই সম্পর্ক শেষ করে ফিরে এসেছে।

জীবনের পাতা থেকে এই অধ্যায়টাকে সে মুছে ফেলতে পারলে সুখী হতো। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এই বোঝা তাকে বয়ে চলতেই হবে জীবন-ভোর।

তবু চলা তার থামবে না। অপরাজিতা আবার নতুন করে বাঁচার পথেরই সন্ধান করবে।

সুবিনয়বাবুও ভাবছেন কথাটা। বাড়ি এসে অবধি অপরাজিতা নিজের ঘরে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কোন কথাই বলে নি।

হঠাৎ বাইরে গাড়ি থামার শব্দ শুনে চাইল সুবিনয়বাবু, ঢুকছে চন্দন।

—তুমি! সুবিনয়বাবু বলে।

চন্দন শুধোয়—অপু এসেছে?

সুবিনয়বাবু দেখান ওই ঘরের দিকে।

দেখা যায় অপু স্তব্ধ হয়ে বসে আছে পাথরের মূর্তির মত। চন্দন এগিয়ে যায়।

পায়ের শব্দে চাইল অপরাজিতা।

চন্দন এগিয়ে আসে।—তোমাকে নিতে এসেছি অপু।

অপরাজিতা জবাব দেয় না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

চন্দন বলে—সেদিনের অমানুষকে যদি স্বামী বলে মেনে নিতে পেরেছিলে, আজ যাকে মানুষ করে তুলেছো, তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারো না অপু। কাগজের লেখায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত নয়—সেই সম্পর্ক গড়ে ওঠে মনের সুরে—ভালোবাসার বাঁধনে। আজ তাই বুঝেছি, তোমাকে ছেড়ে বাঁচার পথ আমার নেই—

অমরবাবু, মহামায়াও ঢোকে।

সুবিনয়বাবু আজ অপরাজিতার ব্যবহারে অবাক হয়। কাগজের সর্তটাই যেন তার কাছে বড়, হৃদয়ের কোন দামই নেই।

অমরবাবু বলেন,—বেইমশায়, বেনঠাকরুণ, আজ আমরা আমাদের ঘরের লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। আমাদের শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবেন না।

মৃন্ময়ীও দেখছে ওদের।

—মা।

অপরাজিতা চাইল। ওর চোখে জল। আজ তার মনে হয় শেষ লড়াই-এও সেই জয়ী হয়েছে।

অমরবাবু বলেন—ঘরে চল মা। আজ নতুন করে ঘরের লক্ষ্মীকে বরণ করে আমার ঘরে প্রতিষ্ঠা করবো।

বেইমশায়—আপনাদেরও যেতে হবে। আজ অপরাজিতা ওদের ফেরাতে পারবে না। হৃদয়ের টানে তার সব জেদ—কাগজের শর্ত কোন দিকে হারিয়ে যায়!

মহামায়া বলে—আমাদের এখনও কি দূরে সরিয়ে রাখবে মা? আমাদের দোষের কি ক্ষমা নেই?

অপরাজিতা এগিয়ে আসে। ওদের ডাকে আজ সাড়া না দিয়ে সে পারে না। তার ঘরের নতুন ঠিকানাই আজ পেয়েছে সে। প্রণাম করে অপু—ওদের।

অমরবাবুর চোখও অশ্রুসিক্ত। জানতাম মা—আমাদের ফেরাতে পারবে না।

সারা বাড়িতে আজ উৎসবের সুর। আনন্দের রোশনী ওঠে। আজ অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন অমরবাবু—অপরাজিতার। অণি রীণারও খুশী ধরে না।

এসেছেন আমন্ত্রিত হয়ে সেই জজসাহেব—পুলিশ অফিসার তরুণ ঘোষাল।

আজ তরুণবাবুকে প্রণাম করে অপরাজিতা।

তরুণবাবু বলেন,—মা সেদিন ভেবেছিলাম শাসন করেই সব অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ করা যায়, কিন্তু তোমার কাছে শিখলাম—সব সহ্য করে কিছু দিতে পারলে অন্যায়ও একদিন থেমে যায়, হার মানে। পুলিশী মন

নিয়ে গৃহবধূর অত্যাচার-অবিচারের মামলা করি, কিন্তু বধূরাও যদি এই কথাটা ভেবে দেখে—হয়তো সমস্যাটা অনেক কমে যাবে।

কর্তব্য শুধু এক তরফের নয়—বধূরও কিছু আছে। তাতেই প্রকৃত শান্তি আসে, এটা তুমি দেখালে মা। আশীর্বাদ করি, সুখী হও মা।

সানাই এর সুর ওঠে। রাত্রির গভীরে আজ বহু যন্ত্রণা—বহু প্রতীক্ষা বন্ধুর পথ পার হয়ে চন্দন অপরাজিতা দুজনে দুজনের কাছে এসেছে।

অপরাজিতা তার দুস্তর সাধনা দিয়ে জীবনের সব দুঃখ-গ্লানি পরাজয়ে জয় করেছে॥

— 0 —